প্রফুল্ল রায়

লৌকিক এবং অলৌকিক গল্প

লৌকিক এবং অলৌকিক গল্প

লৌকিক এবং অলৌকিক গল্প

প্রফুল্ল রায়

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

LOUKIK EBANG ALOUKIK GALPO

By *Prafulla Roy*

(A collection of novels and stories)

CODE NO. : 63 L 20

Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.

21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009

Tel : 2350-4294/4295/7887

ISBN : 978-81-944603-6-7

প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ২০২০, মাঘ ১৪২৬

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১,
ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা—৭০০০০৯ থেকে
শ্রীরাজর্ষি মজুমদার ও রূপা মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক
এ. টি. দেব প্রেস থেকে মুদ্রিত।

বর্ণ সংস্থাপন : প্রদ্যুৎ সাহা, ৭,
কামারডাঙ্গা রোড, কলকাতা—৭০০০৪৬

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

উৎসর্গ

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু—

ভূমিকা

এই গ্রন্থটি একটি উপন্যাস এবং ছোটো—বড়ো এগারোটি গল্পের সংকলন।

এই সব কাহিনির পটভূমি পুরোনো কলকাতা, প্রায় ছয় দশক আগের বম্বে (বম্বে তখনও মুম্বাই হয়নি), দণ্ডকারণ্য, পূর্ব বাংলা (এখন বাংলাদেশ), এমন সব এলাকা।

উপন্যাসটি এবং আরও দু—একটি গল্পের পাতায় পাতায় রয়েছে শিহরন, ভয়, ভূত। অন্য গল্পগুলোর কোনওটায় রোমাঞ্চ, কোনওটায় কৌতুক, কোনওটায় ভালোলাগা ইত্যাদি।

আমার বিশ্বাস শুধু বইটি হাতে তুলে নিয়ে মলাট খুললেই সব বয়সের পাঠক পেয়ে যাবেন দেদার মজা, দেদার হাসি, সেই সঙ্গে হাসি ভয়ে মোড়া এমন ঘনঘোর রহস্য যা তাদের শিরদাঁড়ায় শিরশিরানি ধরিয়ে দেবে।

পাঠক যদি এই বইটি থেকে দু'হাত ভরে আনন্দ আর শিহরন তুলে নিতে পারেন, কৃতার্থ বোধ করব।

গ্রন্থকার

সূচিপত্র

পুরোনো কলকাতার একটি বাড়িতে

অনেকদিন আগে এই গল্পটা শুনেছিলাম। কে বলেছিল, ঠিক কবে বলেছিল, সেসব ভুলে গেলেও, গল্পটা কিন্তু মনে আছে। প্রথম যখন শুনি আমার সেই বয়সের শিরদাঁড়ায় শিহরন খেলে গিয়েছিল।

আজকালকার পাঠকদের কেমন লাগে, দেখাই যাক। গল্পটা এইরকম।

বিকেল তখন ফুরিয়ে এসেছে, কাটোয়া লোকাল হাওড়া স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে থামল। ট্রেনের মাঝামাঝি একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে নেমে এল রাজেন। তার এক হাতে টিনের সুটকেস, আরেক হাতে মোটা কাপড়ের ব্যাগ। অন্য প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে লম্বা প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে গেটে কালো কোট পরা রেলবাবুদের হাতে টিকিট জমা দিয়ে সোজা বাসস্ট্যান্ডে চলে এল সে।

একে-ওকে জিজ্ঞেস করে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ ধরে যে বাসগুলো শ্যামবাজারের দিকে যায় তার একটায় উঠে পড়ল রাজেন।

তিন বছরও পুরো হয়নি, দেশ স্বাধীন হয়েছে। কলকাতায় এখনকার মতো এত লোকজন ছিল না, যানবাহনও অনেক কম। রাস্তায় রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম নেই। মানুষের ভিড়ও তেমন চোখে পড়ে না।

বাসটা হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে বড়বাজারে চলে এল।

রাজেনের বয়স বাইশ-তেইশ। তাদের বাড়ি কাটোয়ার সিদ্ধেশ্বরীতলায়, গঙ্গার কাছাকাছি। তার পরনে ধুতি আর ঢোলা ফুলশার্ট। পায়ে বাটা কোম্পানির পুরু চপ্পল। সেই সময় এখনকার মতো এত প্যান্ট-শার্টের চল ছিল না।

রাজেন এই প্রথম কলকাতায় এল না। তবে উত্তর কলকাতায় তার কখনও আসা হয়নি। শ্যামবাজার, শোভাবাজার, ফড়েপুকুর এইসব নাম তার শোনা। এই এলাকাগুলো কেমন, তার ধারণা নেই। এই বিশাল শহরে আগে বেশ কয়েকবার যে রাজেন এসেছে, দক্ষিণ কলকাতার শেষ প্রান্তে বেহালা শখের বাজারে তার নমিতা পিসির বাড়িতে উঠেছে। নমিতা পিসি তার বাবার আপন বোন নয়। দূর সম্পর্কের খুড়তুতো বোন হলেও নমিতা পিসি এবং তার স্বামী রাজেনের পীতাম্বর পিসে খুবই ভালোমানুষ। যখনই সে বেহালা শখের বাজারে আসে, পিসিরা কী আদর-যত্নটাই না করে। যতবারই এসেছে নমিতা পিসিরা সহজে তাকে ছাড়েনি। কম করে আট- দশদিন তাদের কাছে কাটাতেই হয়েছে রাজেনকে।

এবার নমিতা পিসিরা নেই। বাড়িতে তালা লাগিয়ে কাশী-মথুরা-বৃন্দাবনে তীর্থ করতে গেছে। একমাসের আগে ফিরবে না। তাই রাজেনের শোভাবাজারের কাছাকাছি অবিনাশকাকুদের বাড়িতে দিন সাতেক থাকা ছাড়া উপায় নেই।

অবিনাশ দত্ত রাজেনের বাবার বন্ধু। কলকাতার একটা বিদেশি স্টিভেডর কোম্পানির অফিসে দু'জনে সহকর্মী ছিল। বাবার বন্ধু, সেই সুবাদে কাকা। বাবা এবং অবিনাশকাকু বছর তিনেক হল রিটায়ার করেছে।

রাজেনের বাবা বাসুদেব নিয়োগী পঁয়ত্রিশটা বছর কলকাতার মেসে থেকেই চাকরি করেছে। ছুটিছাটায় কাটোয়ায় যেত। অবসরের পর কলকাতার মেস-টেস ছেড়ে বাসুদেব নিয়োগী পাকাপাকিভাবে কাটোয়াতেই থাকছে। এখন খুবই অসুস্থ, বাড়ি থেকে বেরুনো একরকম বন্ধ। একমাত্র অবিনাশ দত্ত ছাড়া অফিসের পুরোনো কলিগদের সঙ্গে তার যোগাযোগও নেই বললেই হয়।

রাজেন দু'বছর হল বি-কমটা পাশ করেছে। কিন্তু চাকরি-টাকরি এখনও কিছুই জোটেনি। নানা অফিসে দরখাস্তর পর দরখাস্ত পাঠানোই সার।

রাজেনের একটা কাজ দরকার। কেননা বাবা অসুস্থ। তার তিন-চারটে ছোট ছোট ভাইবোন। সংসারের সব দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। হঠাৎই এই মাসে কয়েকটা অফিসে ইন্টারভিউ দেবার জন্য তাকে ডেকেছে। দু-একদিন গ্যাপ দিয়ে দিয়ে অফিসগুলোতে দৌড়তে হবে। কাটোয়া থেকে দু-একদিন পর পর এসে ইন্টারভিউ দেওয়াটা খুবই কষ্টকর। ট্রেন জার্নির ধকলের কথা বাদ দিলেও হুট করে গিয়ে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে গিয়ে বসলেই তো হল না। তার আগে বই-টই ঘাঁটতে হয়, মনকে তৈরি করে নিতে হয়। ট্রেনেই যদি সময় কেটে যায়, প্রিপারেশনটা কী করে হবে? তাই অন্তত দিনদশেক রাজেনের কলকাতায় থাকা দরকার। কিন্তু নমিতা পিসিরা ছাড়া এই শহরে তাদের অন্য কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই। সে থাকবে কোথায়?

নিরুপায় হয়েই অফিসের পুরোনো সহকর্মীকে চিঠি লিখেছিল বাসুদেব নিয়োগী। অবিনাশ দত্ত চিঠি পেয়েই উত্তর দিয়েছে। রাজেন তাদের বাড়িতে ক'টা দিন থাকবে, এতে সে আর তার স্ত্রী বন্দনা খুবই খুশি। অবিলম্বে যেন রাজেনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে একটাই কথা। রাজেনকে সাবধানে থাকতে হবে এবং বাড়ির ভেতর অবিনাশ আর বন্দনা যেভাবে বলবে, তাকে সেভাবেই চলতে হবে।

বাড়ির ভেতর অবিনাশদের কথামতো চলতে হবে, সেটা না হয় ঠিক আছে। কিন্তু সাবধানতা কী কারণে? একটু খটকা দেখা দিলেও তেমন আমল দেয়নি বাসুদেবরা। তাই ব্যাগ-সুটকেস গুছিয়ে কাটোয়া লোকালে উঠে পড়েছিল রাজেন।

বাসটা বড়বাজার, চিৎপুর-টিটপুর ছাড়িয়ে কংক্রিটে-বাঁধানো সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে ঢুকে স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছিল।

দেশ স্বাধীন হলেও ব্রিটিশ শিল্পপতিরা সবাই তখনও কলকাতা ছেড়ে ব্রিটেনে ফিরে যায়নি। সাহেব মালিকরা বা তাদের অফিসাররা ইন্টারভিউতে কী কী প্রশ্ন করতে পারে তাই নিয়ে রীতিমতো চিন্তা হচ্ছিল রাজেনের। অবশ্য দেশি কয়েকটা কোম্পানিও তাকে ডেকেছে।

বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করলেও তখন স্কুলে-কলেজে ইংরেজির ওপর জোর দেওয়া হত। ইংরেজিটা মোটামুটি ভালোই জানে রাজেন। গুছিয়ে লিখতেও পারে। কিন্তু বলার অভ্যাস নেই। কিন্তু ইন্টারভিউতে একটুও হোঁচট না খেয়ে ঝরঝরে সাবলীল ইংরেজিতে জবাব দিতে হবে। দুশ্চিন্তাটা সেখানে। কিছু করার নেই। ইন্টারভিউ দিতেই হবে।

সে কোথায় যাবে, বাসে উঠেই অবাঙালি কন্ডাক্টরকে জানিয়ে দিয়ে রাজেন বলেছিল, তাকে যেন সেখানে নামিয়ে দেয়।

কন্ডাক্টরটি তা মনে করে রেখেছিল। বিডন স্ট্রিট পেরুবার পর সে রাজেনের সিটের কাছে চলে এল।—'বাবুজি—'

রাজেন অন্যমনস্ক ছিল। ডাকটা কানে যেতে একটু চমকে তাকাল।

কন্ডাক্টর বাংলা-হিন্দি মিশিয়ে বলল, 'আপনার ইস্টপ (স্টপ) এসে গেছে। উতার যাইয়ে (নামুন)—'

সুটকেস আর ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে নেমে পড়ল রাজেন। অবিনাশ দত্ত চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছিল বিডন স্ট্রিট পেরুবার পর বাঁ-দিকে তিনটে লেন পেছনে ফেলে চার নম্বর সরু রাস্তাটা হল রাধানাথ মল্লিক লেন। সেখানেই তারা থাকে। বাড়ির নম্বর তেরো।

সন্ধে নেমে গিয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় কর্পোরেশনের আলো জ্বলে উঠেছে। দু-ধারের বড় বড় বিল্ডিং আর ছোট-বড় নানা ধরনের দোকান এবং শো-রুম-গুলোতেও অজস্র আলো।

কলকাতার এই এলাকাটা রাজেনের পুরোপুরি অচেনা। চারপাশের বিশাল বিশাল বাড়িগুলোর চেহারা দেখে মনে হয় বহুকালের পুরোনো। কী একটা বইয়ে সে পড়েছে, এই অংশটাই আদি কলকাতা। অবশ্য সে শুনেছে নমিতা পিসিরা যেখানে থাকে সেই বেহালা শখের বাজারও প্রাচীন কলকাতা।

শহরের পুরাতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় এটা নয়। তেরো নম্বর রাধানাথ মল্লিক লেনটা তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

একটা ওষুধের দোকানে জিজ্ঞেস করতেই জানা গেল, একটু এগিয়ে বাঁ-ধারে যে গলিটা পাওয়া যাবে সেটাই রাধানাথ মল্লিক লেন। রাজেন পা চালিয়ে সেই গলিটায় ঢুকে পড়ল।

সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর গায়ে এরকম একটা গলি থাকতে পারে ভাবা যায় না। বড় রাস্তার বহুতল সব ইমারত আর আলোর ঝলকানি কিছুই এখানে নেই। রাধানাথ মল্লিক লেনটা যেন ছাপ্পান্ন পাকের গলি। কয়েক পা হাঁটলেই একটা করে বাঁক। প্রায় তিন বছর হল ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে। কিন্তু এই গলিতে অনেকটা দূরে দূরে লাগানো গ্যাসবাতিগুলো এখনও থেকে গেছে।

সরু রাস্তাটার দু-ধারে নোনা-ধরা, গায়ে গায়ে ঠেকানো একতলা, দোতলা, তেতলা, আদ্যিকালের সব বাড়ি। ফাঁকে ফাঁকে টালি বা টিনের চালের ছোট ছোট কয়েকটা বস্তি। এসবের মধ্যেই কালীমন্দির, শনিমন্দির, শিবমন্দির। কেরোসিনের ডিবে ঝুলিয়ে তেলেভাজার দোকান, কবিরাজখানা, মুদিখানা, পান-বিড়ির দোকান ইত্যাদি ইত্যাদি।

এখানকার বাড়িগুলো থেকে অবশ্য ইলেকট্রিকের আলো বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সেগুলো খুবই ম্যাড়মেড়ে। গ্যাসবাতি, কেরোসিনের ডিবে, ইলেকট্রিক আলো— সবই আছে কিন্তু চারপাশ কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা। রাস্তা দিয়ে লোকজন চলছে ঠিকই কিন্তু সব ছায়ামূর্তি। জোব চার্নক কি তিনশো বছর আগে এখানকার বাড়িগুলোর ভিত গেঁথেছিলেন?

রাজেন চলেছে তো চলেছেই। এই গলিতে তেরো নম্বর বাড়িটার কথা যাকেই জিজ্ঞেস করছে তারই এক জবাব—আরেকটু এগিয়ে যান। এগুতে এগুতে কোথায় গিয়ে পৌঁছোবে সে?

মাথায় গোঁ চেপে গেল রাজেনের। সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর মুখ থেকে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট হাঁটছে সে। দেখা যাক আরও কতক্ষণ লাগে? এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা যাই লাগুক সে ছাড়ছে না। বাড়িটা খুঁজে তাকে বের করতেই হবে।

কিন্তু না, আর বেশিক্ষণ তাকে হাঁটতে হল না, বাঁদিকে একটা চিঁড়েমুড়ি, চিঁড়ের মোয়া, খইয়ের মোয়া, বাদামভাজা, ছোলাভাজা, বাতাসা, নকুলদানা ইত্যাদি নানা জিনিসের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল রাজেন। তেরো নম্বর বাড়ির কথা বলতেই দোকানদার চমকে উঠে অদ্ভুত চোখে তাকাল। তার চোখেমুখে শুধু চমকই নয়, ভয়ও যেন ফুটে উঠেছে।

রাজেন অবাক। সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, দোকানদার ঢোক গিলে বলল, 'বাবু, আপনি ঠিক তেরো নম্বর বাড়িতেই যেতে চান?'

রাজেন হতভম্ব। বলে কী লোকটা? একটু সামলে নিয়ে বলল, 'তাই তো বললাম।'

এবার দোকানদারের গোলাকার মুখে খাবি খাওয়ার মতো ভঙ্গি ফুটে উঠেছে। তারই মধ্যে কিছুটা সামলে নিল সে।—'ও, আচ্ছা। আমার দোকানের গা ঘেঁষে যে বাড়িটা সেটাই তেরো নম্বর।'

'ঠিক আছে—' কয়েক পা এগুতেই রাজেনের চোখে পড়ল আধাআধি খোলা সদর দরজার ডানপাশের পাল্লায় কালো ধ্যাবড়া হরফে লেখা ১৩।

যাক, শেষমেশ পাওয়া গেল। দরজাটা পুরোপুরি খুলে ঢুকতে যাবে, কী ভেবে চিঁড়েমুড়ির দোকানের দিকে তাকাল রাজেন। দোকানদার কচ্ছপের মতো গলাটা অনেকখানি বাড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। চোখে সেই অদ্ভুত ভয় ভয় দৃষ্টি। চোখাচোখি হতেই গলাটা টেনে নিল।

রাজেন ভেতরে ঢুকতে গিয়ে ঢুকল না। দোকানদারের চোখে এত ভয়, এত চমক কেন? সে কি কিছু বলতে চায়? কী বলবে? কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। একটু দোনোমনো করে ঢুকেই পড়ল সে।

দরজা পেরুলেই দু-ধারে প্রায় পঁচিশ- ছাব্বিশ ফিট উঁচু, প্রায় তিরিশ ইঞ্চি পুরু, আদ্যিকালের নোনা-ধরা দেওয়াল। মাঝখান দিয়ে পাঁচ-ছ'ফিট চওড়া রাস্তা। অনেকটা সুড়ঙ্গের মতো।

কারওকেই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ রাজেনের মনে হল, অবিনাশকাকা কি আসল ঠিকানাটা লিখতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছে? বাড়ির নম্বর হয়তো পনেরো। কুড়ি, বাইশ, চব্বিশ বা অন্য কিছুও হতে পারে। কিন্তু তাই বা কী করে হয়। অবিনাশকাকা ভুল ঠিকানা দিয়ে তাকে নাজেহাল করবে কেন? না, আরেকটু এগিয়েই দেখা যাক।

সামনের দিকে পনেরো-কুড়ি ফিট যেতেই চোখে পড়ল সুড়ঙ্গের মতো প্যাসেজটা ডান দিকে সামান্য বাঁক নিয়ে সোজা চলে গেছে।

বাঁকের মুখে আসতেই চোখে পড়ল, খানিকটা দূরে শান-বাঁধানো চাতালের ওধারে একটা মস্ত সেকেলে তিনতলা বাড়ি। রাজেন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে সোজাসুজি একতলার দু'টো ঘরে কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। চাতালের ডানপাশেরও দু-তিনটে ঘরে ম্যাড়মেড়ে আলো। চাতালের দু'পাশ থেকেই মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে।

না, এটা জনশূন্য ভূতুড়ে বাড়ি নয়। এখন মনে হচ্ছে, অবিনাশকাকা সঠিক ঠিকানাই দিয়েছে। চিঠিতে জানিয়েছিল তারা তেরো নম্বরের দোতলায় থাকে।

মুখ তুলে ওপরের দিকে তাকাল রাজেন। দোতলাতেও আলো জ্বলছে। সে পা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ আরও উঁচু থেকে খস খস আওয়াজের মতো কিছু কানে এল। রাজেনের চোখ তেতলার দিকে চলে গেল। তেতলাটা অন্ধকার। কেউ থাকে বলে মনে হয় না।

তারও ওপরে ছাদের রেলিংয়ের ওপর দিয়ে অনেকটা ঝুঁকে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। আবছা আবছা অন্ধকারেও মনে হল কোনও মহিলা। বয়স বেশি হবে না, তিরিশের নীচেই। পরনে শাড়ি, কপাল অবধি ঘোমটা টানা। সে রাজেনের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায় চল্লিশ ফিট নীচে থেকেও বোঝা যাচ্ছে তার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। মুখে অদ্ভুত মিষ্টি কিন্তু হিংস্র হাসি।

তেতলায় মনে হচ্ছে কেউ থাকে না। তা হলে প্রাচীন দুর্গের মতো এই বাড়ির ছাদ থেকে শরীরটাকে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে অর্ধেকটা ঝুঁকিয়ে কে এই মেয়েটি, আর তাকে এভাবে দেখছেই বা কেন? তার হাসিটা কী মারাত্মক!

রাজেন ভীতু নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে তার সারা শরীর ভয়ে হিম হয়ে গেল। হৃদপিণ্ডটা এত জোরে জোরে লাফাচ্ছে যে তার শব্দ শুনতে পাচ্ছে রাজেন। সে আর তাকিয়ে থাকতে পারছে না। মাথা নামিয়ে নিল। এত ভয় জীবনে কখনও পায়নি। সামলে নিতে অনেকটা সময় লাগল। তারপর বাঁধানো চাতালটায় চলে এল। সেখানে দাঁড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'অবিনাশকাকা, বন্দনা কাকিমা—'

দোতলার বারান্দার রেলিংয়ের কাছে এসে অবিনাশ দত্ত বলল, 'তুই এসে গেছিস। আয় আয়, আরেকটু এগুলেই বাঁ পাশে সিঁড়ি।'

চাতাল পেরুতে পেরুতে নিজের অজান্তেই যেন দাঁড়িয়ে পড়ে ছাদের দিকে তাকাল রাজেন। আশ্চর্য, সেই তরুণী বউটি নেই, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উধাও হয়ে গেছে। বেশ ধন্দে পড়ে গেল সে। সত্যিই কি বউটি ছিল, নাকি তার চোখের ভ্রম?

কিন্তু বউটাকে স্পষ্ট দেখেছে রাজেন। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার তাকানো, মধুর এবং হিংস্র হাসি তার শরীরে হিমের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। সেটা ভ্রম হয় কী করে? এখনও তো বুকের ভেতরটা লাফিয়ে চলেছে। এই আছে, এই নেই, কে সেই বউটা?

অবিনাশ দত্ত বলল, 'কী হল, দাঁড়িয়ে পড়লি যে?'

ধন্দটা এখনও কাটেনি রাজেনের। থেমে থেমে বলল, 'না না, থামব কেন? যাব, যাব —'

ছেলেটাকে একটু যেন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। দু-এক লহমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাজেনের পা থেকে মাথা অবধি লক্ষ করে অবিনাশ দত্ত বলল, 'তুই ওখানেই থাক। আমি আসছি—।' একটু পরেই সে নেমে এল।—'চল। তোর সুটকেসটা আমাকে দে। অনেকক্ষণ বয়ে বেড়িয়েছিস। নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে—'

'না না, ওটা এমন কিছু ভারী নয়—'

অবিনাশ দত্ত কোনও কথা শুনল না, সুটকেসটা একরকম জোর করেই টেনে নিল।

সিঁড়িতে আলো জ্বলছিল। দু'জনে ওপরে উঠে এল। দোতলায় আসতেই চোখে পড়ল সিঁড়ির বাইরে খানিকটা বাঁধানো চাতাল মতো জায়গা। সেটার বাঁ দিকের শেষ মাথা দিয়ে তেতলায় ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে দরজা। সেটা তালাবন্ধ। আর একতলা থেকে দোতলায় উঠলেই চাতালের ডানপাশে একটা ঘর। ওটা কীসের ঘর বোঝা যাচ্ছে না।

তেতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে যেমন দরজা আছে, একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখেও তেমনি একটা দরজা।

অবিনাশ দত্ত ডাকলেন, 'বন্দনা, তাড়াতাড়ি এসো। রাজেন এসে গেছে।'

দোতলার ছোট চাতালটার সামনের দিকে দু-আড়াই ফিট উঁচু, বেশ বড় একটা বারান্দা। সেখানে জোরালো আলো জ্বলছিল। বারান্দার তিন দিক ঘিরে কয়েকটা ঘর।

একটা ঘর থেকে বন্দনা বেরিয়ে এল। রাজেনের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, 'এসো বাবা, এসো—'

অবিনাশ দত্ত বলল, 'তুমি ওকে বসার ঘরে নিয়ে যাও।—রাজেন তোর সুটকেসটা আমার কাছে থাক। সিঁড়ির দরজায় তালা দিয়ে আসছি—'

এর মধ্যেই রাজেন বুঝে গেছে হাজার বললেও অবিনাশকাকা সুটকেসটা ছাড়বে না। সেটা না হয় ঠিক আছে। কিন্তু রাজেনের মনে একটা খটকা বা প্রশ্ন দেখা দিল। এখনও তেমন রাত হয়নি, খুব বেশি হলে সাতটা কি সওয়া সাতটা। তেতলার সিঁড়ির দরজায় আগেই তালা লাগানো আছে, দোতলার সিঁড়ির দরজাতেও সন্ধেবেলায় কেন তালা ঝোলানো হচ্ছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বন্দনা কাকিমা বলল, 'এসো— এসো—'

চাতাল থেকে বারান্দায় উঠে এল তারা। বারান্দার সোজাসুজি পর পর তিনটে ঘর। বন্দনা কাকিমা রাজেনকে মাঝখানের মাঝারি মাপের ঘরে নিয়ে এল। গোটাতিনেক সোফা, চার-পাঁচটা গদি-আঁটা বেতের চেয়ার, একটা সেন্টার টেবিল আর একদিকের দেওয়াল ঘেঁষা একটা কাঠের আলমারিতে কিছু বই। এই বসার ঘরের আসবাবগুলোর কোনওটাই দামি নয়, সস্তার জিনিস।

বন্দনা কাকিমা বলল, 'বোসো বাবা, বোসো—'

হাতের ব্যাগটা সেন্টার টেবিলের ওপর রেখে একটা সোফায় বসে পড়ল রাজেন।

অবিনাশকাকা সিঁড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে এসে রাজেনের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল।

রাজেনের মনে পড়ে গেল, দোতলায় উঠে আসার পর প্রথম জরুরি কাজটাই করা হয়নি। বন্দনা কাকিমা একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। ব্যস্তভাবে উঠে গিয়ে তাকে প্রণাম করল, তারপর অবিনাশকাকাকে। দু'জনেই তার মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'থাক—থাক—'

প্রণাম-পর্ব সারা হলে ফিরে এসে সোফায় বসেই ক্ষিপ্র হাতে ব্যাগটা খুলে বড় একটা প্যাকেট বের করে বন্দনাকে দিতে দিতে বলল, 'এটা নিন কাকিমা—'

বন্দনা জিজ্ঞেস করল, 'কী আছে এতে?'

'বাবা একটু মিষ্টি পাঠিয়েছে। কাকা তো কাটোয়ার ক্ষীরের পান্তুয়া খুব ভালোবাসে—'

অবিনাশ দত্ত প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'কাটোয়ার ক্ষীরের পান্তুয়া—একেবারে স্বর্গীয় ব্যাপার। ন'বছর আগে তোদের বাড়িতে যখন লাস্ট গেছি, খেয়েছিলাম। এখনও জিভে লেগে আছে।'

বন্দনা ধমক দিল, 'থামো তো। মিষ্টির নাম শুনলে জিভ লক লক করে।—রাজু, সেই কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। ট্রেনে- বাসে অনেক ধকল গেছে। এখন একটু জিরিয়ে নাও। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছাড়ো।' বলে কিছু খেয়াল হতে অবিনাশের দিকে তাকাল।—'তুমি রাজুকে ওর বেডরুম আর আমাদের বাথরুমটা দেখিয়ে দিও। আমি এখন যাই—'

'যাবে মানে? ছেলেটা এল, ওর জন্যে জলখাবার-টাবার—'

‘আমার কি সে হুঁশটা নেই? রাজু কখন এসে পৌঁছুবে তা তো বুঝতে পারছিলাম না। আগে থেকে লুচি ভেজে রাখলে চামড়া হয়ে যেত—’

‘তাই তো—’

বন্দনা কাকিমা চলে গেল।

অবিনাশ দত্ত রাজেনের দিকে তাকাল।—‘হ্যাঁ রে রাজু, বাড়ি চিনে এখানে আসতে অসুবিধা হয়নি তো?’

রাজেন বলল, ‘না না, কীভাবে আসতে হবে, চিঠিতে সব জানিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু —’

‘শুধু কী?’

‘রাধানাথ মল্লিক লেনে ঢোকার পর, মানে গলিটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে—’

রাজেনকে থামিয়ে দিয়ে অবিনাশ দত্ত বলল, ‘পুরোনো পাড়া তো, একে মোড়ের পর মোড়, তার ওপর গ্যাসবাতি, ম্যাড়মেড়ে ইলেকট্রিকের আলো, হ্যারিকেন—তাই একটু ভূতুড়ে ভূতুড়ে লাগে। যুদ্ধের আমল থেকে সাড়ে চোদ্দো টাকা ভাড়ায় পুরো দোতলাটা নিয়ে আছি। সন্ধের পর একটু ভূতুড়ে ভূতুড়ে লাগে। এত কম টাকায় এতগুলো ঘরওলা বাড়ি কলকাতায় এখন আর কোথাও পাওয়া যায় নাকি?’

দু’বার ভূতুড়ে শব্দটা কানে ঢুকতে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রাজেন। অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকা মুড়িমুড়কি দোকানের সেই লোকটা আর তেতলার ছাদ থেকে ঝুঁকে পড়া বউটির চকিতের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা পাশাপাশি মনে পড়ে গেল।

অবিনাশ দত্ত লক্ষ করছিল। জিজ্ঞেস করল, ‘কী রে, কী ভাবছিস?’

‘না, কিছু না—’ একটু চমকে উঠে হাসল রাজেন, ‘আচ্ছা অবিনাশকাকা—’

‘বল—’

‘এ বাড়িতে ঢোকার সময় তেতলাটা অন্ধকার মনে হল। ওখানে কেউ থাকে না?’

‘না তো। ওটা বাড়িওয়ালার অংশ। বর্ধমানে তার তেলকল, চালকল, এই সব আছে। চার-পাঁচ মাস পর একবার এসে কয়েকদিন থেকে চলে যায়। বাকি সময়টা তালা-দেওয়া থাকে।’

‘ওই জন্যেই বুঝি তেতলার সিঁড়ির মুখে তালা?’

‘হ্যাঁ।’

‘তেতলার ছাদে কেউ থাকে না?’

অবিনাশ দত্ত হকচকিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই তার চোখের তারা দুটো একেবারে স্থির। স্বাভাবিক হতে খানিকটা সময় লাগল তার। হেসে হেসে বলল, ‘তুই তো একটা অদ্ভুত ছেলে। তেতলার সিঁড়ির মুখে তালা, ছাদের মুখে তালা। ন্যাড়া ছাদে কেউ থাকতে পারে?’

একতলার চাতাল থেকে পলকের জন্য দেখার পরও মনে হয়েছিল চোখের ভ্রম। অবিনাশকাকা কেউ থাকে না বলার পর এখন তা অবিশ্বাস করার মতো কারণ থাকতে পারে না, কিন্তু কেমন যেন একটা খিঁচ থেকে যাচ্ছে—’

অবিনাশ তাড়া দিল, 'তোর কাকিমার লুচিভাজা বোধহয় শেষ হয়ে এল। এখানে এসে আমাদের বসে থাকতে দেখলে বকুনি লাগাবে। ওঠ, ওঠ, আগে তোকে তোর ঘরে নিয়ে যাই—' রাজেনের সুটকেসটা তুলে নিয়ে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

রাজেন তার ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে অবিনাশকাকার পিছু পিছু চলেছে। তার মনে হল, ছাদের ব্যাপারটা এড়ানোর জন্যে অবিনাশকাকা বড় বেশি তাড়াহুড়ো করে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ভুলও হতে পারে।

বাইরে থেকে বারান্দায় উঠলে সোজাসুজি তিনটে ঘর। বারান্দার ডানপাশে এবং বাঁ-পাশে আরও দুটো ঘর রয়েছে। রাজেনের চোখে পড়ল ডানপাশের ঘরটায় আলো জ্বলছে। সেখান থেকে ছ্যাঁক ছোঁক আওয়াজ আসছে। ওখানে পেছন ফিরে কোনাকুনি বসে কিছু করছে বন্দনা কাকিমা। নিশ্চয়ই ওটা রান্নাঘর।

অবিনাশ দত্ত রাজেনকে নিয়ে বারান্দার বাঁ-পাশের ঘরটার সামনে চলে এল। দরজার পাল্লা দুটো ভেজানো।

'একটু দাঁড়া—' দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে অবিনাশকাকা ডাকল, 'এবার আয়—'

ঘরটা আলোয় ভরে গেছে। ভেতরে যেতেই চোখে পড়ল, একধারে সিঙ্গল-বেড খাটে পরিপাটি করে বিছানা পাতা। তা ছাড়া একটা আলমারি, লেখার জন্য চেয়ার-টেবিল ছাড়াও, একটা নীচু ছোট টেবিলে জলের বড় জগ, কাচের গ্লাস, সাবান, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, এমনি টুকিটাকি আরও কিছু জিনিস।

অবিনাশ দত্ত বলল, 'এটা তোর ঘর। আলমারিতে সব জিনিসপত্র রাখবি। ওই হল পড়ার টেবিল। এখন আর বসতে হবে না। তা হ্যাঁ রে, ঘরে পরার মতো জামা- কাপড়, তোয়ালে এনেছিস? নাকি—'

ব্যস্তভাবে রাজেন বলল, 'সব এনেছি।' হাতের ব্যাগটা খুলে পাজামা, হাফশার্ট আর নতুন গামছা বের করল রাজেন।

'গুড। ওগুলো তো নিবিই, ও হ্যাঁ, সাবানটাও নে—'

অবিনাশ দত্ত'র কথামতো পাজামা গামছা-টামছা গুছিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে চানঘরের কাছে চলে এল রাজেন।

একতলা থেকে দোতলায় উঠে এলে সিঁড়ির মুখের দরজাটার পাশের ঘরটাই হল চানঘর বা বাথরুম। সেটার দরজার মাথায় শেকল তোলা। সেটা নামিয়ে দরজা খুলে দিল অবিনাশকাকা। বলল, 'ভেতরে যা। ডানদিকের দেওয়ালে সুইচ আছে। টিপলেই আলো। যা যা—'

ঢুকে পড়ল রাজেন। আলো জ্বালতেই দেখা গেল জলে ভর্তি বিরাট চৌবাচ্চা, পায়খানা, বালতি, মগ, সব মজুদ। একধারে একটা লম্বা দড়ি টাঙানো। সেটার ওপর পাজামা-টাজামা ঝুলিয়ে দিল। গায়ে সারাদিনের ধুলো-ধোঁয়া লাগানো চটকানো- মটকানো ধুতি, শার্ট রয়েছে। সে ঠিক করে ফেলল, এগুলো নিজেই কেচে ফেলবে।

দরজা খোলা রয়েছে। বাইরে থেকে লক্ষ রাখছিল অবিনাশ দত্ত। বলল, 'গায়ের কাপড়-টাপড় একধারে রেখে দে। কাল কাজের মেয়ে এসে কেচে দেবে। দরজা বন্ধ করে হাত-পা মুখ-টুখ ধুয়ে নে। বেরুবার সময় আলো নিভিয়ে দিবি। আমি বারান্দায় বসে থাকব।'

বারান্দায় কেন বসে থাকবে অবিনাশকাকা? একটু খটকা লাগল রাজেনের। কিন্তু না, সারাদিনের প্রচণ্ড ধকলের পর সমস্ত শরীর এলিয়ে আসছে। এখন এ নিয়ে ভাবার মতো এনার্জি তার আর নেই। চটপট হাত, মুখ-টুখ ধুয়ে পোশাক পালটে আলো নিভিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে।

চানঘরের দরজায় শেকল লাগাতে লাগাতে আচমকা খসখসে আওয়াজ কানে এল। চমকে উঠল রাজেন। এ বাড়িতে ঢোকার পর ছাদের দিক থেকে অবিকল এইরকম শব্দ তার কানে এসেছিল। ওপর দিকে মুখ তুলতে সেই বউটিকে দেখতে পেয়েছিল সে।

আওয়াজটা থামছে না। দিশেহারার মতো এধারে-ওধারে তাকাতে তাকাতে চোখ দু'টো দোতলার সিঁড়ির মুখের দরজার দিকে চলে গেল। একটু আগেই অবিনাশ- কাকা ওটার কড়ায় তালা লাগিয়ে দিয়েছিল। আওয়াজটা একটু স্পষ্ট হল।— 'ভয় পাচ্ছ!' তারপরেই রিনরিনে হাসি।

গায়ের লোমগুলো মুহূর্তে খাড়া হয়ে গেল রজেনের। শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে কনকনে বরফের স্রোত যেন বইতে লাগল। আশপাশে কেউ নেই। সে বুঝতে পারছে তালাবন্ধ সিঁড়ির দরজাটার ওধার থেকেই হাসি-টাসির আওয়াজটা আসছে। কে? কে হতে পারে?

অবিনাশকাকা বলল, 'কী রে, দাঁড়িয়ে পড়লি যে? চলে আয়—'

সারা শরীর ভারী হয়ে গেছে রাজেনের। সে যে বারান্দার দিকে পা ফেলবে, সেই শক্তিটুকুও যেন আর নেই। প্রচণ্ড ভয়ে সে সিঁটিয়ে গেছে।

অবিনাশের দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে কী ভেবে উঠে পড়ল সে। দু'চার পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'শরীর খারাপ লাগছে?'

অবিনাশকাকা কাছাকাছি চলে আসায় ভয়টা অল্প হলেও কেটে গেল; কিছুটা সাহসও ফিরে এসেছে।

রাজেন বলল, 'হ্যাঁ, মানে—' হাসি- টাসির কথাটা জানাল না।

'সারাদিন অনেক ছোটাছুটি গেছে। শরীর তো ছেড়ে দেবেই। আয়—'

বারান্দার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে মাথা কাত করে সেই দরজাটার দিকে তাকাল রাজেন।

অবিনাশ জিজ্ঞেস করল, 'কী দেখছিস রে? কেউ কি ওখানে আছে?'

'না না, কেউ না—' এ বাড়িতে ঢোকার পর নীচের চাতাল থেকে চকিতের জন্য ছাদে যাকে দেখেছিল, পরে মনে হয়েছে সেটা তার চোখের ভ্রম হতে পারে। এখনও এই হাসি, কথা বলা ভ্রমই হবে হয়তো। আজ এসব কী হচ্ছে তার? সে অসীম সাহসী নয় ঠিকই, ভীরুও তো নয়। তাকে সাত সাতটা অফিসে বিরাট বিরাট কোম্পানির বাঘা বাঘা সব অফিসারদের সামনে গিয়ে ইন্টারভিউ দিতে হবে। এর ওপরেই তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। একটা চাকরি তার চাইই চাই। কে হাসল, কে ফিসফিস করে কথা বলল, এসব আজেবাজে, উটকো ব্যাপার মাথা থেকে বের করে দেওয়া দরকার। এখন যা ভাবাভাবি সব ইন্টারভিউ নিয়ে।

অবিনাশকাকা বলল, 'চল, তোর ঘরে আগে যাওয়া যাক। চুল-টুল আঁচড়ে তুই আমার সঙ্গে বসার ঘরে যাবি।'

খুব অবাকই হল রাজেন। যতক্ষণ সে চানঘরে ছিল, অবিনাশকাকা বারান্দায় বসে কি তাকে পাহারা দিয়েছে? এখন আবার সঙ্গে যেতে চাইছে। কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

রাজেন আপত্তি করল না। চুল-টুল আঁচড়ানো হলে অবিনাশকাকা তাকে সঙ্গে করে বসার ঘরে ফিরে এল। রান্নাঘর থেকে বন্দনা কাকিমা তাদের দেখতে পেয়েছিল। বলল, 'লুচিভাজা হয়ে গেছে। আমি আসছি—'

দু'টো বড় প্লেট বোঝাই করে লুচি, বেগুনভাজা, আলুভাজা, আর মিষ্টি নিয়ে এসে টেবিলে রেখে দু'গ্লাস জল আর নিজের জন্য ছোট একটা প্লেটে দু'খানা লুচি আর কয়েক টুকরো আলুভাজা নিয়ে ফিরে এল। একটা সোফায় বসতে বসতে বলল, 'নাও শুরু কর —'

রাজেন বলল, 'আমি এত খেতে পারি না।'

'এত আবার কোথায়? আটটাও বাজেনি। রাতের খাওয়া খেতে খেতে এগারোটা, সাড়ে এগারোটা। খাও, খাও—'

'এখন খেলে আবার রাত্তিরে—'

'কাকা-কাকিমার কাছে এসেছ, লজ্জা কীসের? এই বয়েসের ছেলে, এখনই তো খাবে। প্লেটে হাত দাও—' হেসে হেসে হালকা ধমকের সুরে বন্দনা বলল।

রাজেনও একটু হেসে লুচি ছিঁড়ে মুখে পুরল। খেতে খেতে গল্পও হচ্ছে, সেই সঙ্গে কাজের কথাও। বিশেষ করে যে কারণে রাজেনের কলকাতায় আসা সেই ইন্টারভিউ নিয়ে জানতে চাইছে অবিনাশকাকারা। কবে কোন অফিসে ক'টার সময় ইন্টারভিউ, সব জানতে চাইল তারা।

সব শুনে অবিনাশকাকা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাংক, রেল আর অন্য সব কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে গেলে কী ধরনের প্রশ্ন করতে পারে, সেগুলোর কী উত্তর হয়, এইসব প্রশ্নোত্তর সাজিয়ে অনেক বই বাজারে বেরিয়েছে। সেসব দেখেছিস?'

'হ্যাঁ কাকা। ওইরকম চারটে বই কিনে দু'মাস ধরে পড়ছি। সঙ্গে করে নিয়েও এসেছি।'

'গুড। আজ থাক। কাল থেকে ফের বার বার পড়ে ঝালিয়ে নিস।'

কথায় কথায় রাত বাড়তে থাকে। হঠাৎ রন্টুর কথা মনে পড়ল রাজেনের। অবিনাশকাকার ছেলে রন্টু, যার অন্য একটা নামও আছে—দীপক। বেশ কয়েকবার সে অবিনাশকাকার সঙ্গে কাটোয়ায় তাদের বাড়িতে গেছে। বলল, 'রন্টুকে তো দেখছি না—'

'ও, তোকে বলতে ভুলে গেছি, তিনমাস হল আসানসোলে চাকরি পেয়েছে রন্টু। ও সেখানেই থাকে। সপ্তাহে শনি-রবি দু'দিন ছুটি। শুক্রবার অফিসের ডিউটি শেষ হলে সন্ধের ট্রেনে কলকাতায় আসে। আমাদের কাছে দু'দিন কাটিয়ে সোমবার ভোরের ট্রেনে ফিরে যায়। তবে এই উইকে আসবে না। অফিসে কী একটা জরুরি কাজে ওকে আসানসোলে থেকে যেতে হবে।'

রাত এগারোটা বাজলে রাতের খাওয়া শেষ হলে অবিনাশ দত্ত রাজেনকে নিয়ে তার ঘরে এল। বলল, 'জল-টল সব আছে। যদি কলঘরে যেতে হয়, আমাদের ডাকবি। হুট করে একা একা চলে যাস না। মনে থাকবে?'

'থাকবে।' রাজেন ঘাড় কাত করল।

'এবার আমি যাব। তুই ভেতর থেকে ভালো করে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে, লাইট নিবিয়ে শুয়ে পড়। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা, এই ঘরের ডান দিকের দেওয়ালে একটা জানলা আছে। আমি সেটা আগেই বন্ধ করে রেখেছি। জানলার বাইরে একটা সরু গলি। রাত্তিরে যদি ওদিক থেকে কারও গলার আওয়াজ বা হাসির শব্দ শুনতে পাস, কান দিবি না।'

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল রাজেনের। এই তো সন্ধেবেলা সে যখন কলঘর থেকে বেরিয়ে আসছে, দোতলার সিঁড়ির মুখের বন্ধ দরজাটার ওধার থেকে গলার স্বর আর রিনরিনে হাসির আওয়াজ কানে এসেছিল। অবিনাশকাকা কি এই কথাই বলছে? উৎকণ্ঠায় তার গলা শুকিয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার গলার স্বর? কে হাসবে?'

'কতরকম পাজি লোক আছে। রাত বাড়লে হইচই করতে করতে তারা ওই গলিটা দিয়ে যায়। যতসব বজ্জাতের ধাড়ি। রাত্তিরে ওই জানলাটা কিছুতেই খুলবি না। আর দাঁড়িয়ে থাকিস না। শুতে যা—'

অবিনাশকাকা চলে গেছে। আলো নিবিয়ে, দরজায় হুড়কো লাগিয়ে শুয়ে পড়েছে রাজেন। ঘরের ভেতরটা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেছে।

আশপাশের কোনও বাড়ি থেকে বারোবার ঘণ্টা পেটানোর মতো জোরালো আওয়াজ করে একটা ঘড়ি জানিয়ে দিল এখন রাত বারোটা। রাধানাথ মল্লিক লেন নিঝুম হয়ে গেছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। কিন্তু ঘুম আসছে না রাজেনের। আজ সন্ধের মুখে আদ্যিকালের কলকাতার এই এলাকায় পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যা ঘটেছে বার বার চোখের সামনে তা ফুটে উঠছে। মুড়ি-মুড়কির দোকানের সেই লোকটা, ছাদের রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বউটা যার মুখে মধুর কিন্তু হিংস্র হাসি, কলঘরের পাশে দোতলার সিঁড়ির মুখের বন্ধ দরজার ওধার থেকে কোনও তরুণীর ডাক, রিনরিনে হাসি, সব কেমন যেন অস্বাভাবিক। অদ্ভুত, ভয়ংকর এক রহস্যে ঘেরা। তা ছাড়া অবিনাশকাকার ব্যাপার-স্যাপার কি আদৌ স্বাভাবিক? সারাক্ষণ সে যেন তাকে পাহারা দিয়ে চলেছে। চানঘরে যখন রাজেন ঢুকল—সে বারান্দায় বসে বসে নজর রাখছিল। রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর এই ঘরে এসে নানাভাবে সাবধান করে গেছে। রাত্তিরে ডানদিকের জানলা খোলা যাবে না। হুট করে একা কলঘরে যাওয়া চলবে না। যাওয়ার আগে অবিনাশকাকাদের ডেকে তুলতে হবে। খুব সম্ভব সে যতক্ষণ কলঘরে থাকবে, অবিনাশকাকারা বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এ ঘরের বন্ধ জানলার বাইরের গলিটা থেকে রাত্তিরে কেউ কথা-টথা বললে বা হেসে উঠলে সেসবে কান দিতে বারণ করা হয়েছে। তখন খেয়াল হয়নি, আচমকা এখন মনে হল, কলঘরের পাশের বন্ধ দরজার ওধার থেকে যে রিনরিনে গলায় হেসেছিল, তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, সে-ই কি বন্ধ জানলার ওপাশ থেকে তাকে ডাকাডাকি করবে, তেমনি রিনরিন করে হেসে উঠবে?

না না, এসব ভাবনাকে আশকারা দেবে না রাজেন। দেবে না বললেই হল। টের পাওয়া যাচ্ছে, বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা সমানে লাফাচ্ছে। সারা গায়ে বিন বিন করে ঘাম বেরুচ্ছে।

রাজেন এরই মধ্যে জোর করে চোখ বুজে ঘুমোতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুমবো বললেই ঘুমনো যায়?

কাছাকাছি সেই বাড়ির ঘড়িটা তীব্র আওয়াজ করে কিছুক্ষণ পর পর জানিয়ে দিল এই একটা বাজল, এই দু'টো বাজল। কিন্তু না, জানলার বাইরে থেকে কারও গলার স্বর বা হাসির শব্দ শোনা গেল না।

যে ভয়টা বুকের ওপর চেপে বসেছিল, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। সহজভাবে সে এবার শ্বাস টানতে পারল। দু'চোখ আস্তে আস্তে জুড়ে এল তার।

পরদিন কাদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল রাজেনের। ধড়মড় করে উঠে পড়ল সে। প্রথমটা বুঝতে পারল না সে কোথায় আছে। তারপর ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে দরজা খুলল। বারান্দায় অবিনাশকাকা আর বন্দনা কাকিমা। দু'জনের চোখেমুখে উদ্বেগের ছাপ। অবিনাশকাকা বলল, 'কত বেলা হয়েছে জানিস? সাড়ে ন'টা। তোর কাকিমার আর আমার ভীষণ চিন্তা হচ্ছিল। ভাবছিলাম কী হল ছেলেটার? এত বেলা অব্দি ঘুমোবার তো কথা নয়। যাক, এখন নিশ্চিন্ত। চট করে মুখ-টুখ ধুয়ে নে। কলঘরটা তো চিনিস। তোর কাকিমা জলখাবার তৈরি করে রেখেছে। যা যা—'

অবিনাশকাকারা চলে গেল।

বাসি পোশাক ছাড়তে হবে। ঘরে পরার মতো সাদা পাজামা, হাফশার্ট, গামছা, ব্রাশ আর টুথপেস্ট নিয়ে কলঘরে চলে এল রাজেন।

ছাদের দিক থেকে কোনাকুনি ঝলমলে রোদ এসে পড়েছে। এখন তো রাত নয়, তাই বোধহয় অবিনাশকাকাকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখা গেল না। বারান্দা থেকে নেমে কলঘরের দিকে যেতে চোখে পড়ল, দোতলার সিঁড়ির দরজাটা হাট করে খোলা।

মুখ-টুখ ধুয়ে পোশাক বদলে বাসি কাপড়-চোপড় কলঘরে রেখে বেরিয়ে এল সে। বসার ঘর থেকে অবিনাশকাকা তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'গামছা-টামছা রেখে এখানে আয়। দেরি করবি না—'

'আচ্ছা—' একটু পরেই চলে এল রাজেন।

অবিনাশকাকা গলার স্বর উঁচুতে তুলে বলল, 'বন্দনা, রাজু এসে গেছে—'

রান্নাঘর থেকে বন্দনা কাকিমার গলা ভেসে এল।—'দেখেছি। দু'মিনিট—'

দু'মিনিটও লাগল না প্লেটে প্লেটে খাবারদাবার সাজিয়ে বন্দনা কাকিমা চলে এল।

কাল জলখাবারে ছিল লুচি, আজ পরোটা, আলুর দম, মিষ্টি।

কালই রাজেন বুঝতে পেরেছে অবিনাশকাকাদের বসার ঘরটা খাওয়ার ঘরও।

খেতে খেতে কথাও হচ্ছে। অবিনাশকাকা জিজ্ঞেস করল, 'তোর ফার্স্ট ইন্টারভিউটা কবে?'

'পরশু—'

'ব্যাংকে, না রেলে?'

'একটা ওষুধ কোম্পানির হেড অফিসে।'

'সেটা কোথায়?'

‘ডালহৌসির ক্লাইভ স্ট্রিটে। রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কাছে—’

‘আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।’

‘না না, আমি একাই যেতে পারব। গেল বছর ক্লাইভ স্ট্রিটেরই অন্য একটা অফিসে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা চিনি—’

‘ঠিক আছে। এখন জলখাবার খেয়ে ইন্টারভিউর জন্যে যে নোট-বইগুলো এনেছিস, ভালো করে দেখে নিবি।’

‘হ্যাঁ।’ আস্তে মাথা নাড়ল রাজেন।

একটু চুপচাপ।

তারপর অবিনাশ দত্ত দোনোমনো করে বলল, ‘হ্যাঁ রে রাজু, কাল রাত্তিরে ভয়-টয় পাসনি তো?’

‘ভয় পাব! কেন?’

‘না মানে, নতুন জায়গায় একা একা শুয়েছিস। পাশের গলির দিক থেকে কোনও গোলমাল-টোলমাল, হাসি-টাসি—’

কাল সন্ধেবেলায় কলঘরের পাশে দোতলার সিঁড়ির দরজার ওধার থেকে খসখসে গলার স্বর আর রিনরিনে হাসির আওয়াজ কানে এসেছিল রাজেনের। কিন্তু একবারই। অবিনাশকাকা বেশ কয়েকবার ওই হাসি-টাসির কথা কাল বলেছে। আজও আবার বলল।

রাজেন জিজ্ঞেস করল, ‘এরকম কেউ একজন হাসে, কথা বলে, আপনি তাকে জানেন নাকি?’

থতমত খেয়ে অবিনাশকাকা বলল, ‘আমি, আমি কী করে জানব? আমাদের এই এলাকাটা তো কলকাতার সবচেয়ে পুরোনো পাড়া। এখানে সব কিছুই হতে পারে। তাই সাবধানে থাকতে হয়।’

শুধু ওই হাসি আর গলার স্বরটা ছাড়া অন্য কী শোনা যেতে পারে বা ঘটতে পারে সেসব নিয়ে একটি শব্দও অবিনাশকাকা উচ্চারণ করে না। এই একটা ব্যাপারই তার মাথায় চেপে বসে আছে।

রহস্যটা কী হতে পারে? না, এ নিয়ে আর কিছু জানতে চাইল না রাজেন।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। রাজেন উঠে পড়ল।—‘যাই, নোট-বইগুলো দেখে নিই গে—’

অবিনাশকাকা বলল, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, যা। দিনের বেলা তোর ঘরের জানলাটা খুলে রাখতে পারিস—’

রাজেন চলে গেল। নিজের ঘরে এসে জানলাটা প্রথমেই খুলে দিল। অবিনাশকাকা যা বলেছিল ঠিক তাই। সরু, নোংরা একটা গলি। তার ওধারে নোনা-ধরা, রং-চটা আশি-নব্বই বছরের সেকেলে সব বাড়ি। বেশির ভাগেরই পলেস্তারা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। নীচে বেশ লোকজন দেখা যাচ্ছে।

পড়ার টেবিলটা জানলার ধার ঘেঁষে। বই-টই নিয়ে রাজেন সেখানে বসে পড়ল।

চোখের পলকে দু'টো দিন কেটে গেল। হিংস্র-মধুর হাসি যার মুখে সেই বউটিকে আর দেখা যায়নি। দরজা বা জানলার আড়াল থেকে তার খসখসে গলা বা হাসির আওয়াজও কানে আসেনি। মনটা বেশ হালকা হয়ে গেছে।

এই দু'দিনে ভয় বা আতঙ্কটা পুরোপুরি কেটে গেছে রাজেনের। ছাদে যে বউটিকে দেখেছিল বা অশরীরী কারও হাসির বা গলার স্বর শুনেছিল সেসব যে তার চোখের আর কানের ভ্রম, এ নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিন্তু মনে হয় অবিনাশকাকার অটুট বিশ্বাস, এই বাড়িতে কেউ একজন আছে যে ওইভাবে হাসে, কথা বলে এবং চকিতের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। তার একমাত্র মন্ত্র 'সাবধানের মার নেই'। দিনের বেলা রাজেনকে চোখে চোখে না রাখলেও চলে, কিন্তু সন্ধেটি যেই নামল পাহারাদারি শুরু হয়ে গেল। নিজে এসে রাজেনের ঘরের জানলা বন্ধ করে দেবে। রাজেন যখন চানঘরে যাবে, সে চেয়ার এনে বারান্দায় বসে পড়বে। দু'দিন কেটে যাবার পর এখন একটু মজাই লাগছে রাজেনের। অবিনাশকাকা যা করছে সেটা বাড়াবাড়িই।

আজ রাজেন প্রথম ইন্টারভিউটা দিতে যাবে। তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তা অবিনাশকাকা আর বন্দনা কাকিমার। কাল রাত্তিরেই ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিল তারা।

সাড়ে সাতটায় রাজেনের ঘুম ভাঙিয়ে দিল অবিনাশকাকা।—'যা, তাড়াতাড়ি চান করে নে।'

চান সারা হলে পোশাক পালটে, মোটামুটি ফিটফাট হয়ে নিল। এর মধ্যেই বন্দনা কাকিমার রান্নাবান্না শেষ।

খাওয়াদাওয়া চুকলে অবিনাশকাকা আর বন্দনা কাকিমাকে প্রণাম করে রাজেন বলল, 'যাচ্ছি—'

'আয়। ইন্টারভিউতে খুব ভেবেচিন্তে উত্তর দিবি। একদম ঘাবড়াবি না।'

দোতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বন্দনা কাকিমার গলা কানে এল।— 'দুর্গা, দুর্গা—'

সেই যে দু'দিন আগে সে এসে দোতলায় উঠেছিল তারপর আর নীচে নামা হয়নি। সেদিন সন্ধের আবছা অন্ধকারে একতলায় যে দু'টো ভাড়াটে ফ্যামিলি থাকে তাদের কারওকে স্পষ্ট দেখা যায়নি। আজ কিন্তু দেখা গেল। সবাই চোখ গোলাকার করে তাকে লক্ষ করছে।

সে কি দেখার মতো বস্তু? ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে রাজেনের। লম্বা লম্বা পা ফেলে একতলার চাতালটা পেরিয়ে সুড়ঙ্গের মতো গলিটায় চলে এল সে। নিজের অজান্তেই ঘুরে দাঁড়াল। টের পেল চুম্বকের মতো তেতলার ছাদটা তার চোখ দু'টোকে টানছে। সেদিকে তাকাতে সেই বউটিকে, যার মুখে হিংস্র মধুর হাসি, দেখা গেল। ছাদের রেলিং ধরে সে ঝুঁকে নেই। রেলিং থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাকে হাতছানি দিচ্ছে।

কালই সে ভেবেছিল এমন কেউ নেই, সবই চোখের ভুল, এসব অবিনাশকাকার বাড়াবাড়ি। কিন্তু আজ প্রকাশ্য দিবালোকে ঝকঝকে রোদে প্রাচীন কলকাতা যখন ভেসে যাচ্ছে সেইসময় সে দেখা দিল। তার মানে—আছে, আছে, আছে—

বুকের ভেতরে দু'দিন আগের মতোই হিমের স্রোত বয়ে গেল। ছাদের দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না রাজেন। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই ছাদের সেই হাড়-হিম-করা রহস্যময়ী অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই রাজেনের। শরীরটা ভীষণ ভারী ভারী লাগছে। ঘোরের মতো কিছু একটা তার ওপর চেপে বসেছে। মেসমেরাইজ অর্থাৎ সম্মোহন করলে কি এরকম হয়?

একসময় রাজেনের মনে পড়ল, আজ তার প্রথম ইন্টারভিউ। ঘোরটা একরকম জোর করেই কাটিয়ে নিতে চাইল সে। ভারী শরীরটা টানতে টানতে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে রাধানাথ মল্লিক লেন নামের ছাপ্পান্ন পাকের গলিতে চলে এল। সেখান থেকে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে এসে বাস ধরল।

ক্লাইভ স্ট্রিটে যখন রাজেন পৌঁছল, এগারোটা বাজতে বেশি বাকি নেই। পাগলের মতো ছোটাছুটি করে ক্লাইভ স্ট্রিটে আলফ্রেড অ্যান্ড নিকলসন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির হেড অফিসটাও খুঁজে বের করা গেল। ইন্টারভিউতে বসার সুযোগও পেল রাজেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সে পৌঁছোতে পেরেছে।

যাঁরা ইন্টারভিউ নিয়েছেন তাঁদের দু'জন পাক্কা ইংরেজ, দু'জন বাঙালি। প্রশ্নগুলো চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছিল। সবই ইংরেজিতে। ঘোরটা অনেকখানি কাটলেও পুরোটা নয়। যা যা মুখে এসেছে এলোপাতাড়ি বলে গেছে সে। এই চাকরিটার আশা নেই বলেই মনে হয়।

ইন্টারভিউর পর অনেকটা সময় ডালহৌসির রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল রাজেন। বিকেল যখন ফুরিয়ে আসছে, সন্ধে নামে নামে, সেইসময় রাধানাথ মল্লিক লেনে ফিরে এল সে।

ইন্টারভিউ দিতে যাবার সময় কোনও দিকে তাকায়নি রাজেন। অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে দৌড়তে দৌড়তে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউর দিকে চলে গিয়েছিল। এখন, এই সন্ধের মুখে তেরো নম্বর বাড়িটায় ঢুকতে গিয়ে চোখে পড়ল মুড়িচিঁড়ের দোকানের সেই লোকটা গলা বাড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। তার চোখে অসীম কৌতূহল, সেই সঙ্গে কেমন একটা ভয় ভয় ভাব।

কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল রাজেন। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কিছু বলবেন?'

দোকানদার থতমত খেয়ে গেল।—'না, বাবু, এই—'

'এই কী?'

ঢোঁক গিলল লোকটা।—'আপনাকে আগে কক্ষনো দেখিনি।'

রাজেন বলল, 'দেখার কথা নয়। আমি এখানে নতুন এসেছি।'

'তেরো নম্বর বাড়িটায় কদ্দিন থাকবেন?'

সে কোথায়, কতদিন থাকবে তাই নিয়ে লোকটার এত কৌতূহল কেন? সেই সঙ্গে বেশ উদ্বেগও। রাজেন জিজ্ঞেস করল, 'কেন বলুন তো?'

লোকটা হকচকিয়ে গেল।—'না, ও কিছু না। শুনেছি তেরো নম্বর বাড়িটা আশি-নব্বুই বছরের পুরোনো। কলকাতায় এই ধরনের বাড়িতে কত কিছুই তো হয়। তাই আর কি —'

রাজেনের মনে পড়ে গেল, অবিনাশকাকাও ওই বাড়িটা সম্পর্কে এইরকম কিছু বলেছে। তেরো নম্বরের গা ঘেঁষে যার দোকান সেও কি আর ওই বাড়িটার রহস্য জানে না? যে অশরীরী মাঝে মাঝে দর্শন দিয়ে হিংস্র মধুর হেসে হাতছানি দেয়, খসখসে গলায় কথা বলে তার খবরও কি দোকানদারটা রাখে না? রাখাটাই স্বাভাবিক।

লোকটাকে বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। রাজেন আঁচ করে নিল তার কোনওরকম ক্ষতি হয়, দোকানদার তা চায় না। স্পষ্ট করে না হলেও সে যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে তেরো নম্বর বাড়িটায় তার থাকা ঠিক হবে না।

সে ঠিক করে ফেলল, আর দাঁড়াবে না। তেরো নম্বরের দিকে পা বাড়াতে যাবে দোকানদার ডাকল, 'বাবু যাবেন না।'

'কিছু বলবেন?' রাজেন তার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ—' দোকানদার মাথা নাড়ল।— 'আরেকটু এগিয়ে আসুন।'

রাজেন অবাক হল।—'কেন বলুন তো?'

'যা বলছি তাই করুন।'

কী ভেবে এগিয়েই গেল রাজেন। দোকানদার চকিতে এধার-ওধার দেখে নিল। না, ধারে-কাছে কেউ নেই। সে একটা নীচু টুলের ওপর বসে ছিল। ঝুঁকে রাজেনের কানের কাছে মুখটা এনে খুব চাপা গলায় বলল, 'বাবু, আপনাকে আগেও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছি, তেরো নম্বরটায় থাকা ঠিক হবে না। যত শিগগির পারেন চলে যান। আপনি কিন্তু আমার কথা শুনছেন না।'

'ওই বাড়িটায় থাকলে কোনও বিপদ- টিপদ হতে পারে?'

'পারে বাবু।'

'কী বিপদ?'

'ও বাড়িটায় আগে নতুন যারা এসেছে তাদের ভেতর তিনজন খুন হয়ে গেছে।'

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল রাজেনের। মিয়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে খুন করেছে? কেন?'

'সে আমি বলতে পারব না। মাফ করবেন।'

একটু দূরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তড়িদগতিতে মুখ সরিয়ে নিয়ে টুলের ওপর সোজা হয়ে বসল দোকানদার।— 'লোক আসছে। আর দাঁড়াবেন না। চলে যান, চলে যান। আর যা শুনলেন, কারওকে কিন্তু বলবেন না।'

খুনের কথাটা শোনার পর থেকে মাথা ঝিমঝিম করছে রাজেনের। তেরো নম্বর বাড়ির পুরোনো বাসিন্দাদের কোনও ভয় নেই। নতুন কেউ এলে তাদের কারও কারও খুন হয়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। রহস্যটা কী? না, ঠিকমতো গুছিয়ে ভাবা যাচ্ছে না। সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। অন্যমনস্কের মতো এলোমেলো পা ফেলে সে তেরো নম্বর বাড়িটায় ঢুকে গেল। সুড়ঙ্গের মতো সরু গলিটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে এসে হঠাৎ নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সঙ্গে সঙ্গে তার দুই চোখ তেতলার ছাদের দিকে চলে গেল।

কিন্তু না, প্রথম দিন যে বউটিকে ছাদে দেখেছিল, যার মুখে ছিল হিংস্র অথচ মধুর হাসি, সে এখন নেই। যাক স্বস্তি। জোরে শ্বাস টেনে রাজেন এগিয়ে গেল।

প্রাচীন কলকাতার এই ঘিঞ্জি এলাকায় সূর্য পশ্চিমদিকে খানিকটা নেমে গেলে তেরো নম্বর রাধানাথ মল্লিক লেনে একফোঁটা রোদ ঢোকে না। ভেতরটা এর মধ্যেই কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা। মিনিট দশেকও লাগবে না, তার মধ্যে ঝপ করে অন্ধকার নেমে যাবে।

একতলার চাতাল পেরিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়িগুলোর কাছে চলে এল রাজেন। চারটে, সাড়ে-চারটে বাজলেই সিঁড়ির গায়ে আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আজও তার হেরফের হয়নি।

রাজেন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল। অবিনাশকাকা আর বন্দনা কাকিমা বাইরের বারান্দায় বেতের মোড়ায় বসে গল্প করছিল।

'আমরা তোর কথাই ভাবছিলাম। সেই কখন বেরিয়েছিস। এত দেরি হল? খুব চিন্তা হচ্ছিল রে—' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল অবিনাশকাকা। বন্দনা কাকিমাও।

রাজেন উত্তর দেবার আগেই অবিনাশকাকা ফের বলল, 'ডালহৌসি তো এখান থেকে খুব দূরে নয়। বাসে আসতে কতক্ষণ আর লাগে। ঠিক আছে, জামাকাপড় পালটে, হাতমুখ ধুয়ে বসার ঘরে চলে আয়। চা খেতে খেতে তখন ভালো করে কথা হবে।'

মিনিট পনেরো বাদে বসার ঘরে চলে এল রাজেন। অবিনাশকাকা একাই বসে ছিল। বলল, 'বসে পড়। তোর কাকিমা চা'টা করতে গেছে। রাঙা আলুর পুলি আর সিঙাড়াও বানিয়ে রেখেছে। বোস—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চা এবং সিঙাড়া- টিঙাড়া নিয়ে চলে এল বন্দনা কাকিমা।

খেতে খেতে অবিনাশকাকা জানতে চাইল, 'তোর ইন্টারভিউ কেমন হল এবার বল—'

একটু চুপ করে থেকে রাজেন বলল, 'খুব একটা ভালো হয়নি কাকা—'

'কেন রে? তুই তো বেশ তৈরি হয়েই গিয়েছিলি। খুব খারাপ হবে কেন?' একটু চিন্তিতই দেখাল অবিনাশ দত্তকে।

রাজেন বলল, 'ইন্টারভিউ যারা নিয়েছে তাদের মধ্যে খাঁটি সাহেবও ছিল। তারা গাঁক গাঁক করে কী জিজ্ঞেস করছিল বুঝতে পারছিলাম না।'

'ঘাবড়ে না গিয়ে স্মার্টলি জবাব দিয়েছিস তো?'

'স্মার্টলি কিনা বলতে পারব না। তবে আন্দাজে আন্দাজে ওদের কোশ্চেনগুলো যা বুঝেছি উত্তর দিয়েছি। আমার ইংরেজি তো, নিশ্চয়ই অনেক ভুলভাল থেকে গেছে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

অন্যমনস্কের মতো কথা বলছিল রাজেন। অন্যমনস্কের মতোই খাচ্ছিল। মুড়ি-মুড়কির দোকানের সেই লোকটার কথাগুলো বার বার ঘুরে ঘুরে তার মনে পড়ে যাচ্ছে। আশি-নব্বই বছর আগের ঝরঝরে পলেস্তারা-খসা সাবেক বিল্ডিংটায় নতুন যারা আসে তাদের অনেকেই নাকি খুন হয়ে গেছে। নতুন লোক এলে খুন হবে কেন? কারণটাই বা কী? এ প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। লোকটা তাকে দু-একদিনের ভেতর তেরো নম্বর বাড়িটা ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। তাকে কি খুন করা হবে? সেই ইঙ্গিতটাই কি দোকানদারটা দিয়েছে? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ রাজেনের মনে হল, মুড়ি- মুড়কিওয়ালা তাকে ভয় দেখাতে এসব বলেছে। পরক্ষণে ভাবল, যাকে মাত্র দু-তিনদিন রাস্তায় দেখেছে, পুরোপুরি অচেনা, কেন তাকে ভয় দেখাবে?

ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইলেও পারা গেল না। সেই বউটি, যার মুখে হিংস্র মধুর হাসি, চোখের সামনে ভেসে উঠল।

চকিতে রাজেনের মনে হল, মুড়ি-মুড়কির দোকানদার কি ইঙ্গিতে এর কথাই জানাতে চেয়েছে! সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল। একটা ফাঁকা ছাদের রেলিং ধরে ক্বচিৎ কখনও দেখা দিয়ে সে কোথায় মিলিয়ে যায়, কে জানে। সে কি তার ক্ষতি করবে? কেন করবে?

অবিনাশ দত্ত তাকে লক্ষ করছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছিস রে অত?'

রাজেন চমকে উঠল, 'না, কিছু না তো—' বলেই মনে হল, দোকানদারের মুখে এ বাড়িতে খুনের যে ঘটনাগুলোর কথা শুনেছে, অবিনাশকাকাকে জিজ্ঞেস করে কি জেনে নেবে, এই সব ঘটনা কি সত্যি। সঙ্গে সঙ্গেই চিন্তাটা খারিজ করে দিল। মনের ভেতরটা কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে রইল। একটা অদ্ভুত রহস্য যেন মাথার ওপর ঠেসে বসে আছে। কখনও ভয়ে সিঁটিয়ে যায় সে, কখনও আজগুবি বলে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে।

রাজেনের মনে কী ধরনের তোলপাড় চলছে, বাইরে থেকে আন্দাজ করার উপায় নেই। অবিনাশের মনে হল, ইন্টারভিউ খারাপ হওয়ার জন্য রাজেন মুষড়ে পড়েছে। তাকে চনমনে করে তোলার জন্য বলল, 'মন খারাপ করিস না। একটু ভুল-টুল ইংরেজি হলেও সব প্রশ্নের যখন চটপট জবাব দিয়েছিস, আমার মনে হয় চাকরি হয়ে যাবে।'

রাজেন চুপ করে রইল।

অবিনাশ দত্ত এবার বলল, 'ধরা যাক, চাকরিটা হল না। তাতে অত ভেঙে পড়ার কারণ নেই। তোর আরও কয়েকটা ইন্টারভিউ তো রয়েছে। ক'টা যেন?'

আনমনা রাজেন বলল, 'আরও ছ'টা—'

'চিন্তা করিস না, এতগুলো ইন্টারভিউ যখন বাকি, একটা না একটা চাকরি হয়ে যাবে।'

রাজেন উত্তর দিল না।

আরও দু'দিন কেটে গেল। এর মধ্যে ইন্টারভিউ ছিল না। রাজেন বাড়ি থেকে বেরোয়নি। চান-টান করতে বাথরুমে গেছে ঠিকই, সেই বউটিকে দেখা তো যায়ইনি, এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যাতে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। যে আতঙ্কটা রাজেনের মাথায় চেপে বসেছিল সেটা আর নেই।

দু'দিন পর আজ যে ইন্টারভিউ দু'টো রয়েছে তার একটা বেলা দু'টোয়, আরেকটা সাড়ে তিনটেয়। কোনওটাই ডালহৌসিতে নয়, অনেকটা দূরে। একটা পার্ক স্ট্রিটের শেষ মাথায়, অন্যটা থিয়েটার রোডে।

দু'টো ইন্টারভিউর পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে গেল। আগের দিন সন্ধের মুখে মুখে সে ফিরেছে। আজ সন্ধে পার হয়ে গেল।

গ্যাসবাতির টিমটিমে আলোয় রাধানাথ মল্লিক লেনের আঁকাবাঁকা ভূতুড়ে গলিটা দিয়ে তেরো নম্বর বাড়িটায় ঢোকার আগে মুড়ি-মুড়কির দোকান থেকে সেই লোকটা সেদিনের মতোই ডাকল, 'বাবু—'

চমকে উঠল রাজেন। তার আর তেরো নম্বরে ঢোকা হল না।

দোকানদার গলা বাড়িয়ে বলল, 'মাঝখানে দু'দিন আপনাকে দেখিনি। কোত্থেকে এলেন?'

রাজেন বলল, 'একটা কাজে বেরিয়েছিলাম। এখন ফিরছি। কেন বলুন তো—'

'আপনাকে সেদিন সাবধান করে দিয়েছিলাম। তারপরও দু'দিন এখানে ছিলেন?'

'ছিলাম—'

রাজেন যে তার সতর্কবাণী শোনার পরও দু'টো দিন তেরো নম্বরে কাটিয়ে দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে, স্বচক্ষে তাকে দেখেও দোকানদারের বিশ্বাস হচ্ছিল না। খুব সম্ভব সে যে বেঁচে আছে লোকটা তাতে খুশি হতে পারেনি।

রাজেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি আর কিছু বলার আছে?'

ঢোঁক গিলে দোকানদার বলল, 'আছে। আপনি পারলে আজই, নইলে কাল সকালে উঠেই চলে যাবেন।'

'এই দোকানের সামনে দিয়ে গেলেই আপনি ডেকে ডেকে ভয় দেখান। মতলবটা কী?'

'কোনও বদ মতলব নেই বাবু। কেন বুঝতে পারছেন না আমি আপনার ভালো চাই। চলে যান বাবু, চলে যান—'

চোখেমুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে রাজেনের। 'ধ্যাত—' বলেই সে তেরো নম্বর বাড়ির দিকে পা বাড়ায়!

পেছন থেকে দোকানদারের করুণ, ভয়ার্ত গলা ভেসে আসে।—'আমার কথাটা ফেলবেন না বাবু। তেরো নম্বরটা ছাড়লে আপনার মঙ্গল হবে।'

কে কার কথা শোনে। রাজেন বাড়ির ভেতর ঢুকে সুড়ঙ্গের মতো সরু গলিটা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে অন্য দিনের মতো ছাদের দিকে তাকাল। না, কেউ নেই। ছাদটা যতদূর দেখা যায়, একেবারে ফাঁকা। দোকানদারের ওপর রাগে মাথা গরম হয়ে উঠল তার। লোকটা তার গায়ে যেন জোঁকের মতো লেগে আছে। বলেছে সে তার ভালো চায়, বিন্দুমাত্র খারাপ অভিসন্ধি নেই। নেই বললেই হল! নিশ্চয়ই আছে। রাজেন ঠিক করে ফেলল, এরপর যদি ডাকাডাকি করে, এমন ধাতানি দেবে যে তাকে দেখলে টুঁ শব্দটিও করতে সাহস পাবে না।

ছাদের দিকে তাকিয়ে ছিল রাজেন। মাথা নামিয়ে চাতাল পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

পার্ক স্ট্রিট আর থিয়েটার রোডে ইন্টারভিউ দেবার পর তিনদিনের গ্যাপ। তারপর শেষ দুটো ইন্টারভিউ হয়ে গেলে সে কাটোয়া ফিরে যাবে।

এই তিনটে দিন বাড়ি থেকে রাজেনকে বেরুতে হবে না। সে শেষ ইন্টারভিউ দু'টোর জন্য বইটই ঘেঁটে প্রস্তুতি চালাতে লাগল। ফাঁকে ফাঁকে বসার ঘরে গিয়ে অবিনাশকাকা আর বন্দনা কাকিমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে আসা, স্নান-খাওয়া ছাড়া নিজের ঘরেই সে বেশির ভাগ সময়টা থাকে।

প্রথম দু'টো দিন ভালোই কাটল। সেই বউটিকে আর দেখা যায়নি। কাটোয়া থেকে যেদিন তেরো নম্বর রাধানাথ মল্লিক লেনের এই বাড়িটায় এল সেদিন থেকে একটা আতঙ্ক

তার ওপর মাঝেমাঝেই চেপে বসেছিল, আবার মিলিয়েও গেছে। এখন মনে হচ্ছে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আর একটা দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে শেষ দু'টো ইন্টারভিউ দিয়ে সে আর তেরো নম্বরে ফিরবে না; সোজা হাওড়ায় গিয়ে কাটোয়ার ট্রেন ধরবে।

তৃতীয় দিনটা আগের দু'দিনের মতোই শুরু হল। সকালে উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে বসার ঘরে গিয়ে অবিনাশকাকাদের সঙ্গে চা-জলখাবার খাওয়া, একটু-আধটু গল্প, তারপর নিজের ঘরে গিয়ে বইপত্র নিয়ে বসা, দুপুরে বাথরুমে গিয়ে স্নান, খাওয়া সেরে ঘণ্টাতিনেক ঘুম, তারপর বিকেলের চা খেতে খেতে অবিনাশকাকাদের সঙ্গে সময় কাটানো, তারপর ঘরে এসে বই নাড়াচাড়া, রাত দশটায় খাওয়াদাওয়া সেরে ফের নিজের ঘরে।

অবিনাশকাকা শোওয়ার আগে রাজেনের ঘরের সামনে এসে অন্যদিনের মতো আজও বলে গেল, 'বেশি রাতে যদি বাথরুমে যেতে হয় আমাকে আর কাকিমাকে ডাকবি। একা একা হুট করে চলে যাস না, কেমন?'

আস্তে মাথা নেড়েছে রাজেন। রাজি হলেও মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, সে আসার পর থেকে এ বাড়িতে হাড়-হিম-করা কোনও ঘটনাই যখন ঘটেনি, মাঝরাতে দু'জন বয়স্ক মানুষকে ঘুম ভাঙিয়ে কষ্ট দেওয়ার মানে হয় না। রাত দেড়টা-দু'টোয় যদি বাথরুমে যাবার দরকার হয় তখন দেখা যাবে।

অবিনাশকাকা চলে গেলে রাজেন দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। এখানে আসার পর প্রথম কয়েক দিন আতঙ্কে সে কুঁকড়ে ছিল কিন্তু এখন আর কোনও চাপ নেই। শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ জুড়ে এল।

রাজেনের অনেকদিনের অভ্যাস মাঝরাতে একবার সে বাথরুমে যাবেই। এই বয়সেও সেটা থেকে গেছে।

আজও রাত একটা কি দেড়টায় বিছানা থেকে উঠে পড়ল রাজেন। চোখে ঘুম লেগে রয়েছে। তারই মধ্যে সে ঘরের দরজা খুলে বাথরুমে চলে গেল। মিনিট তিনেক পর সে যখন সেখান থেকে বেরুল, বাঁ পাশের সিঁড়ির দরজার দিক থেকে হালকা একটা শব্দ আবছাভাবে কানে এল।

কীসের আওয়াজ? ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের স্রোত বইতে লাগল রাজেনের। চোখ থেকে ঘুম উধাও। তালাবন্ধ সিঁড়ির দরজার পাল্লা ভেদ করে সেই বউটি, যার মুখে হিংস্র মধুর হাসি, বেরিয়ে এল। দরজার পাল্লা আর তালা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

বউটা রাজেনের কাছে এসে তার পিঠে হাত রাখল। কনকনে ঠান্ডা হাত। সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেল রাজেনের।

বউটা বলল, 'চল, তোমার জন্যে অনেকক্ষণ দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। চল, চল —'

রাজেন কিছু বলতে চাইল কিন্তু গলার ভেতর থেকে একটি শব্দও বেরুল না।

বউটির হাত রাজেনের পিঠের ওপর পড়ে আছে। সে আস্তে রাজেনকে সামনের দিকে ঠেলে দিল।

রাজেনের ভাবনাচিন্তা কিছুই কাজ করছে না। সারা শরীর অসাড়। তবু সে এগিয়ে গেল। চকিতে আবছাভাবে মনে হল, দোতলায় সিঁড়ির দরজা তো তালা দিয়ে আটকানো।

তা হলে পাল্লা ভেদ করে বউটা কী করে বেরিয়ে এল! ভাবতেই শরীরে অসাড় ভাবটা অনেক বেড়ে গেল। আর শিরদাঁড়ায় হিমস্রোত আরও কনকনে হয়ে উঠল।

বউটা তাকে তেতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে নিয়ে এসেছে। কী আশ্চর্য, এখানকার দরজাটা খোলা। আবছাভাবে মনে হল, তেতলায় ওঠার সিঁড়ির দরজাটা তো সবসময় তালাবন্ধ থাকে। কে এটা খুলল?

বউটি বলল, 'আমি দরজা-জানলা বন্ধ থাকলেও তার ভেতর দিয়ে যাওয়া-আসা করতে পারি। তুমি তো এখন পারবে না, পরে অবিশ্যি পারবে। তোমার জন্যে দরজাটা খুলে রেখেছি।'

বলে কী বউটা, সে নাকি পরে বন্ধ দরজা-জানলা দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে। মানে কী এসব কথার? মাথার ভেতরটা পুরোপুরি গুলিয়ে গেল রাজেনের।

'দাঁড়িয়ে থেকো না। চল—চল—' বউটি একরকম তাড়াই দিচ্ছে।

এখান থেকে অবিনাশকাকা আর বন্দনা কাকিমার শোওয়ার ঘরটা দেখতে পাচ্ছে। চিৎকার করে তাদের ডাকতে চেষ্টা করল কিন্তু তার গলা থেকে কোনও শব্দ বেরুল না।

বউটি রাজেনের পিঠে ফের চাপ দিল। রাজেন এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি বাইতে শুরু করল। বউটির হাত তার পিঠ থেকে এক মুহূর্তের জন্য সরেনি। রাজেনের মনে হচ্ছে নিজের ইচ্ছায় কোনও কিছু করার ক্ষমতা তার আর নেই, কোনও অলৌকিক শক্তি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে। সেটা রুখে দেবার ক্ষমতা তার নেই।

তেতলায় উঠতেই বাঁ পাশে সারি সারি ঘর, বারান্দা, রান্নাঘর, বাথরুম ইত্যাদি। সব বন্ধ। সমস্ত ফ্লোরটা জুড়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

অবিনাশকাকার মুখে শুনেছে, বাড়িওয়ালা পুরো তেতলাটায় তালা লাগিয়ে বর্ধমান না কোথায় যেন তাদের দেশের বাড়িতে থাকে।

তেতলা পেরিয়ে বউটি রাজেনকে ছাদের দরজার কাছে নিয়ে এল। এই দরজাটাও হাট করে খোলা।

বউটি বলল, 'চল—'

ছাদে যেতেই চোখে পড়ল চাঁদের আলোয় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে।

বউটি এবার বলল, 'আগে তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। তারপর একটা গল্প বলব। এসো—'

রাজেন উত্তর দিল না। আচ্ছন্নের মতো বউটির পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

ছাদের ডানদিকে একটা জায়গায় এসে বউটি বলল, 'চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে, তখন ইংরেজ রাজত্ব চলছে। এখানে তিন কামরার একটা ফ্ল্যাট ছিল। আমরা সেখানে থাকতাম। দেখ, দেখ, চিনতে পারছ কি?'

কী বলছে বউটা! অদ্ভুত একটা ঘোরের মধ্যে থাকলেও রাজেন অবাক হয়ে গেল। চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে এখানে কী ছিল, সে জানবে কেমন করে? রাজেন চুপ করে রইল।

'চিনতে পারছ না তো। গল্পটা শুনলেই পারবে। ওদিকটায় চল—' একটু দূরে তাকে নিয়ে গেল বউটি। এখানে ইট দিয়ে বানানো আড়াই-তিন ফিট উঁচু, তিন-চার ফিট চওড়া,

বারো-চোদ্দো ফিট লম্বা একটা আধাখেঁচড়া টাইপের দেওয়াল। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল সে।—'বোসো—'

রাজেন বসে পড়ল। তার গা ঘেঁষে বসল বউটি। রাজেনের মনে হল তার শরীরটা আরও ভারী হয়ে গেছে। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছে।

বউটি বলল, 'এই যেখানে বসেছ সেটা ছিল আমার শোওয়ার ঘরের একটা দেওয়াল। পুরো ফ্ল্যাটটা ভাঙা হলেও এই দেওয়ালের নীচের দিকটা কেন রেখে দেওয়া হয়েছে, বাড়িওয়ালাই জানে। সে যাক গে, আমার বসার একটা জায়গা পাওয়া গেছে। তোমাকেও বসতে দিতে পারলাম। হাজার হোক তুমি আমার অতিথি। নীচে ধুলোবালির ওপর তো বসানো যায় না।'

রাজেন এবারও চুপ।

'তুমি তো কাল এ বাড়ি থেকে পালাবার তাল করেছিলে, তাই না?' বউটির চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠেছে। মুখের হাসিটি আরও মিষ্টি এবং আরও হিংস্র।

ওই যে যারা মানুষের মুখ দেখে তার মনের কথা মুহূর্তে পড়ে নিতে পারে, বউটি বোধহয় তাদেরই একজন। চমকে ওঠার মতো শক্তিটাও রাজেনের মধ্যে আর নেই। তার গলা দিয়ে জড়ানো জড়ানো গোঙানির মতো একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'কী ভেবেছিলে, আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবে? কাজটা অত সোজা নয়। আমার এ বাড়ির কাজ একরকম শেষ হয়ে গেছে। শুধু তুমিই বাকি ছিলে। তোমার জন্যে বছরের পর বছর এখানে পড়ে আছি—' বউটি বলতে লাগল, 'এখন গল্পটা শুরু করা যাক।'

কেন তার জন্য বউটি এই বাড়িতে বছরের পর বছর পড়ে আছে, কিছুই মাথায় ঢুকছে না রাজেনের। ঘোলাটে চোখে সে তার দিকে তাকাতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। তার মাথা ঝুলে পড়ছে।

'এই ছাদের ওপর তিন কামরার একটা ফ্ল্যাট ছিল, আর আমরা যে এখানে থাকতাম, তোমাকে আগেই বলেছি—' বউটি গল্প শুরু করে দিয়েছে, 'আমাদের ফ্যামিলি খুব বড়োও ছিল না, ছোটোও না। সব মিলিয়ে আমরা পাঁচজন। আমার বুড়ো শ্বশুর, আমার স্বামী, দুই দেওর আর আমি। দেওরদের তখনও বিয়ে-টিয়ে হয়নি। আমাদের শ্যামবাজার আর বউবাজারে জামাকাপড়, রেডিমেড পোশাক আর আসবাবের বিরাট বিজনেস ছিল। বাড়িতে সবসময় তিন-চার লাখ নগদ টাকা থাকত। দিনগুলো খুব আনন্দে আর সুখেই কাটছিল। কিন্তু একদিন মাঝরাতে পাশের গলিতে ঢুকে মোটা মোটা যে তিনটে পাইপ দিয়ে বর্ষার জল বেরিয়ে যায় সেগুলো বেয়ে চারজনের একটা ডাকাতের দল ছাদে উঠে এসেছিল। তারা কীভাবে খবর পেয়েছিল সেদিন আমাদের ফ্ল্যাটে সাড়ে তিন লাখ টাকা ছিল। সেই দলটায় ছিলিস তুই—' এতক্ষণ 'তুমি'-'টুমি' করে বলছিল বউটি; এবার শুরু হল 'তুই' দিয়ে।

কোনওরকমে নুয়ে-পড়া মাথাটা তুলল রাজেন। এমন অদ্ভুত কথা আগে কখনও শোনেনি সে। কীভাবে যেন একটু শক্তি আর সাহস জড়ো করে ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'আমি!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই—'

'কিন্তু—'

‘কীসের কিন্তু?’

‘চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে আমি কী করে ডাকাতি করতে আসব! এখন আমার বয়েস মোটে বাইশ। অত দিন আমি কোথায় ছিলাম!’

‘তোর আগের জন্মের কথা বলছি। তোর নাম তখন ছিল বিনোদ। ঢাকুরিয়া রেল স্টেশনের ওধারে অক্ষয় দত্ত লেনে ছিল তোদের বাড়ি। পুলিশ পরে জানতে পেরেছে। এই জন্মে আর আগের জন্মের বাড়িতে যাওয়ার সময় পাবি না।’

রাজেন তাকিয়ে রইল।

বউটি বলল, ‘তোরা আমাদের সেই সাড়ে তিন লাখ টাকা কেড়ে নিয়েছিলি। আমরা পাঁচজন ঠেকাতে চেয়েছিলাম কিন্তু ছোরা আর পিস্তল চালিয়ে আমাদের পাঁচজনকে শেষ করে দিয়েছিলি। পরে পুলিশ তাদের ঠিকানাগুলো শুধু জানতে পারে।’

উত্তর নেই।

‘খুন হয়ে যাবার পর কিছুদিন আমি হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াই। তারপর থেকে এই বাড়িতে এসে আছি। আমাদের ফ্যামিলির বাকি চারজন কোথায়, জানি না। তবে আমাদের সাবাড় করার পর তোরা নানা রোগে মরে গেছিলি। মরার দশ-বারো বছর পর ফের তোদের জন্ম হয়েছে। আগের জন্মের সব কথা আমার মনে আছে। ভালো বাংলায় কী যেন বলে, ও হ্যাঁ, জাতিস্মর। আমি ঠিক তাই। ভাবতাম খুন করে পার পেয়ে যাবি তা কিছুতেই হতে দেব না। তোদের গত জন্মে শাস্তি দিতে পারিনি, এই জন্মে কিছুতেই ছাড়াছাড়ি নেই। আমার মনে হয়েছিল, তোরা একদিন না একদিন এই তেরো নম্বর বাড়িতে আসবি। তিনজন আগেই এসেছিল, তাদের আমি যমের দোরে পাঠিয়েছি। এবার তোর পালা—’

হঠাৎ বউটির চেহারা আগাগোড়া পালটে গেল। দু’চোখ থেকে আগুন ঠিকরোচ্ছে, হাসিটা আর নেই। ওপরের পাটির দু’পাশের দু’টো আর নীচের পাটির দু’টো দাঁত লম্বা আর চোখা হয়ে উঠল। রাজেন কিছু বোঝার আগেই বউটি আরও এগিয়ে এসে তার দাঁতগুলো গলায় বসিয়ে দিয়ে চাপ দিতে লাগল।

পুরোপুরি বেহুঁশ হবার আগে রাজেন টের পেল তার বুকের ওপর গল গল করে স্রোতের মতো কী যেন নামছে। আবছাভাবে একটা চিৎকার শুনতে পেল সে। সেই সঙ্গে দুদ্দাড় করে সিঁড়ি ভেঙে কাদের উঠে আসার আওয়াজ।

তিন দিন বাদে পুরোপুরি জ্ঞান ফেরার পর রাজেন দেখতে পেল হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে অবিনাশকাকা, বন্দনা কাকিমা। খবর পেয়ে কাটোয়া থেকে তার বাবা-মা চলে এসেছে।

অবিনাশকাকা জানিয়েছে, সেদিন অনেক রাত্তিরে একতলার ভাড়াটেদের কেউ কোনও দরকারে বাইরে বেরিয়েছিল। হঠাৎ ছাদে সেই বউটির সঙ্গে রাজেনকে দেখে চেঁচিয়ে বাড়ির সবার ঘুম ভাঙিয়ে ছাদে চলে আসে। রক্তের সমুদ্রে তখন পড়ে আছে রাজেন। বউটিকে তখন দেখা যায়নি।

সেই রাতেই রাজেনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। একতলার ভাড়াটেটি না দেখলে তাকে বাঁচানো যেত না।

*

এই ঘটনাটি ঘটে যাবার চল্লিশ বছর পর গল্পটা শুনেছিলাম। আরও আরও শুনেছি, ঘটনার পর সুস্থ হয়ে উঠেছিল রাজেন, একটা চাকরিও পেয়েছিল কিন্তু বেশিদিন বাঁচেনি।

তেরো নম্বর রাধানাথ মল্লিক লেনের সেই বাড়িটা আর নেই। সেটা ভেঙে বিরাট এক হাইরাইজ তোলা হয়েছে।

—

তারা চারজন

চুয়ান্ন বছর আগে যখন আমি বম্বে যাই তখনও তার নাম মুম্বাই করা হয়নি। শহরটা আজকের মতো এমন বিশাল মহানগরী হয়ে ওঠেনি। আমি সেই পুরোনো বম্বের একটা গল্প বলব। তার আগে একটু ভণিতা করে নিই। তা হলে গল্পটা বুঝতে সুবিধা হবে। সব কিছুরই একটা চালচিত্র থাকে। নইলে ব্যাপারটা ন্যাড়া লাগে।

তখন বম্বের লোকজন আর কত? মেরেকেটে ষাট লাখ। এখনকার মতো দমবন্ধ—করা ভিড় নেই। ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন শহর।

মূল সিটির চার্চগেট স্টেশন, যাব ঠিক উলটোদিকে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম, ডানপাশে কয়েক পা গেলেই বিখ্যাত মেরিন ড্রাইভ, তার ওধারে আদিগন্ত আরব সাগর—সেই স্টেশনটা থেকে সাবার্বন ট্রেন শহরটাকে ফুঁড়ে উত্তর দিকে অনেক দূর চলে যেত; আজকাল আরও, আরও দূরে যায়। এই লাইনে দু—চারটে মিনিট দৌড়ের পরই একেকটা স্টেশান। মেরিন লাইনস, গ্রান্ট রোড, চার্নি রোড, মহালদমী ইত্যাদি স্টেশন পেরুলেই মূল বম্বের সীমানা শেষ। তারপর শহরতলি শুরু।

শহরতলির স্টেশনগুলোর দুপাশটা মোটামুটি জমজমাট। উঁচু উঁচু নতুন পুরনো বিল্ডিং, ঝাঁ—চকচকে রাস্তা, বেশ কিছু অফিস, মাঝে মাঝে রাস্তার মোড়ে ইরানিদের রেস্তোরাঁ বা ছোটখাটো হোটেল। ব্যস, এটুকুই। নইলে ফাঁকা জায়গাই বেশি। সেগুলোতে হয় আগাছার জঙ্গল, ঝোপঝাড় বা সবজির চাষ, ছাড়া—ছাড়া ভাবে দু—চারটে টালির চালের বাড়িও চোখে পড়ে।

আমি একটা বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে কাজ করতাম। না, পাকা চাকরি নয়। ফুরনের কাজ। তখনও এদেশে টিভি আসেনি। মিডিয়া বলতে খবরের কাগজ। আমাদের এজেন্সি বেশ কয়েকটা কনফেকশনারি, সুগন্ধি সাবান, হেয়ার অয়েল, ক্রিম, পারফিউম, সেন্ট ইত্যাদি জিনিসের বিজ্ঞাপন তৈরি করত দেশের নানান ভাষার কাগজগুলোর জন্য। আমি বাংলা ভাষায় কলকাতার পত্র—পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপনের কপি তৈরি করে দিতাম। না, রোজ অফিসে হাজিরা দিতে হত না। সপ্তাহে দু'দিন মাত্র যেতাম। যে টাকা পেতাম তাতে দিব্যি চলে যেত।

আমি থাকতাম শহরতলিতে। চার্চগেট থেকে তেরো—চোদ্দো মাইল দূরে বান্দ্রা নামে একটা জায়গায়। সাবার্বন ট্রেন থেকে স্টেশনে নেমে নাক বরাবর পশ্চিম দিকে মাইল খানেক গেলেই সমুদ্রের ধারে ব্যান্ডস্ট্যান্ড। পাপাজিদের অর্থাৎ সর্দারজিদের সাদামাঠা লম্বাটে ধরনের তেতলা একটা হোটেলের ফার্স্ট ফ্লোরে কোণের দিকের শেষ ঘরটা ছিল আমার। জানলা দিয়ে ওখান থেকে একশো গজ দূরের সমুদ্র দেখা যায়।

হোটেলের নাম 'এভারগ্রিন লজ'। নিজের ঘরে বসে সমুদ্র দেখতে দেখতে এজেন্সির কাজ করতাম।

আমাদের হোটেলের বোর্ডাররা কেউ ত্রিবাঙ্কুরের লোক, কেউ ইউ. পি, কেউ মাদ্রাজ (তখনও তামিলনাড়ু নাম হয়নি), কেউ বিহার, কেউ গোয়া, কেউ বা হায়দ্রাবাদ—সেকেন্দ্রাবাদের। বাঙালি আমি একজনই। বোর্ডাররা মানুষ ভালো, কিন্তু তাদের সঙ্গে বেশিক্ষণ গল্প করতে বা আড্ডা দিতে জুত লাগত না। আমি অবশ্য কিছু বাঙালি বন্ধু

জুটিয়ে ফেলেছিলাম। তারা থাকত বান্দ্রা থেকে আড়াই তিন মাইল দূরে খার—এর ডান্ডাস পয়েন্টে।

এই অঞ্চলটা সমুদ্রের পাড়ে। সব মিলিয়ে ওরা পাঁচজন। সুরেশ, দিবাকর, অরুণ, মনোজিৎ আর পূর্ণেন্দু। টেক্সটাইল মিল, ফার্মাসিউটিক্যালস, ইঞ্জিনিয়ারিং এমনি সব কোম্পানির অফিসে। ডান্ডাস পয়েন্টে ওরা থাকত পার্শিদের আদ্যিকালের একটা খোলামেলা দোতলা বাড়ির দু'খানা ঘর ভাড়া করে। খাওয়াদাওয়া বাইরের কোনও হোটেল—টোটেলে। থাকাটাই শুধু ওখানে। বম্বেতে হোটেল রেস্তোরাঁর ছড়াছড়ি। তবে চা—টা নিজেরাই করে নিত। পাঁচজনেই ভীষণ আমুদে, আড্ডাবাজ।

আমি মাঝে—মাঝেই সুরেশদের আস্তানায় আড্ডা দিতে যেতাম। বাংলার বাইরে বাঙালি ছাড়া বাঙালির গতি নেই। অন্তত তখনও তেমনটাই ছিল। ওরাও 'এভারগ্রিন লজ'—এ আসত।

সমুদ্রের ধার দিয়ে তখন ডান্ডাস পয়েন্টে সোজাসুজি হেঁটে যাওয়া যেত। এখনও যায়। রাস্তাটার বাঁ—পাশে আরব সাগর, ডাইনে টানা পাহাড়, নাম পালি হিল। পাহাড়টা খুব উঁচু নয়, বড়জোর তিন—সাড়ে তিন হাজার ফিট হাইট। সেটার গায়ে জঙ্গল। তখন তাই ছিল। মাথায় বাংলো টাইপের কিছু বাড়ি। সমুদ্রের দিক থেকে সেখানে ওঠার পথ নেই। পাহাড়ের ওধার দিয়ে পাথর কেটে চুড়োয় ওঠার রাস্তা বানানো হয়েছে। যাদের দরকার তারা ওই রাস্তা দিয়েই ওঠানামা করে।

আমি হাঁটাহাঁটির মধ্যে নেই। বাসে পালি হিলের ওপাশ দিয়ে অনেকটা ঘুরে ডান্ডাস পয়েন্টে যেতাম। সুরেশ পূর্ণেন্দুরাও বাসে চেপেই আমার হোটেলে আসত।

সেদিন সন্ধেয় সুরেশদের আস্তানায় গেছি। চুয়ান্ন বছর আগে বম্বের শহরতলিতে যেমন দেখা যেত আশপাশে ছাড়া ছাড়া কিছু বাড়ি। ওদের ওখানেও তা—ই। এই বাড়িগুলো অনেক দিনের পুরোনো, সেকেলে আর্কিটেকচার।

যাই হোক, চা আর গাঠিয়া টাঠিয়া খেতে খেতে আড্ডা বেশ জমে উঠেছিল। সেদিন ভূতচর্চা চলছিল পুরোদমে। আমি ভূতপ্রেত পিশাচ—আত্মা এসব কিছুই বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যজীবনে সম্পূর্ণ দাঁড়ি পড়ে যায়। মরণের পরে আর কিছু নেই, থাকতে পারে না। বড় জোর কেউ মারা গেলে চিতায় পুড়ে তার দেহ ছাই হয়ে যায় কিংবা গোরস্থানের মাটিতে মিশে গিয়ে বায়ুমন্ডলে বাড়তি কিছু হাইড্রোজেন গ্যাস কি কার্বন ডাই—অক্সাইড তৈরি হতে পারে। পৃথিবীতে তার আর কোনও চিহ্নই থাকে না। অবশ্য আগেভাগে ফোটো তোলা থাকলে দেওয়ালে টাঙিয়ে বা অ্যালবামে সাজিয়ে রাখা যায়। মরণের ওপারে প্রেতলোক বলে যদি কিছু থেকে থাকে সেখানে তারা বহাল তবিয়তে থাকুক না। হঠাৎ জ্যান্ত মানুষদের সঙ্গে ইয়ার্কি মারতে কি দাঁত খিঁচিয়ে তাদের ভয় দেখাতে বা গলা টিপে মারতে মর্তলোকে ভূতপ্রেতরা উদয় হবে কেন?

সুরেশ বলল, 'তুমি তো বিশ্বাস করো না, আমার পিসেমশাইয়ের এক বন্ধু বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টের কাটোয়ার লোক। একবার কয়েকজনের সঙ্গে শ্মশানে মড়া পোড়াতে গিয়েছিলেন কিন্তু পোড়াতে পারেননি। দশটা বিশাল বিশাল ছায়ামূর্তি হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠে ডেডবডিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পিসেমশাই আর তাঁর বন্ধুরা মড়া ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। এটা সত্যি ঘটনা।'

তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম, 'তা ওই ছায়ামূর্তিগুলো তো ভূত—তাই না? তা তোমার পিসেমশাইরা পালালেন কেন? ওদের সঙ্গে দোস্তি করে পরলোকের ব্যাপার—স্যাপার একটু জেনে নিতে পারতেন!'

সুরেশ ভীষণ অসন্তুষ্ট হল,—'পিসেমশাই আমার গুরুজন। তাঁকে নিয়ে এরকম ঠাট্টাটাট্টা আমি লাইক করি না।'

বললাম,—'স্যরি—স্যরি—।'

অরুণ বলল 'আমাদের বাড়ি পাইকপাড়ায়। সেই এরিয়ায় একটা পুরোনো পড়ো বিল্ডিং ছিল। কোনও লোক সেখানে থাকতে পারত না। ভাড়াটে এলে এক রাত্তির কাটতে—না—কাটতেই পালিয়ে যেত। ঠাকুরদার মুখে শুনেছি, মাঝরাত্তিরে সেখানে বহু মানুষের হইচই আর হাসির আওয়াজ শোনা যেত।'

'জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই বিল্ডিংটা কি এখনও আছে?'

'না। স্বাধীনতার পর এক পাল রিফিউডি ইষ্ট পাকিস্তান থেকে এসে বাড়িটা দখল করে নেয়। তারপর প্রোমোটাররা মালিকের কাছে কিনে রিফিউজিদের কিছু টাকাপয়সা দিয়ে উঠিয়ে ক'বছর হল একটা বারোতলা হাইরাইজ বানিয়েছে।'

জিবে চুকচুক আওয়াজ করলাম, 'প্রথমে রিফিউজিরা, তারপর প্রোমোটাররা সেই প্রেতাত্মাদের তাড়াল। তারা কোথায় গিয়ে কলোনি বসিয়েছে, খবর পেয়েছ? যদি পাও, আমাকে বলো। অফিস থেকে ক'দিনের ছুটি নিয়ে তাদের সঙ্গে মোলাকাত করে আসব।'

অরুণ ভীতু মানুষ। বলল, 'ভূতপ্রেত নিয়ে এমন মজা করতে নেই।'

'খালি বাড়িতে তারা যদি রাত—বিরেতে খামোকা হইচই করতে পারে, হাসতে পারে, কিন্তু রিফিউজি আর প্রোমোটার দেখলে ল্যাজ গুটিয়ে পালায়। মজার ব্যাপার নয়?'

অরুণ চুপ করে গেল।

পূর্ণেন্দু বলল, 'পলটারগেইস্টদের কথা জানো?

'না। তারা আবার কারা?'

পূর্ণেন্দু ভূতপ্রেত পরলোক ইত্যাদি সম্পর্কে মহাবিশেষজ্ঞ। দেশ—বিদেশের নানা ভৌতিক কাহিনি তার ঝাড়া মুখস্থ। বলল, 'পলটারগেইস্টরা হল্লাবাজ প্রেতাত্মা। ভীষণ উৎপাত করে। একটা সত্যি ঘটনা শোনাচ্ছি। আমার দিদিমার এক পিসতুতো দাদা বিহারের কাটিহারে থাকতেন। দিদিমার কাছে শুনেছি তাঁর এই দাদাটির বাড়ির কাছাকাছি অন্য একটা বাড়িতে পলটারগেইস্টরা মাঝরাতে হল্লা করতে করতে ভোর অব্দি অনবরত পাথর ছুড়ত।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'দিনের বেলায় ছোঁড়েনি কেন?'

পূর্ণেন্দু চটে উঠল, 'অত তর্ক কোরো না তো। একেক গ্রুপের ভূতের একেক রকম স্টাইল। পলটারগেইস্টরা তাদের কাজের সময় হিসেবে রাতটাকেই সিলেক্ট করেছে।'

মনোজিৎ আর দিবাকরও ভূতের নানারকম লোমহর্ষক গল্প শোনাল। ওরাও ওদের বয়স্ক আত্মীয়স্বজনদের মুখে ওগুলো শুনেছে।

বললাম, 'তোমরা ঠাকুরদা, দিদিমা বা অন্য রিলেটিভদের শোনা আজগুবি সব গল্প শোনালে। ভালোই লাগল।'

পূর্ণেন্দু তেরিয়া হয়ে ওঠে। ভূতের ব্যাপারে ঠাট্টা—ইয়ার্কি সে একদম বরদাস্ত করে না। অন্যরা একটু মিনমিন করলেও ভূত যে আছে, সুযোগ পেলে সে বুঝিয়ে দিতে ছাড়ে না। এমন ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষ আর একজনও দেখিনি। বলল, 'যাদের কাছে শোনা তারা কি মিথ্যে বলেছে?' আর দে লায়ারস? এঁরা এজেড, রেসপনসিবল সব মানুষ। তোমার কি ধারণা, বানিয়ে বানিয়ে ওরা গল্প ফেঁদেছে!' ওঁদের ইনসাল্ট করার কোনও রাইট তোমার নেই।'

আমি হকচকিয়ে যাই, 'আরে ভাই রাগ কোরো না। তোমাদের ঠাকুরদা দিদিমাকে রেসপেক্ট জানিয়েই জিজ্ঞেস করি, 'তুমি বা সুরেশ অরুণরা কি নিজের চোখে তেনাদের দেখেছ?'

পূর্ণেন্দু গোঁ ধরেই থাকে। এঁড়ে তর্ক জুড়ে দেয়, 'তুমি কি তোমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা কি তাঁরও ঠাকুরদাকে স্বচক্ষে দেখেছ?'

'না দেখলেও তাঁরা ধরাধামে ছিল সেটা তো স্বয়ংসিদ্ধ। পূর্বপুরুষরা না থাকলে তুমি আমি জন্মালাম কী করে?'

একটু থতিয়ে গেল পূর্ণেন্দু। কিন্তু পিছু হটার বান্দা সে নয়। বলল, 'ঠিক আছে। তুমি কি কাশ্মীরের এক সময়ের রাজা দাহির কি ভাস্কো—ডা—গামা বা রাসপুটিন, আলেকজান্ডারকে দেখেছ?'

এমন একটা উদ্ভট প্রশ্নে আমি অবাক। তারপর হেসে ফেললাম, 'তুমি শেষ পর্যন্ত কিনা দাহির আলেকজান্ডারদের নিয়ে টানাটানি শুরু করলে? আরে বাবা, তাঁরা ছিলেন কিনা এটাই তো জানতে চাও? ছিলেন, ছিলেন, নিশ্চয়ই ছিলেন। হিস্টোরিয়ানরা তাঁদের থাকার প্রমাণ, তাঁদের নানা কীর্তির কথা নানা বইতে লিখে রেখেছেন।'

'এবার পথে এসো।' পূর্ণেন্দু গলার স্বর চড়ায়, 'ভূতেরা, আত্মারা যে এই পৃথিবীতে আছে এদেশের আর বিদেশের অনেকেই তা লিখেছেন। তাঁরা নিজের চোখে এদের দেখেছেন। হিস্টোরিয়ানদের লেখাগুলো যদি প্রমাণ বলে ধরো, এই লেখকদের লেখা প্রমাণ নয়? এঁরা বিরাট বিরাট পণ্ডিত। কেউ গাঁজা খেয়ে ধোঁকা দেবার জন্যে লেখেননি। এক আইরিশ আত্মা—বিশারদ—'

ওকে থামিয়ে দিয়ে আমিও কণ্ঠস্বর আরও উঁচুতে তুললাম, 'আমি এরকম দু—চারটে বই পড়েছি। এগুলোকে প্রমাণ বলে? আটার রাবিশ।'

ভেবেছিলাম অন্য চারজনের কেউ হয়তো আমার পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু তারাও পূর্ণেন্দুর সঙ্গে কোরাসে সুর মেলাল। পাঁচজন ভূতবিশ্বাসীর মধ্যে আমি একমাত্র চরম অবিশ্বাসী। গলাবাজি করে ওদের বিরুদ্ধে ওয়ান—ম্যান আর্মির মতো লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলাম।

ভূতের টপিক এমন একটা ব্যাপার যে শুরু হলে কখন কোথায় গিয়ে থামবে তার ঠিক—ঠিকানা নেই। তুমুল তর্কাতর্কির মধ্যে হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ চলে যায়। এগারোটা বেজে সাতচল্লিশ। একটা চেয়ারে বসে ছিলাম। স্প্রিংয়ের মতো প্রায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াই।

'আরেব্বাস! এত রাত হয়ে গেছে, টেরই পায়নি। আজ চলি ভাই।'

পূর্ণেন্দু বলল, 'বাসটাস বন্ধ হয়ে গেছে। এখন এতটা রাস্তা যাবে কী করে? রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালে উঠে চলে যেও। আমাদের জন্যে রুটি—তরকারি আনিয়ে রেখেছি। ভাগাভাগি করে খেয়ে নেব।'

‘ইমপসিবল। অ্যাডের আর্জেন্ট কিছু কাজ বাকি রেখে তোমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে এসেছিলাম। ঠিক করেছিলাম, ন’টা—সাড়ে ন’টায় উঠে পড়ব। কথায় কথায় এত রাত হবে, ভাবতে পারিনি। আজই হোটেলে ফিরে কাজটা কমপ্লিট করে সাড়ে দশটার ভেতর ফোর্টে এজেন্সির অফিসে জমা দিতে হবে। আচ্ছা চলি—’।

বেরিয়ে পড়লাম, লাস্ট বাস চলে গেছে ঘণ্টা দেড়েক আগে। যদি কপাল জোরে একটা ট্যাক্সি জুটে যায়।

পূর্ণেন্দু সুরেশরাও আমার সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। সবাই খোঁজাখুঁজি করল। না, ট্যাক্সির পাত্তা নেই। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসটাস সব উধাও।

সুরেশ বলল, ‘এবার?’

হাসলাম, ‘স্রেফ পায়দল। হেঁটেই চলে যাব।’

পালি হিলের পেছন দিয়ে গেলে মিনিমাম দু—ঘণ্টারও বেশি লেগে যাবে। তবে সমুদ্রের ধার দিয়ে যদি যাই, মিনিট চল্লিশের ভেতর হোটেলে পৌঁছে যাব। ঠিক করলাম ওই শর্টকাট রাস্তাটাই ধরব।

সুরেশ পূর্ণেন্দুরা বলল, ‘ওই রাস্তাটা ভালো না। বিশেষ করে রাত্তিরবেলাটা। গুণ্ডা ছিনতাইবাজরা ওত পেতে থাকে।’

তখন সাহস ছিল প্রচণ্ড। তা ছাড়া এজেন্সির জরুরি কাজটা মাথায় ঘুরছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোটেলে ফেরা দরকার। বললাম, ‘তোমরা টেনশন কোরো না। কিচ্ছু হবে না।’

ওরা উদ্বিগ্ন মুখে খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে গেল। সমুদ্রের ধারের রাস্তাটা মধ্যরাতে একেবারে সুনসান। কোথাও জনপ্রাণী চোখে পড়ছে না। এখন পূর্ণিমাপক্ষ। আকাশে প্রকাণ্ড রুপোর থালার মতো চাঁদ অবিরল জ্যোৎস্না ঢেলে চলেছে। রাস্তার একধারে লাইন দিয়ে নারকেল গাছ। তারপর অজস্র ছোটবড় পাথরের চাঁই বা বোল্ডার। তারপর বীচ। বীচের পর থেকে আরব সাগর। সমুদ্র থেকে উঁচুউঁচু ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে; সাঁই সাঁই হাওয়া নারকেল গাছের ঝুঁটি ধরে ক্রমাগত ঝাঁকিয়ে চলেছে। বাঁ—ধারে পালিহিল। সেখানে এদিক থেকে একেবারে চুড়ো অবধি ঝোপঝাড় জঙ্গল। পাহাড়টার মাথায় যে দশ—বিশটা বাংলো টাইপের বাড়ি আছে, সেগুলোর বাসিন্দারা এতক্ষণে ঘুমের আরকে ডুবে গেছে। কোনও বাড়িতেই একফোঁটা আলো নেই।

পাহাড়ের নীচের দিকে মাঝে—মাঝেই অনেকটা জায়গা জুড়ে ভাঙাচোরা ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ছে। চারশো—সাড়ে চারশো বছর আগে যে পর্তুগিজ জলদস্যুরা ভারতবর্ষে হানা দিয়েছিল তারা কালিকটে এসেই থেমে থাকেনি। আরব সাগরের তীর ধরে ধরে বোম্বেতে এসেও হাজির হয়েছিল। এমনকি বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর বাংলাদেশেও অভিযান চালিয়েছিল। গড়ে তুলেছিল একের পর এক কেল্লা। বোম্বেটেরা কবেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে! কিন্তু পালি হিলের তলার দিকে জঙ্গলে—ঘেরা যে ভগ্নস্তূপ চোখে পড়ে সেসব এই জলদস্যুদের শেষ স্মৃতিচিহ্ন।

চাঁদের আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছিল। নির্জন রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছি। মিনিট দশেক হাঁটার পর হঠাৎ পেছন দিকে পায়ের অস্পষ্ট আওয়াজ কানে এল। চমকে পেছন ফিরে দেখি, তিনটে কুড়ি—একুশ বছরের চোয়াড়ে চেহারার ছোকরা আমার দিকে আসছে। লক্ষণ ভালো মনে হল না। সমুদ্রের ধারের এই লম্বা রাস্তাটার দুর্নাম আগেই শুনেছি।

রাতের দিকে একা কারওকে পেলে ছিনতাইবাজরা ছুরি দেখিয়ে সব লুটপাট করে নেয়। বাধা দিলে নির্ঘাত চাকু চালিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে দু—একটা ডেডবডি এখানে পড়ে থাকার কথা শুনেছি।

আমার হাতে একটা দামি ঘড়ি আছে। শখ করে কিনেছিলাম। তখনই দাম পড়েছিল এগারোশো টাকা। এ ছাড়া পকেটেও রয়েছে পাঁচ—ছ'শো। চুয়ান্ন বছর আগে এই টাকা অনেক টাকা।

নাঃ! সময় বাঁচাতে আসা ঠিক হয়নি। পালিহিলের ওধার দিয়ে গেলে সময় অনেকটা লাগত ঠিকই। কিন্তু ওধারে বাড়িঘর প্রচুর, বেশি রাত অবধি রাস্তায় লোকজন থাকে। ভয়ের কিছু নেই।

এতগুলো টাকা আর শখের ঘড়িটা কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারব না। মুখ ফিরিয়ে জোরে জোরে পা চালাতে লাগলাম। পায়ের আওয়াজে টের পাচ্ছি ছোকরা তিনটেও গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। শিকার যখন পেয়ে গেছে, কিছুতেই তাকে ছাড়বে না।

আমিও স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছি। টের পাচ্ছি ওদের সঙ্গে দূরত্বটা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। বজ্জাত তিনটে অল্পবয়েসি ছোকরা। চিতার মতো ক্ষিপ্র। যত জোরেই পা চালাই, ওদের সঙ্গে পেরে উঠব না। মুখ বুজে চুপচাপ টাকা ঘড়িটড়ি দিয়ে দিলে ওরা আর ঝঞ্ঝাট করবে না। কিন্তু কেন দেব? ভাবলাম দৌড় লাগাই, কিন্তু শেষ রক্ষা কি হবে? মূর্তিমান শয়তানের দলটার হাত থেকে টাকাপয়সা নিয়ে অক্ষত শরীরে শেষ পর্যন্ত কি হোটেলে পৌঁছতে পারব?

হেঁটে গেলে 'এভারগ্রিন লজ' আর আধঘণ্টার পথ। তবু মনে হচ্ছে যেন হাজার মাইল দূরে। তখন আমার বয়স পঁচিশ; শরীর বেশ টান টান, এক ফোঁটা বাড়তি মেদ নেই। মনে সাহস আর গায়ে জোরও ছিল। ওদের হাতে ছোরাছুরি না থাকলে রুখে দাঁড়াতে পারতাম। পয়লা ধাক্কায় ওরা কিছু করার আগে আচমকা একটার পেটে পা এবং আরেকটার পেটে হাত চালিয়ে রাস্তায় শুইয়ে ফেললে তিন নম্বরটাকে কায়দা করতে দু'মিনিটও লাগবে না।

কিন্তু ধারালো অস্ত্রের সঙ্গে খালি হাতে লড়তে যাওয়া নেহাতই গোঁয়ার্তুমি। ভাবলাম দৌড় লাগাব। কিন্তু তাতেও তো পার পাওয়া যাবে না।

তবু একটা চেষ্টা তো করা যাক। হোটেল অবধি না হোক, একবার ব্যাসস্ট্যান্ডের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়লে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে মানুষজন সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে বেড়ায়। ছিনতাইবাজদের দেখলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে; মেরে পুরোপুরি কিমা বানিয়ে ছাড়বে।

আমি দৌড়ের জন্য পুরোপুরি তৈরি হচ্ছি, ততক্ষণে পেছনে পায়ের শব্দ খুব কাছে এসে পড়েছে। তিন ছিনতাইবাজ আর আমার মধ্যে দূরত্ব এখন কুড়ি—বাইশ ফিটের বেশি হবে না বলেই আন্দাজ করছি। দুদ্দাড় করে ওরা ধেয়ে আসছে।

আচমকা পালিহিলের নীচের দিকের জঙ্গল ফুঁড়ে একজন বেরিয়ে এসে আমার ঠিক পেছনে প্রায় ঘাড়ের কাছে এসে খসখসে গলায় পুরোনো ধরনের ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'নো ফিয়ার! হাঁটতে থাকো!'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরও একজন। সেও আমার ঠিক পেছনে। তারপর আরও দু'জন; তারা সমুদ্রের দিক থেকে হঠাৎ উঠে এসে আমার দু'পাশে দাঁড়িয়েছে। চেহারাগুলো

ঝাপসা ঝাপসা। মুখচোখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। এমন চেহারা কোথায় যেন দেখেছি। কোথায়?

চকিতে মনে পড়ে গেল। ইতিহাসের বইতে আর্টিস্টের আঁকা পর্তুগিজ জলদস্যুদের যে ছবি চোখে পড়েছে, অবিকল সেইরকম। পরনে তেমনই পোশাক। কাঁধ থেকে অদ্ভুত ধরনের সেকেলে বন্দুক ঝুলছে। সবাই মাথায় আমার চেয়ে আধ হাতেরও বেশি লম্বা। বুকের পাটা কম করে চল্লিশ ইঞ্চি তো হবেই।

উনিশশো উনষাট সালে সাড়ে তিনশো—চারশো বছর আগের সেই বোম্বেটেরা বম্বের সমুদ্রতীরে মধ্যরাতে কোন ম্যাজিকে এসে হাজির হল, কিছুতেই বুঝতে পারছি না! মাথার ভেতর তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

টের পাচ্ছি, শিরদাঁড়ার ভেতর দিকে বরফের মতো কনকনে স্রোত ওঠানামা করছে। পা—দু'টো একেবারে পাথর। হৃৎপিণ্ডে দমাদ্দম হাতুড়ি পেটার মতো কিছু একটা চলছে। মনে হল, বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। জীবনে কত জায়গায় গেছি, কত কী দেখেছি। কিন্তু এমন দৃশ্য আগে আর চোখে পড়েনি। ইতিহাসের পাতা থেকে পর্তুগিজ জলদস্যুরা প্রায় চার শতাব্দী পেরিয়ে সশরীরে যে বেরিয়ে আসতে পারে কে ভাবতে পেরেছিল। এত ভয় আগে কখনও পাইনি। আতঙ্কে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

সেই খসখসে গলাটা ফের কানে এল, 'ম্যান! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছ! পা চালাও—।'

বোম্বেটেরা যে কতটা নিষ্ঠুর, কতটা নৃশংস ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার বর্ণনা পড়তে পড়তে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। মাঝরাতে এই চারমূর্তি কী চায়, তাদের মতলবটা ঠিক কী, আঁচ করা যাচ্ছে না। ইচ্ছা করলে মুহূর্তে আমাকে শেষ করে ফেলতে পারে। তা হলে আমার মতো আগাগোড়া নিপাট নিরীহ বাঙালিকে ঘিরে ধরার কারণটা কী?

খসখসে গলায় যে কথা বলছিল, এবার সে যেন একটু বিরক্ত,—'কী হল তোমার? দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি?'

আরেকজন বেশ নরম গলায় বলল, 'হঠাৎ আমাদের দেখে ও ভড়কে গেছে। ধমকাচ্ছ কেন?' আমাকে বলল, 'চলো—।'

সামান্য হলেও সাহস ফিরে পাচ্ছি। ওরা যা বলেছে সেটাই করতে হবে। নইলে হয়তো খেপে গিয়ে—। আমি সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

চার বোম্বেটে আমাকে একরকম বেড় দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলল। আমার গলা দিয়ে টুঁ শব্দটি বেরুচ্ছে না, ওরাও কিছু বলছে না। সমুদ্রের গর্জন ছাড়া চারজোড়া ভারী বুট আর আমার চটির আওয়াজ ছাড়া অন্য কোনও শব্দ নেই।

সাহস আরও বাড়ছিল। না, ওরা আমার ক্ষতি করবে না বলেই মনে হচ্ছে। চকিতে সেই ছিনতাইবাজ ছোকরাগুলোর কথা মনে পড়ল। হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, চাঁদের আলোয় ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা পালিয়ে যাচ্ছে।

একসময় বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি চলে এলাম। চার বোম্বেটে দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন বলল, 'তোমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। ওই যে তোমার হোটেল।

খেয়াল করিনি, এবার নজরে পড়ল, মাত্র চারশো—সাড়ে চারশো ফিট দূরে আমাদের 'এভারগ্রিন লজ'।

অন্য একজন বলল, ‘চলে যাও, ওই বদমাশ স্ট্রিট ডগগুলো তোমার ধারেকাছে আর ঘেঁষবে না।’

অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে পা বাড়াতে যাচ্ছি, তিন নম্বর বোম্বেটেটি আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, ‘কিছুক্ষণ আগে বন্ধুদের কাছে খুব গলাবাজি করছিলে না—আফটার ডেথ ঘোস্ট, স্পিরিট কিচ্ছু নেই, সব বোগাস! কিন্তু নিজের চোখেই দেখলে তো, আমরা দিব্যি আছি। বম্বের এই কোস্টে সাড়ে তিনশো বছর ধরে। আরও হাজার বছর থেকে যাব; বুঝলে হে। আচ্ছা গুড বাই—।’

খিকখিক করে একটু হাসির আওয়াজ। তারপর কোথায় কী! চারমূর্তি পলকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

—

গা ছমছম একটা বিকেল

চুয়ান্ন বছর আগে সেই উনিশ শো ঊনষাটে আমি দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলাম। কেন গিয়েছিলাম, তার সঙ্গে এই গল্পের সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক যেটুকু তা হল মহেশের সঙ্গে পরিচয় হওয়া।

মহেশ চাপেকার মারাঠি। সে ছিল বম্বের ইংরেজি খবরের কাগজ 'ডেইলি নিউজ'—এর রোভিং রিপোর্টার। তার কাজ ছিল সারা দেশ ঘুরে চমকে দেওয়ার মতো খবর জোগাড় করা। সেই সব খবর পাঠকরা গোগ্রাসে গিলত।

মহেশ আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। খুবই হাসিখুশি, সারাক্ষণ যেন টগবগ করে ফুটছে। মানুষকে আপন করে নেওয়ার মতো আশ্চর্য জাদু ছিল তার মধ্যে। আলাপ হল 'আপনি—টাপনি' দিয়ে। একঘণ্টার ভেতর 'তুমি', তার ঘণ্টা চারেক পর একেবারে 'তুই'তে নেমে গেলাম আমরা। যেন কতকালের বন্ধু। দু—হাজার পাঁচ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত সেই বন্ধুত্ব অটুট ছিল। আমি আছি কলকাতায়, সে থাকত সেই আমলের বম্বে, পরে মুম্বাইতে। দু—তিন দিন পরপর আমাকে ফোন না করলে তার ঘুম হত না। এতটাই ছিল আমার ওপর তার টান। এসব অনেক পরের কথা।

দণ্ডকারণ্যের কাজ শেষ করে আমরা রায়পুর এলাম। এখান থেকে সে যাবে দেশের পশ্চিম প্রান্তের আরব সাগরের পাড়ের শহরে, আমি ঠিক উলটোদিকে, হুগলি নদীর পাড়ে দেশের পূর্ব প্রান্তের শহরে। কিন্তু মহেশ আমাকে ছাড়ল না, টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেল বম্বেতে। আমাকে এতটাই ভালো লেগে গিয়েছিল যে তার ইচ্ছা আমি বম্বেতেই চাকরি বাকরি জুটিয়ে তার কাছাকাছি থেকে যাই। পাকাপাকিভাবে থাকাটা অবশ্য সম্ভব হয়নি। তবে সেই যে গিয়েছিলাম, একটানা দশটি মাস কাটিয়ে এসেছি। একটা সময় এমন হয়েছিল যে প্রায় প্রতি মাসেই আমাকে সেখানে যেতে হয়েছে। কলকাতা থেকে বম্বে, বম্বে থেকে কলকাতা—এটা বেশ কিছুকাল আমার মাসিক রুটিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

যাক, প্রথম যাত্রার কথা বলা যাক। আমরা রায়পুর থেকে বম্বে মেলে চড়ে ভোরবেলা বম্বের দাদার স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে খুব কাছে শিবাজি পার্কের গায়েই মহেশদের বাড়ি। সে আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল। আমি ঘাড় বেঁকিয়ে রইলাম। অন্যের বাড়িতে থাকাটা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। কেমন আড়ষ্ট—আড়ষ্ট লাগে। অনেক জোরাজুরি করল মহেশ। তাকে বললাম, 'তোর সব কথা শুনেছি, এটা পারব না। আমাকে একটা মোটামুটি ভদ্র টাইপের হোটেল ঠিক করে দে।'

হাল ছেড়ে দিয়ে বেজার মুখে খার—এ (শহরতলির একটা জায়গা) তার জানাশোনা পাপাজি মানে সর্দারজিদের একটা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিল। আমার বম্বের প্রথম আস্তানাটা বেশ নিরিবিলি। চারদিক ফাঁকা ফাঁকা। গাছপালা প্রচুর, পাখি অজস্র। তেতলা লম্বা ধরনের হোটেল বিল্ডিং—এর দোতলার কোণের দিকের একটা ছোট ঘরে ঘাঁটি গাড়লাম। সাবার্বন ট্রেনে এখান থেকে শিবাজি পার্ক পৌঁছুতে হলে মাতুঙ্গা কি দাদারে নেমে বাস ধরলে মিনিট দশ—বারো লাগে।

কলকাতায় যাঁদের সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা ছিল এমন অনেক কৃতী বাঙালি তখন বম্বেতে চলে গেছেন। বড় বড় কোম্পানিতে উঁচু পোস্টে কাজ করছেন। অনেকে হিন্দি

ফিল্মের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। বিখ্যাত শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিরাট একটা অ্যাডভারটাইজিং কোম্পানির আর্ট ডিরেক্টর। তিনি আমার প্রথম উপন্যাস 'পূর্বপার্বতী'র মলাটের চমৎকার ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। এঁদের সঙ্গে দেখা করলাম। কলকাতা থেকে একজন লেখক এসেছে। বাঙালির দলটা ভারী হবে। এজন্য ওঁরা সবাই খুশি। আমাকে ধরে রাখার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন।

আশুবাবু বিজ্ঞাপনের ইংরেজি কপি দিয়ে চটকদার বাংলায় তর্জমা করার কাজ দিলেন। সিনেমাতেও কিছু 'সিন' লেখার বরাতও জুটে গেল। সবাই ভরসা দিলেন, বম্বেতে টাকা উড়ছে, আমার পাকা একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমার সেদিকে মন নেই; যে ক'দিন থাকব খরচ চলে গেলেই হল। যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বেশিই আসতে লাগল। মাঝে—মাঝে মনে হত, কলকাতায় গিয়ে কী হবে, এখানেই থেকে যাই।

মহেশ তার ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে প্রায় রোজই আমার হোটেলে আসত। আমিও ওদের বাড়ি যেতাম। ওর মা—বাবা ভাইবোনেরা চমৎকার মানুষ। সপ্তাহে একদিন অন্তত ওদের বাড়ি না গেলে ক্ষুব্ধ হতেন। দিনগুলো মোটামুটি ভালোই কাটতে লাগল।

এবার আসল গল্পে আসা যাক। মহেশ ছিল দারুণ ঈশ্বরভক্ত ছেলে। গণপতি থেকে মা দুর্গা, মা কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী—তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর নাম শুনলেই হাতজোড় করত। রাস্তায় অশ্বত্থগাছের তলায় তেল—সিঁদুর মাখানো পাথর দেখলে মাথা ঝুঁকিয়ে দিত। তা ছাড়া সাধু—সন্ন্যাসী ফকির দরবেশ তান্ত্রিক, কারও খবর পেলেই তাদের কাছে দৌড়ত। ভূত—প্রেত সমস্ত কিছু বিশ্বাস করত। জ্যোতিষীদের ওপর ছিল অসীম ভরসা। এদের পেছনে কত টাকা যে খরচ করেছে, তার হিসেব নেই। আমি এসবের কিছুটা বিশ্বাস করতাম, অনেকটাই করতাম না।

মহেশের এক প্রিয় বন্ধু ছিল সুরেন্দ্র দানি। তারা গুজরাটি। তার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল মহেশ।

গুজরাটিরা এমনিতেই খুব শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী হয়। কখনও উঁচু গলায় চেঁচিয়ে—মেচিয়ে কথা বলে না। তারা ধর্মভীরু এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী। আমি অন্তত যেসব গুজরাটিকে দেখেছি তাদের কথা বলছি। কিন্তু সুরেন্দ্র একেবারে সৃষ্টিছাড়া। সারাক্ষণ হইচই করছে। প্রচণ্ড নাস্তিক—ঈশ্বর—টিশ্বর মানে না। সাধু—সন্ন্যাসীদের ওপর এতটুকু ভক্তি নেই।

তাদের নাম করলে ভুরু কুঁচকে তাচ্ছিল্যের সুরে বলত, 'ওগুলো ভণ্ড, বজ্জাত। ওদের ধরে এনে রাস্তার পাথর ভাঙা কি কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে জমিতে চাষ করানো দরকার। তাতে দেশের উপকার হবে।'

জ্যোতিষীদের কথা উঠলে খেপে যেত।—'ওরা জোচ্চোর। মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকায়। হাত বা জন্মপত্রিকা মানে কোষ্ঠী—টোষ্ঠী দেখে বলে সামনে তোমার মহাবিপদ, কিংবা ছেলের লেখাপড়ায় মন নেই, বা মেয়ের বিয়েতে বাধা পড়বে, কাজেই হিরে পরো, চুনি পরো, মেয়েকে নীলা পরাও, ছেলেকে পোকরাজ পরাও—এইভাবে দামি দামি রত্ন গছিয়ে প্রচুর টাকা কামায়। এরা সমাজের প্যারাসাইট! মানে পরগাছা।'

সুরেন্দ্র নিরামিষের ধার ধারে না। হোটেল রেস্তোরাঁয় গিয়ে মটন—চিকেন খায়। তবে মনটা ভীষণ ভালো। গরিব ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে না, সে তাদের স্কুলের

খরচ চালায়, বই—টই কিনে দেয়। কেউ মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, জানতে পারলে সব ব্যবস্থা করে দেয়। কেউ চিকিৎসা করাতে পারছে না, খবরটা কানে গেলেই দৌড়ে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবে।

সুরেন্দ্রদের বিরাট গারমেন্টের ব্যবসা। প্যারেলে মস্ত কারখানা, সেখানে শ'তিনেক দর্জি তিন শিফটে শার্ট—প্যান্ট বানায়। সেসব পোশাকের আশি ভাগ বিদেশে এক্সপোর্ট করে। ওদের কোটি—কোটি টাকা। শিবাজি পার্কের পাশে মহেশদের বাড়ির কাছেই ওদের মস্ত চোখধাঁধানো বাড়ি। বিরাট বড়লোক। কিন্তু নাক—উঁচু ভাব নেই। বাড়িতে আট—দশটা নতুন নতুন মডেলের গাড়ি আছে কিন্তু কোথাও যেতে হলে আমাদের মতো ট্রেনে—বাসেই যায়। সুরেন্দ্রর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

এক রবিবার সকালে মহেশ আমার হোটেলে ফোন করল। দারুণ উত্তেজিত ভাবে বলল, 'জানিস, এক সিদ্ধপুরুষের খবর পেয়েছি। বিরাট তান্ত্রিক। আন্ধেরি ইস্ট ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে তাঁর আশ্রম। কীভাবে সেখানে যেতে হবে, সব জেনে নিয়েছি। তিনি নাকি মুখ দেখে মানুষের ভূত—ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। আজ বিকেল তিনটেয় রেডি থাকিস; আমি ওই আশ্রমে যাচ্ছি, তোকেও নিয়ে যেতে চাই। যাবি তো?'

সাধু—সন্ন্যাসীর ব্যাপারে আমার আগ্রহ আছে। বললাম, 'নিশ্চয়ই যাব।' তখন আমি এখানে—সেখানে ভেসে বেড়াতে—বেড়াতে বম্বেতে এসে ঠেকেছি। আমার ভবিষ্যৎ যদি জেনে নেওয়া যায়, সেইমতো ছক তৈরি করে এগুনো যাবে।

মহেশ বলল, 'কিন্তু একটা প্রবলেম দেখা দিয়েছে।'

'কীসের প্রবলেম?'

'সুরেন্দ্রটা কীভাবে টের পেয়ে আমাদের সঙ্গেই ভিড়তে চাইছে। একবার যখন গোঁ ধরেছে, ওকেও সঙ্গে নিতে হবে। নানাভাবে ওকে কাটিয়ে দিতে চেয়েছি, কিন্তু কোনও কথা শুনছে না। জানিসই তো সুরেন্দ্র কীরকম ছেলে। আশ্রমে গিয়ে সাধুকে উলটোপালটা কিছু বলে যদি চটিয়ে দেয় আমাদের বারোটা বেজে যাবে।'

বললাম, 'ছাড়বে না যখন, তখন ওকে নিতেই হবে। ভালো করে বোঝা, যেন আশ্রমে গিয়ে শান্তশিষ্ট থাকে। কোনও রকম গোলমাল না পাকায়।'

'দেখি—।'

ঠিক তিনটেয় মহেশ আর সুরেন্দ্র এসে হাজির। আমরা তিনজন বেরিয়ে পড়লাম। খার থেকে সাবার্বন ট্রেনে আন্ধেরি। মিনিট পনেরো। সেখান থেকে বাস ধরতে হবে।

তখন আন্ধেরির ওই দিকটা ভীষণ ফাঁকা—ফাঁকা। এখানে একটা বাড়ি, তো দেড়শো গজ দূরে আরেকটা। স্টেশনে নেমে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তারপর বি ই এস টি—র লাল টকটকে বাস এল। আমরা উঠে বসলাম।

বাস চলতে শুরু করেছে। এক সময় বিখ্যাত চিত্র পরিচালক বিমল রায় যিনি 'দো বিঘা জমিন', হিন্দি 'দেবদাস', 'পরিণীতা', 'সুজাতা'—এই সব ছবি তৈরি করেছেন, তাঁর 'মোহন স্টুডিয়ো' পেরিয়ে কতদূর চলে এসেছি, খেয়াল নেই। এখানে শুধু চারপাশে পাহাড় আর জঙ্গল।

মহেশের কথামতো কন্ডাক্টর এক জায়গায় আমাদের নামিয়ে দিয়ে একটা পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কারওকে জিজ্ঞেস করে আশ্রমটা ঠিক কোথায় যে জেনে নেওয়া যাবে, তার উপায় নেই। কেন না, আশেপাশে বা দূরে একটি মানুষও চোখে পড়ছে না।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞেস করল, 'আশ্রমের রাস্তাটা চিনিস তো? যে খবর দিয়েছে তার কাছে ঠিকমতো বুঝে নিয়েছিস?'

'মহেশকে বেশ চিন্তিত দেখাল। সে বলল, 'বাসস্টপে নেমে একটু এগিয়ে বাঁ—দিকে বাজ—পড়া বড় পিপুল গাছ আছে, তার পাশ দিয়ে সরু পথ দিয়ে খানিকটা গেলেই আশ্রম।'

অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাজ—পড়া পিপুলগাছটি পাওয়া গেল। ততক্ষণে আমরা ঘেমে নেয়ে গেছি। কারণ এখানকার রাস্তা উঁচু—নীচু, পাহাড়—কাটা। এত ওঠানামায় হাড়গোড় থেঁতো হওয়ার জোগাড়।

মহেশ কিন্তু বিপুল উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল—'এইবার আশ্রমটা বের করা যাবে। আয় —!'

বাস রাস্তা থেকে বাঁ—দিকের একটা সরু কাঁচা রাস্তায় ঢুকে পড়লাম। দুপাশ থেকে ঝাঁকড়া—ঝাঁকড়া প্রকাণ্ড গাছগুলোর ডালপালা রাস্তার ওপর চাঁদোয়া তৈরি করে দাঁড়িয়ে আছে। মহেশ আমাদের টিম লিডার। সে আমাদের নিয়ে চলছে তো চলছেই।

চারদিক নিস্তব্ধ। এই দিনের বেলাতেও ঝোপঝাড় থেকে একটানা ঝিঁঝির ডাক উঠে আসছে। মাঝে মাঝে গাছের মাথায় পাখিদের ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ। অনেক দূরে দূরে পাহাড়ের মাথায় দু—একটা ঝাপসা পাহাড়ি গ্রাম। সেখানে ছোট—ছোট পুতুলের আকারের দু—চারটে ঘাটিকে (পাহাড়ি) দেখা যাচ্ছে। মনে হয়, ব্যস্ত শহরের তুমুল কোলাহলময় জীবন থেকে আচমকা যেন একটা অচেনা, আদিম জগতে চলে এসেছি।

সুরেন্দ্র বলল, 'আর পারছি না মহেশ। হাঁটুর হাড় আলগা হয়ে আসছে। আর কতদূরে তোর আশ্রম?'

আমার হালও একই রকম। কোনওরকমে এবড়ো—খেবড়ো পথে ছোট—ছোট চড়াই —উতরাই ভেঙে এলোমেলো পা ফেলে একরকম খুঁড়িয়ে—খুঁড়িয়ে হাঁটছি।

মহেশও খানিকটা ধসে পড়েছো। কিন্তু সিদ্ধপুরুষের গন্ধ যখন পেয়ে গেছে, এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। বলল, 'আর খানিকটা চল।'

সুরেন্দ্র প্রায় ককিয়ে উঠল। 'আর খানিকটা, আর খানিকটা করে ঘণ্টাখানেক হাঁটালি! তোর মতলবটা কী? আমাদের কি নর্থ পোলে নিয়ে যাবি?'

আমি বললাম 'ইমপসিবল! মহেশ, এবার ফিরে চল—।'

মহেশ কাকুতিমিনতি করতে লাগল, 'প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ। ফিরে যাওয়ার কথা বলিস না। আর দশ মিনিট চল। তখনও যদি আশ্রমটা না পাওয়া যায়—'

তার কথা শেষ হতে না—হতেই তিনরকম গলায় বিকট গর্জন আমাদের দিকে ধেয়ে এল।'

'রুখ যা, রুখ যা, রুখ যা!'

সারা শরীর কেঁপে উঠল। আমাদের তিন জোড়া পা আপনা থেকেই থমকে গেছে। চমকে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় একশো গজ দূরে তিনজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানের সন্ন্যাসীর বয়স পঁয়ষট্টি—ছেষট্টি। মাথায় ধবধবে চুলের গোটাকয়েক

জটা। মুখে সাদা দাড়ির জঙ্গল। হাইট ছ'ফুটের কাছাকাছি। এই বয়সেও জবরদস্ত চেহারা খালি গা, রোমশ বুক। কোমর থেকে পায়ের পাতা অবধি লাল লুঙ্গির মতো ঢোলা পোশাক; যাঁকে বলে রক্তাম্বর। কপালে মস্ত বড় গোলা সিঁদুরের টিপ।

দুপাশের দুজনের বয়স পঁয়ত্রিশ—ছত্রিশের বেশি হবে না। এদের হাইট আরও বেশি। চেহারা যেন পাথর দিয়ে তৈরি। বুকের পাটা কম করে পঞ্চাশ ইঞ্চি। এদেরও একই রকম ইউনিফর্ম। মাথায় জটা, কপালে সিঁদুরের বড় গোলাকার টিপ, বুকে লোমের ঝোপঝাড়। দুটো বুনো বাইসনকে রক্তাম্বর পরালে যেমন দেখায়, অনেকটা সেইরকম। আন্দাজ করে নিলাম, এরা তান্ত্রিক। বয়স্ক সন্ন্যাসীটি গুরুদেব, দু'পাশের দুজন তার শাগরেদ।

তিন তান্ত্রিকের চোখ যেন জ্বলছে। এই নির্জন জঙ্গল, আর মাঝখানে উৎপাতের মতো আমরা যে হাজির হয়েছি, সেটা তাদের পছন্দ হচ্ছে না। তিনজনই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

গুরুদেব হুঙ্কার দিল, 'ভাগো—! ভাগো—!

মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত নাড়তে নাড়তে একই কথা অনবরত বলতে লাগল।

দুই শাগরেদও কোরাসে হুঙ্কার ছাড়তে লাগল।

'ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো, আভভি—!'

এমন একটা ভাব, আমরা না চলে গেলে একেবারে ছিঁড়ে খাবে।

সুরেন্দ্র আর আমি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছি। শুকনো গলায় বললাম, 'এখানে থাকাটা আর নিরাপদ হবে না, চল, পালাই—।'

সাধু—সন্ন্যাসী ফকির দরবেশ ঘেঁটে ঘেঁটে মহেশ বেশ পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। ওদের মনস্তত্ত্বটি ভালোই বুঝতে পারে। বলল, 'ঘাবড়াস না। দেখ না শেষ পর্যন্ত কী হয়।'

মিনিট দশেক হুমকি দেওয়ার পর গালাগালি দিতে শুরু করল দুই শাগরেদ; আমাদের চোদ্দো পুরুষ উদ্ধার করে মিনিটে পাঁচশোটা করে নোংরা—নোংরা শব্দ উগরে দিতে লাগল।

মহেশকে ওরা টলাতে পারল না। বলল, 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। ওরা আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে।'

গালাগালির পরে দুই শাগরেদ এবার পাথর ছুড়তে শুরু করল, 'আমাদের মাথার ওপর দিয়ে, পাশ দিয়ে সেগুলো মিসাইলের মতো উড়ে যাচ্ছে। একটা যদি গায়ে লাগে, বেঁচে আর ফিরতে হবে না, এখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হবে।'

মহেশের সেই অভয়বাণী,—'ভয় পাস না। এখনও ওদের পরীক্ষা নেওয়া শেষ হয়নি। একটু পিছিয়ে চল—।'

পঁচিশ গজের মতো পেছন দিকে সরে গেলাম। এবার আর পাথরের টুকরোগুলো গায়ে লাগার সম্ভাবনা নেই। সেগুলো একটু দূরে—দূরে এসে পড়ছে।

একসময় গুরুদেব হাত তুলে দুই শাগরেদকে থামতে ইশারা করলেন। গোলাবর্ষণ বন্ধ হল।

লক্ষ করলাম, গুরুদেবের চোখেমুখে কিছুক্ষণ আগের মতো আগুনের হলকা নেই; অনেকটা নরম মনে হচ্ছে তাকে। হাতছানি দিয়ে আমাদের ডাকল, 'আ যা আ যা—।'

মহেশ চাপা গলায় আমাদের বলল, 'পরীক্ষায় আমরা পাশ করেছি; আর ভয় নেই। চল—।'

গুরুদেবের কাছে যেতেই হিন্দিতে বলল, 'আমার সঙ্গে চল—।'

শাগরেদরা কিছু বলল না। হিংস্র দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাতে—তাকাতে সঙ্গ নিল। গুরুদেব যে তিন অচেনা ছোকরাকে করুণা করেছে, সেজন্য তারা খুশি হতে পারেনি। কিন্তু কিছু করার নেই। গুরুদেবের ওপর কথা বলবে, তেমন স্পর্ধা বা সাহস ওদের নেই।

একটু দূরেই আশ্রম। একটা বিশাল বটগাছের গুঁড়ির পনেরো ফিটের মতো হাইটে অনেকখানি জায়গা জুড়ে টিনের চালা। মাথায় একটা বাঁশের ডগায় লাল কাপড় বাতাসে উড়ছে। কয়েকটা ইটের দেওয়ালে ঘেরা ঘরও রয়েছে। বটগাছের গুঁড়িটার তলায় বসার জন্য তিন—চারটে শতরঞ্চি পাতা। তার ঠিক সামনেই উঁচু বেদির মতো জায়গা। সেখানে পুরু পশমের আসন পাতা। আমাদের শতরঞ্চিতে বসতে বলে গুরুদেব বেদির ওপর বসল।

লক্ষ করলাম, টিনের চালার তলায় বটগাছের দু—চারটে সরু ডাল রয়েছে, বাকি ডালগুলো চালের ওপর। নীচের ডালে অনেক সাধু—সন্ন্যাসীর বাঁধানো ফোটো দড়ি দিয়ে বাঁধা; সেগুলো ঝুলছে। এদের মধ্যে বামাক্ষ্যাপা, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বাবা লোকনাথকে চিনতে পারলাম। বাকি সবাই আমার অচেনা।

আরও চোখে পড়ল, আমাদের শতরঞ্চিগুলোর কাছাকাছি আট—দশটা গর্ত। সেগুলো থেকে হঠাৎ ক'টা সাপ বেরিয়ে এল। আমরা তিন বন্ধু আতঙ্কে একেবারে সিঁটিয়ে গেলাম। এরা কেউ নিরীহ ঢোঁড়া সাপ নয়। যদি ছোবল মারে, আর দেখতে হবে না; পলকে মৃত্যু।

গুরুদেব হেসে হেসে পরম স্নেহে সাপগুলোকে বলল, 'বাচ্চালোক, যা—যা। ইয়ে তিন ছোকরা ডরতা হ্যায়।'

কী আশ্চর্য, মারাত্মক বিষধর সাপ ক'টা নিঃশব্দে সুড়সুড় করে গর্তে ঢুকে গেল। এবার গুরুদেব গম্ভীর মুখে আমাদের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী জানতে চাস বল—।'

মহেশ আর আমি সাষ্টাঙ্গে গুরুদেবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে উঠে বসলাম। সুরেন্দ্র চুপচাপ বসে রইল। সাধু—টাধুদের পায়ে হাত ঠেকাবার পাত্রই সে নয়। গুরুদেব চোখের কোণ দিয়ে সেটা লক্ষ করেছে। কিন্তু কিছু বলেনি।

মহেশ হাতজোড় করে বলল, 'বাবা তুমি তো অন্তর্যামী। আমাদের দেখে সব কিছু বুঝতে পেরেছ। তুমিই বলো।'

গুরুদেব নরম গলায় বলল, 'তুই তো পত্রকার (সাংবাদিক) আখবরে (খবরের কাগজে) কাজ করিস।'

আমরা অবাক। গুরুদেব আগে কখনও আমাদের দেখেনি। তবু কী করে জানতে পারল, মহেশ সাংবাদিক! সত্যি লোকটার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। মহেশ ঘাড় কাত করল, 'হ্যাঁ বাবা।'

গুরুদেব বলল, ‘তোর এই কাগজে কাজ করতে আর ভালো লাগছে না। আরও বড় কাগজে নৌকরি (চাকরি) করতে চাস, তাই তো?’

মহেশ অভিভূত, ‘হ্যাঁ বাবা।’

‘দু’বছর পর তোর মনোকামনা পূরণ হবে। তার এক সাল বাদে শাদি হবে। বহু (বউ) আচ্ছা হবে, সে—ও নৌকরি করবে; খুব খুবসুরত (সুন্দরী) হবে।’

এরপর তার দৃষ্টি এসে পড়ল আমার ওপর, ‘তুই বংগালী (বাঙালি)?

আমি হাতজোড় করেই ছিলাম। বললাম, ‘হ্যাঁ।’

‘ভাবছিস তো বোম্বাইতে থেকে যাবি?’

‘হ্যাঁ বাবা।’

‘তোর এখানে পাকাপাকি থাকা হবে না। তবে বারবার এখানে আসবি। কলকাতায় তোর নামকাম হবে। আর একটা কথা, তুই সহ্য করতে পারবি?’

‘বলো বাবা। পারব।’

‘দো সাল বাদ (দু—বছর পর) তোর ছোটা ভাইয়ের মৌত (মৃত্যু) হবে। তার নসিবে এটাই আছে। এই মৌত (মৃত্যু) ঠেকানো যাবে না। ভগোয়ানের তাই ইচ্ছা—।’

বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। গুরুদেব আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল। হয়তো ভবিষ্যতের মহাশোকের জন্য আগাম সান্ত্বনা দিয়ে রাখল।

এবার, তার নজর গিয়ে পড়ল সুরেন্দ্রর ওপর। মুহূর্তে গুরুদেবের চেহারাটাই বদলে গেল। মুখটা এখন গনগন করছে; চোখ থেকে আগুনের ফুলকি ছুটছে। কর্কশ গলায় বলল, ‘হারামজাদা, তুই আমাকে পরীকষা (পরীক্ষা) করতে এসেছিস? ভগোয়ান সাধুসন্ত কারওকে মানিস না! যা, অভভি বাড়ি চলে যা। তোর বড়ে ভাইয়ের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। যা, ভাগ—!’

বাইসনের মতো গুরুদেবের দুই শাগরেদ একধারে দাঁড়িয়ে ছিল। হেঁড়ে গলায় তারাও বলল, ‘যা—যা, ভাগ—’

সুরেন্দ্রর মুখটা কেমন যেন নীলবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যে সাধু দরবেশ দেখলে নাক সিঁটকোয়, বিদ্রুপ করে, তাকে আর চেনা যাচ্ছিল না। চাপা আতঙ্কের সুরে সে বলল, ‘গুরুদেব, বড়ে ভাই কি বাঁচবে না?’

‘বাঁচবে। তবে বাকি জিন্দেগি লাঠিতে ভর করে হাঁটতে হবে। তার একটা আঁখ নষ্ট হয়ে যাবে।’

বলেই কী ভেবে আমার দিকে তাকাল, ‘বেটা, তোর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।’

ফিরে গিয়ে দেখা গেল গুরুদেবের কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সুরেন্দ্রর দাদা বীরেন্দ্র দাদার টিটির (ট্রাম টারমিনাস। তখন বম্বেতে দোতলা ট্রাম চলত) কাছে ট্রাক চাপা পড়েছে। তার বুকের পাঁজরা ভেঙে গেছে। একটা চোখে কাচ ঢুকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল, বাঁ—পায়ের মালাইচাকি চুরমার। তাকে নার্সিং হোমে ভরতি করা হয়েছে।

গুরুদেব মহেশকে আর আমাকে যা বলেছিল, তাও ফলে গেছে। আমি সেই উনিশশো ঊনষাটে প্রথম বম্বে যাওয়ার পর আরও বহু, বহুবার ওই মহানগরে গেছি। কিন্তু প্রচণ্ড

ব্যস্ততার কারণে সেই গুরুদেব আর তার আশ্রমে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আসলে তাদের কথা মনেই পড়েনি।

তারপর দু—হাজার নয় সালে যখন মুম্বাই (তখন আর বম্বে নয়, নাম পালটে গেছে) যাই, স্থিরই করেছিলাম, সেই আশ্রমে যাবই যাব।

আন্ধেরি ইস্টে বিমল রায়দের মোহন স্টুডিয়ো তখন উঠে গিয়ে কী একটা মস্ত কারখানা হয়েছে। সেটা পেরিয়ে অনেক দূরে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। আগের সেই জঙ্গল, নির্জনতা কিছুই নেই। যেদিকে তাকানো যাক, অসংখ্য হাইরাইজ আর কলকারখানা। রাস্তাগুলো অনেক চওড়া হয়ে গেছে। প্রচুর মানুষ। সারাক্ষণ স্রোতের মতো গাড়ি ছুটছে।

তিন—চার ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পরও সেই আশ্রম, গুরুদেব আর তার বিপুল আকারের দুই শাগরেদের হদিশ পাইনি। এখন আমার মনে হয়, সত্যিই কি মুম্বাই শহর থেকে খানিকটা দূরে ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ের মাঝখানে সেই আশ্রমে কখনও গিয়েছিলাম? নাকি সেটা আমার কল্পনা?

—

আমার হিরের টুকরো ছাত্র

পঁয়ষট্টি বছর আগের কথা।

আমার বয়স তখন উনিশ টুনিশ হবে। তারও কয়েক বছর আগে ভারত স্বাধীন হল, সেই সঙ্গে দেশভাগও। তখনকার পূর্ববাংলা রাতারাতি পূর্ব পাকিস্তান (এখন বাংলাদেশ) হয়ে গেল।

আমরা পদ্মাপারের আকাট বাঙাল এবং রিফিউজি। আমাদের পক্ষে আর পাকিস্তানে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। সেখানে যা চলছিল তাতে আতঙ্কে দেশ ছাড়তে হয়েছে।

একজন মহা মহা পণ্ডিত এবং মহা মহা রসিক লেখক, শুনেছিলাম তাঁদের অঢেল টাকাপয়সা, মজা করে তাঁর জাদু—কলমে কোথায় যেন লিখেছিলেন খুবই 'কষ্টেস্রষ্টে' তাঁর নাকি দিন কাটছে। তা হলে আমরা যারা সীমান্তের ওপারে বাড়িঘর, জমিজমা ফেলে চলে এসেছি তাদের হাল সেইসময় কীরকম তা কি আর বুঝিয়ে বলতে হবে? কোনও রকমে টিকে আছি।

আমার ঘাড়ে তখন লেখালেখির ভূত চেপেছে। এ—পত্রিকায় সে—পত্রিকায় গল্প—টল্প লিখে মাসে কুড়ি—পঁচিশ টাকার বেশি আমদানি হয়। পকেট প্রায় সবসময়ই ফাঁকা।

পাকিস্তান থেকে এপারে এসে আমরা উঠেছিলাম ভবানীপুরের এক পুরোনো পাড়ায় আধাবস্তি টাইপের লম্বা ব্যারাকের মতো একটা বাড়িতে। সেখানে ছিল আমাদের মতোই আরও ছ'টা রিফিউজি ফ্যামিলি।

এই পাড়াতেই থাকতেন সুধাকরবাবুরা। সুধাকর লাহা। তাঁদের বনেদি বংশ, মোটা মোটা থামওয়ালা মস্ত তেতলা বাড়ি। আশুতোষ না মুরলীধর কোনও একটা কলেজে ইতিহাস পড়াতেন। চমৎকার মানুষ। সারাক্ষণ মুখে হাসি। কেন যেন আমাকে ভীষণ পছন্দ করতেন। আমাদের সব খবর রাখতেন। একদিন সন্ধেবেলায় লোক পাঠিয়ে তাঁদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে বললেন, 'টুইশনি করবি? ক্লাস সেভেনের ছাত্র। সপ্তাহে চারদিন পড়াতে হবে। পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে—'

পঁয়ত্রিশ টাকা তখন অনেক টাকা, বিশেষ করে আমাদের মতো সেই সময়ের উদ্বাস্তুদের কাছে। আচমকা টুপ করে আকাশের চাঁদ যেন হাতে এসে পড়ল। আহ্লাদে আটখানা নয়, ষোলোখানা হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় গিয়ে পড়াতে হবে?'

সুধাকরবাবু বললেন, 'বেশি দূর নয়। আমাদের এই পাড়ার রাস্তাটা সোজা গিয়ে যেখানে ডান দিকে বেঁকেছে সেই মোড়ের মাথায় "জয়হরি স্টোর"। নিশ্চয়ই তোর চোখে পড়েছে —'

'পড়বে না? ওটার পাশ দিয়েই তো ট্রাম রাস্তায় যাই।'

'ওই দোকানের মালিক হল দোলগোবিন্দ সামন্ত। তার ছেলেকেই পড়াতে হবে। দোলগোবিন্দকে তোর কথা বলে রেখেছি। কাল একটু বেলার দিকে, এই ধর এগারোটা নাগাদ তার সঙ্গে দেখা করবি। ভুলে যাস না।'

উত্তেজনায় সারা রাত ভালো ঘুম হল না। সুধাকরবাবু বলে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজটা যদি না পাই? এই চিন্তাটা মাথার ভেতর কুটুর কুটুর করে পোকার মতো

কামড় বসিয়েছে। সকালে ঘুম ভাঙার পরও অস্থির—অস্থির ভাবটা কাটছে না।

আমাদের ঘড়ি—টড়ি নেই। তবে পাশের ভাড়াটেদের মান্ধাতার ঠাকুরদার আমলের একটা ওয়ালক্লক আছে। দেশের ভিটেমাটি খুইয়ে এপারে আসার সময় লুকিয়ে চুরিয়ে টুকিটাকি যে দু'চারটে জিনিস ওরা আনতে পেরেছে তার মধ্যে এই ঘড়িটাও ছিল। কিছুক্ষণ পর পর ঘড়িটা দেখে আসছি। এগারোটায় 'জয়হরি স্টোর'—এ যাবার কথা। আমি চাই ঘড়ির কাঁটাদুটো বাঁই বাঁই করে পাক খেয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে এগারোটা বাজিয়ে দিক। আসলে আমার তর সইছিল না। কিন্তু ঘড়িটা বেজায় ঠ্যাঁটা। নিজের মেজাজে টিক টিক করে চলতে লাগল।

সেই সময় প্যান্ট—শার্টের তেমন চল ছিল না। বেশির ভাগ বাঙালিই ধুতি আর ফুলশার্ট কি পাঞ্জাবি পরত। এগারোটা বাজার একটু আগে আগেই চান টান করে বাড়িতে কাচা পরিষ্কার একটা ধুতি আর হাফশার্ট গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

'জয়হরি স্টোর'—এর সামনে দিয়ে রোজ দু'চার বার যাতায়াত করলেও আগে সেভাবে লক্ষ করিনি। আজ চোখে পড়ল দোকানটা বেশ বড়, অনেকটা জায়গা জুড়ে। মুদিখানার সঙ্গে মনিহারি দোকান মিলিয়ে যেমনটা হয় সেইরকম। মালপত্রে ঠাসা। রাস্তার দিকে মাথার ওপর মস্ত সাইনবোর্ডে 'জয়হরি স্টোর' নামটা জ্বলজ্বল করছে। তার তলায় লেখা—প্রোঃ শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ সামন্ত। তার নীচে—স্থাপিতঃ বাং ১৩২৮ সাল।

কারবারটা যে বেশ জমজমাট, বলে না দিলেও চলে। পাঁচ—ছ'টা কর্মচারী খদ্দেরদের ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। ভেতর দিকে তক্তপোশের ওপর তেলচিটে, আধময়লা গদিতে কোলের কাছে ক্যাশবাক্স আগলে যে নাড়ুগোপাল—মার্কা ব্যক্তিটি থেবড়ে বসে আছেন তাঁর পরনে খাটো ধুতি আর ফতুয়া। কপালে চন্দনের ছাপে লেখা 'জয়হরি' গলায় তিন কণ্ঠি তুলসির মালা এবং কালো সুতোয় বাঁধা ছোটখাটো ঢোলের সাইজের রুপোয় বাঁধানো মাদুলি। মাথার পেছন দিকে একগোছা পুরুষ্টু টিকির ডগায় ক্লিপ দিয়ে সাদা ফুল আটকানো। বয়স পঞ্চান্ন—ছাপ্পান্ন হবে। এই আগাগোড়া পরম বৈষ্ণবটি যে শ্রীযুক্ত দোলগোবিন্দ সামন্ত, ঠিকই আন্দাজ করে ফেললাম।

গদিতে বসেই তিনি অনবরত কর্মচারীদের হুকুম দিয়ে যাচ্ছেন।—'এই ভবা, লিস্টি মিলিয়ে রমেনবাবুর মালগুলো গুছিয়ে দে।' 'এই গজু, নিবারণবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। দ্যাখ তাঁর কী কী দরকার—'

খদ্দেরদের মাল বুঝিয়ে দিয়ে কর্মচারীরা হিসেব করে টাকাপয়সা নিয়ে আসছে। দোলগোবিন্দ তিন চার বার গুনে সেসব ক্যাশবাক্সে ঢোকাচ্ছেন।

এইভাবেই দোকানদারি চলছে। খদ্দেরদের ভিড় ভেদ করে দোলগোবিন্দর কাছে কখন পৌঁছুতে পারব, বুঝতে পারছি না। দূর থেকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছি।

কর্মচারী আর খদ্দেরদের দিকে নজর থাকলেও তিনি কিন্তু আমাকে লক্ষ করেছিলেন। গদি থেকে উঠে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুধাকরবাবু পাঠিয়েছেন তো?'

আমি ঘাড় কাত করলাম, 'হ্যাঁ—'

মাথা ঝুঁকিয়ে গদগদ হয়ে হাতজোড় করলেন দোলগোবিন্দ, 'কী সৌভাগ্যি, আসুন মাস্টারমশাই, আসুন—'

দোলগোবিন্দকে বেশ ভালো লেগে গেল। খুবই বিনয়ী। আমিও হাতজোড় করলাম।

দোকানটার বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে সরু একটা প্যাসেজ। সুড়ঙ্গের মতো সেই ফালি পথটা দিয়ে দোলগোবিন্দ আমাকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে সেই গদিটার পাশে একটা বেতের চেয়ারে বসিয়ে গদিতে উঠে ঠিক আগের কায়দায় ক্যাশবাক্স আঁকড়ে ধরে থেবড়ে বসে পড়লেন। সারা মুখ জুড়ে হাসি যেন ছলাৎ ছলাৎ করছে। বললেন, 'সুধাকরবাবুকে এই তল্লাটের সব্বাই শেদ্ধাভক্তি করে। বড্ড মান্যিগাণ্যি, পণ্ডিত মানুষ। এমনটা আর দেখিনি এজন্মে। তেনার কাছ থেকে যখন আসচেন; আমি নিশ্চিন্তি। জয় হরি।—এই কাত্তিক, তুই তো তালকানা, খদ্দেরদের মালপত্তর ঠিক করে মাপবি। কম দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের যেন বদনাম না হয়। জয় হরি—'

বুঝতে পারছি প্রায় প্রতিটি বাক্যের শেষে একটা করে 'জয় হরি' থাকবে। আরও বোঝা গেল দোকানদারির ফাঁকে ফাঁকে দোলগোবিন্দ আমার সঙ্গে কথা বলবেন। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

হরিভক্ত বৈষ্ণবটি আচমকা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর গদির ঠিক পেছনের দেওয়ালে পাশাপাশি দুটো কাচ—বসানো বড় ছবি। একটা শ্রীকৃষ্ণের, অন্যটা শ্রীগৌরাঙ্গের। দুটো ছবির ওপর রজনীগন্ধা আর গোলাপ দিয়ে গাঁথা টাটকা মালা ঝুলছে। ছবির তলায় কাঠের তাকেও প্রচুর ফুল। একগোছা ধূপকাঠিও জ্বলছে। ফুল আর ধূপের গন্ধে চারিদিক ম ম।

তাক থেকে পেতলের একটা রেকাবি নামিয়ে আনলেন দোলগোবিন্দ। রেকাবিতে গোটাচারেক গোদা সাইজের তালশাঁস সন্দেশ রয়েছে সেগুলোর ওপর কয়েকটা ফুলের পাপড়ি। রেকাবিটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিনি বসে পড়লেন, 'এটুকু খান—'

ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। বললাম, 'এত সব মিষ্টি টিষ্টি কী ব্যাপার? না—না' জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগলাম।

দোলগোবিন্দ নাছোড়। হাতজোড় করে, জিব কেটে বললেন, 'শুধু মিষ্টি না, মিষ্টি না, শ্রীকৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গদেবের পেসাদ। আপনার জন্যে পুজো দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। দেখছেন না, ওগুলোর ওপর ফুলের পাপড়ি আর দুব্বো পড়ে আছে। একটা বড় কাজ করতে এসেছেন, সেটা যাতে বরাব্বর চালাতে পারেন সেইজন্যেই তো পুজো টুজো। পেসাদটা খেলে মনে বল পাবেন। দিন, দিন, মুখে দিন। জয় হরি—'

বড় কাজটা যে টুইশনি, আন্দাজ করতে পারছি। কিন্তু সেটা চালিয়ে যাবার জন্য দোলগোবিন্দকে পুজো দিতে হয়েছে, মনের জোর বাড়াতে প্রসাদ খেতে হবে, সব কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। আবার খটকাও লাগছে। লোকটার মাথায় গোলমাল টোলমাল নেই তো। প্রসাদ না খেলে দোলগোবিন্দ যদি বিগড়ে যান? তার ফলটা হবে এই —মাসে মাসে পঁয়তিরিশটা টাকার দফা রফা।

মিষ্টি—টিষ্টি খুব একটা পছন্দ করি না। তবু সন্দেশগুলো গলার ভেতর দিয়ে নীচের দিকে নামিয়ে দিলাম।

দোলগোবিন্দর মুখে মিটি মিটি স্বর্গীয় হাসি। বিগলিত হয়ে বললেন, 'কী আনন্দ যে পেলাম। দেখবেন এই প্রসাদ মনের শক্তি কতটা বাড়িয়ে দেয়। এখন তা হলে কাজের কথাটা আরম্ভ করি—'

যা কাণ্ডকারখানা চলছিল, ভেতরে ভেতরে বেশ মিইয়ে গেছি। এবার চনমনে হয়ে উঠলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, করুন, করুন।'

'বুঝলেন মাস্টারমশাই, আমাদের দেশ ছিল হাওড়া জেলার একটা গাঁয়ে। কিন্তু দেশের সঙ্গে সম্পক্ক আর নেই। তিন পুরুষ ধরে আমরা এই ভবানীপুরেই আছি। আমাদের বংশটা একটু ছিষ্টিছাড়া গোছের। অন্য কারুর সঙ্গে মিল পাবেন না। জয় হরি—!'

আমি হাঁ। কাজের কথা বলতে গিয়ে পরম বৈষ্ণবটি তাঁদের বংশের ইতিহাস—ভূগোল শোনাবেন নাকি? কী জাঁতাকলেই না পড়েছি। ঢোক গিলে বললাম, 'টুইশনির ব্যাপারটা —'

'হবে, হবে। আমরা সেদিকেই তো চলেছি। বংশের কথাটা পুরো না বললে বুঝবেন কী করে? আমার বাবারা একুনে ছিল পাঁচ ভাই। আগে দুই জ্যাঠা, মাঝখানে বাবা, তারপর দুই কাকা। এবার ধরুন, আমরা জেঠতুতো খুড়তুতো ভাই মিলিয়ে তা হব কুড়ি—পঁচিশ জনা। আমাদের ছেলেরা কম করে সত্তর—আশি। মহাভারতের কুরুবংশ আছে না, তার কাছাকাছি। অবিশ্যি একসঙ্গে থাকি না। সব আলাদা আলাদা।'

মহাভারত অবধি পৌঁছে গেছেন দোলগোবিন্দ। আমি আঁতকে উঠি, 'কিন্তু সামন্ত মশাই, টুইশনি নিয়ে—'

আমাকে থামিয়ে দিয়ে দোলগোবিন্দ বললেন, 'ঘাবড়াবেন না। সেখানেই চলে এসেছি। বাবা, কাকা, জ্যাঠা, তারপর আমরা, আমাদের পর আমাদের ছেলেরা—এতসব পঙ্গপালের ভেতর থেকে একজনাও ইস্কুলের চৌকাট পেরুতে পারেনি, কেউ কেলাস থিরি পাশ, কেউ ফোর, কেউ ফাইভ কি সিক্স। দৌড় ওই অব্দি। ভন্টে মানে আমার বড় ছেলে যাকে আপনি পড়াবেন বলে এসেছেন, একমাত্তর সে—ই ই কেলাস সেভেনে উটেচে। নিজের ক্ষ্যামতায় নয়, ঠেলে—ঠেলে তুলতে হয়েছে। ফাইভের শেষ পরীক্ষেয় অঙ্কে পেয়েছিল দশ, বাংলায় সতেরো, ইংরিজিতে নয়—এই রকম সব নম্বরের ছিরি। ওদের ইস্কুলের হেডমাস্টার অনুকূলবাবুর দয়ার শরীর। আমি দোকানে তালা ঝুলিয়ে, ব্যবসাপত্তর শিকেয় তুলে ঝাড়া দু' দুটো দিন তেনার বাড়িতে হত্যে দিয়ে পড়ে রইলাম। হেডমাস্টারের মন গলল। ভন্টে ফাইভ থেকে সিক্সে উঠল। সিক্সের শেষ পরীক্ষেয় সেই একইরকম নম্বর। ফের দু'দিন দু'রাত্তির হত্যে দিতে হল। ভন্টে সেভেনে উঠল। ব্যস। সেখেনেই শেষ অনুকুলবাবু বলে দিয়েচেন, এটাই লাস্ট।'

দোলগোবিন্দ আমাকে মুহুর্মুহু চমকে দিচ্ছেন। এতক্ষণ তেমন খেয়াল করিনি, হঠাৎ মনে হল কথা বলতে বলতে বার বার আমার পা থেকে মাথা অবধি নিরীক্ষণ করে চলেছেন। কী দেখছেন এত! আমি কি একটি দর্শনীয় প্রাণী? উশখুশ করতে লাগলাম।

দোলগোবিন্দ আমার অস্বস্তিটা টের পাচ্ছিলেন। বললেন, 'থির হয়ে বসুন মাস্টারমশাই। আরও কিছু কথা আচে। মন দিয়ে শুনুন। জরুরি কথা। ঠেলে গুঁতিয়ে যেমন করে পারি ভন্টেকে সেভেনে তুলিচি। আমাদের বংশের ও হল সব চেয়ে বড় বিদ্বান লোক। আমি ভন্টেকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখি। মেরেকেটে ছোকরাকে যদি ম্যাট্রিকটা পার করিয়ে দিতে পারেন আমাদের বংশের মুখে ঝাড়বাতি জ্বলবে—'

বলেই আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগলেন, 'না। কাজটা অত সোজা না। আগে আপনি ভন্টেকে সেভেন থেকে এইটে তুলুন। ঝাড়বাতি না হোক, পিদিম তো জ্বলবে। আপনাকে সোনার কলম আর সোনার ফিতেওলা ঘড়ি দেব। ভবানীপুরে দু'দিন মোচ্ছব লাগাব।'

বলেই কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। 'কিন্তু সমিস্যেটা হল—'

'কীসের সমস্যা?'

হঠাৎ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন দোলগোবিন্দ, 'উঠুন তো মাস্টারমশাই, উঠে দাঁড়ান—!'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে পড়লাম। লোকটা আমাকে নিয়ে কী করতে চায়? পাগল করে ছাড়বে নাকি?

'আসুন, আসুন আমার কাচে—।' দোলগোবিন্দ হাতছানির মতো করে আঙুল নাড়তে লাগলেন।

আমি অবাক।—'আপনার কাছেই তো আছি—।'

'আরও কাচে, আরও কাচে।'

একবার ভাবলাম, সরে পড়ি। তারপরেই ভাবলাম, শেষ পর্যন্ত না দেখে ছাড়ছি না। গদির গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দোলগোবিন্দ বললেন, 'আপনার দু'হাতের গুল দেখান তো!'

গুল মানে মাসল, পেশি। আস্তে আস্তে জামার হাতা গুটিয়ে হাতের মুঠো পাকিয়ে মাসল ফোলাবার চেষ্টা করলাম। একটু বড় সাইজের মার্বেলগুলির মতো মাসল দেখা দিল। দোলগোবিন্দ সেটা টিপে বললেন, 'গুল কোথায়? এ তো একদম নেতিয়ে আছে।' তারপর বুকে পিঠে ডাক্তারদের মতো আঙুল ঠুকে ঠুকে, কখনও জোরে চেপে চেপে কিছু বুঝতে চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, 'শরীরে শাঁস বড্ড কম। হাড়ই বেশি। দেখা হয়ে গেচে। যান মাস্টারমশাই, বসুন। বলতে বলতে ঝপ করে গলা নামিয়ে দিলেন, 'বড্ড রোগা পটকা। হাতদু'টো কাঠি কাঠি, বুকের খাঁচায় মাংস নেই বললেই হয়।' বলে গলা নামিয়ে বিড় বিড় করতে লাগলেন, 'ক'দ্দিন যে টিকে থাকবে—।'

আমি গিয়ে চেয়ারে বসে পড়েছিলাম। কিন্তু দোলগোবিন্দর বিড়বিড়ানি কানে এসেছে। কীসের টিকে থাকা? আমরা দু'জন ছাড়া এখানে আর তো কেউ নেই। কার সম্বন্ধে ওই কথাগুলো বলছে?

দোলগোবিন্দ হঠাৎ গলা চড়িয়ে হাঁক দিলেন, 'গণশা! দাঁড়িপাল্লা ভজাকে দিয়ে এখানে আয়—।'

একটা তাগড়াই চেহারার কর্মচারী সামনে এসে দাঁড়াল। দোলগোবিন্দ তাকে বললেন, 'ভন্টেকে এখানে নিয়ে আয়। বলবি আমি ডেকিচি। ব্যাগড়বাই করলে ঘাড়ে কষে তিনটে থাপ্পড় মারবি।'

গণশা অর্থাৎ গণেশ চলে গেল। ভন্টে যে দোলগোবিন্দর ছেলে, আগেই জানা গেছে। যেভাবে পরম সমাদরে তাকে নিয়ে আসার কথা বলা হল তাতে কেমন যেন একটা অশান্তি হচ্ছে।

দোলগোবিন্দর সেই চড়া মেজাজটা আর নেই। হাসি হাসি মুখ করে বললেন, 'এটা নিন মাস্টারমশাই।—' তাঁর হাতে একটা ব্রাউন রংয়ের পুরু খাম। সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

আমি অবাক, 'কী আছে এর ভেতর?'

'আপনার একমাসের মাইনে।'

'আমি তো এখনও পড়াতেই শুরু করিনি। না না, দয়া করে ওটা দেবেন না। মাস কাবার হলে—'

আমাকে শেষ করতে দিলেন না দোলগোবিন্দ, 'ধরুন তো, ধরুন। মাস যখন কাবার হবার তখন হবে। এমনটাও হতে পারে, পাঁচ—সাত দিন পড়িয়ে আর এলেনই না। তখন সারা জন্মের জন্যে ঋণ থেকে যাবে। গুরুকে দক্ষিণে না দেওয়াটা মহাপাপ।' বলে নিজেই আমার বুক পকেটে খামটা গুঁজে দিলেন।

বাধা দিতে যাচ্ছিলাম, পারা গেল না। গণেশ এর মধ্যে ফিরে এল। তার সঙ্গে বৃহৎ সাইজের একটি গোরিলা। গোরিলা ছাড়া আর কোনও লাগসই উপমা মাথায় এল না। বয়স ষোলো—সতেরো। পরনের হাফপ্যান্ট আর টাইট গেঞ্জি ফাটিয়ে তার মাসল যেন বেরিয়ে আসবে। গামা পালোয়ান বা জো লুই হতে এই ছোকরার যে খুব বেশিদিন লাগবে না, দিব্যদৃষ্টিতে তা এখনই দেখতে পাচ্ছি।

ইনি কে হতে পারেন সেটা কি আর বুঝতে পারিনি। তবু দোলগোবিন্দ পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'মাস্টারমশাই, এই আমার ছেলে ভন্টে, আপনার ছাত্তর। আর ভন্টে, ইনি তোর নতুন মাস্টারমশাই, গড় কর—।'

শ্রীমান ভন্টে যে আনন্দে গলে গিয়ে নাচতে নাচতে এখানে আসেনি, তার বেজায় বিরক্ত মুখচোখ দেখে টের পাওয়া যাচ্ছে। চেহারা টেহারা, ভাবগতিক দেখে রীতিমতো দমেই গেলাম।

ভন্টে ঝুঁকে আমার পায়ের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু পায়ের পাতার চামড়া জ্বালা করছে কেন? চিমটি কাটল নাকি? হঠাৎ কেমন একটা জেদ চেপে গেল, বেয়াড়া ছোকরাটাকে টিট করতেই হবে।

দোলগোবিন্দ বললেন, 'মাস্টারমশাই, একটা কথা বলতে ভুলে গেচি। ভন্টে কিন্তু এই নিয়ে দু'বচ্ছর কেলাস সেভেনে শেকড় গজিয়ে পড়ে আচে। হেডমাস্টার অনুকূলবাবু বলেছেন, এবার যদি ফেল করে ইস্কুল থেকে লাথি মেরে বের করে দেবেন। এখন সবে গরমের ছুটি পড়েছে, হাতে অনেকটা সময় আচে। সেই পুজোর ছুটিরও মাস দেড়—দুই বাদে শেষ পরীক্ষে। এমনভাবে তৈরি করে দিন, যাতে এইটে উঠতে পারে। আপনার ওপর খুব ভরসা করে থাকব। আমাদের বাড়িটা খুব কাচেই। পাশের গলিতে।...গণশা, তুই এঁদের পড়ার ঘরে পৌঁছে দিয়ে আয়। বাড়িতে বলবি ভন্টের ওপর যেন চোখ রাখে। ঝঞ্ঝাট টঞ্ঝাট বাধালে তক্ষুনি দোকানে খবর পাঠায়।—'

এতক্ষণ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ঠান্ডা, হিংস্র চোখে আমাকে দেখছিল ভন্টে। এবার মুখ খুলল, 'আমি আজ পড়ব না।'

দোলগোবিন্দ হুঙ্কার ছাড়লেন, 'হারামজাদা! তুই পড়বি না কী রে, তোর বাপ পড়বে। যা—'

গণেশ আমাদের একটা সেকেলে দোতলা বাড়ির নীচের তলায় পড়ার ঘরে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'মাস্টারমশাই, আপনি পড়ানো শুরু করুন। বউদিদির সঙ্গে দেখা করে তাড়াতাড়ি দোকানে ফিরতে হবে।' সে চলে গেল।

বউদিদি যে দোলগোবিন্দ সামন্তর স্ত্রী, বোঝা গেল।

পড়ার ঘরে চেয়ার—টেবিল পাতা। বইটই রাখার জন্য একটা ছোট আলমারিও রয়েছে।

আমি একটা চেয়ারে বসলাম। ভন্টে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে। বললাম, 'তোমার বই—টই সব নিয়ে এসো—।'

ঘোর অনিচ্ছায় আলমারি থেকে এক গাদা বই আর খাতা বের করে এনে টেবিলের ওপর রেখে ভন্টে আমার মুখোমুখি বসল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের সেভেনের সিলেবাসে কী—কী আছে?'

ভন্টে জানিয়ে দিল।

'কোন সাবজেক্টের কী কী পড়ানো হয়েছে?'

'জানি না।'

চমকে উঠি, 'তুমি স্কুলে যাও না?'

ভন্টে বলল, 'যাব না কেন? লাস্ট বেঞ্চিতে বসে খগেন, বাসব আর শচীনের সঙ্গে গল্প করি। মাস্টাররা কী বকর বকর করে, কে শুনচে—'

এমন একটি উৎকৃষ্ট ছাত্র জুটবে, কে জানত! বললাম, 'স্কুলে যা পড়ানো হয়েছে, তুমি তো বলতে পারছ না। গোড়া থেকে শুরু করে আমি সিলেবাসটা শেষ করে দেব। তুমি শুধু আমাকে একটু হেল্প করবে।'

কপাল কুঁচকে গেল ভন্টের, 'কীসের হেল্প?'

'আমি যেমন—যেমন বলব সেইমতো পড়বে। হোম টাস্ক করে রাখবে। ফাইনাল পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে দেখবে তর তর করে এইটে উঠে গেছ। আজ বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস দিয়েই শুরু করা যাক। পাটিগণিতের বইটা দাও।'

চিরতা গেলার মতো মুখ করে ভন্টে বলল, 'ওইসব সিঁড়িভাঙা অঙ্ক, লাভক্ষতি, বাঁদরের খুঁটি বেয়ে ওঠা আমার মাথায় ঢোকে না—'

'তা হলে জ্যামিতিই হোক।—'

'আরও খারাপ।—'

'তবে কি অ্যালজেব্রা? ওটা কিন্তু খুব সহজ।'

কী ভেবে কে পি বোসের অ্যালজেব্রা বইটা এগিয়ে দিল ভন্টে। সেটা থেকে এ প্লাস বি স্কোয়ার গোছের দু'চারটে অঙ্ক কষিয়ে শুভারম্ভটা হল।

অ্যালজেব্রার পর বাংলা। রবীন্দ্রনাথের "দুর্ভাগা দেশ'টা বুঝিয়ে টুঝিয়ে দিলাম।

বাংলার পর ইতিহাস। সিলেবাসে সম্রাট আকবর আছেন। বইটা খুলে পড়ে পড়ে তাঁর রাজত্বকালে দেশের অবস্থা, তাঁর সুশাসন ইত্যাদি সম্বন্ধে বলে গেলাম।

আকবরের চ্যাপ্টারটা শেষ হলে বললাম, 'এবার হোম টাস্ক। অ্যালজেব্রার মাত্র পাঁচ—ছ'টা অঙ্ক কষিয়েছি। ওইরকম আরও কয়েকটা অঙ্ক আছে, সেগুলো করে রাখবে। "দুর্ভাগা দেশ"—এর সারাংশ আর শেষ চার লাইনের ব্যাখ্যা লিখবে। একটা রচনাও লিখতে হবে। তুমি কলকাতার বাইরে কোথায়ও বেড়াতে গেছ?'

বিশেষ সাড়াশব্দ করছিল না ভন্টে। মৌনীবাবাদের মতো চুপচাপ বসে বসে আমার আগাপাশতলা দেখে যাচ্ছে। বলল, 'বাবা কোত্থাও নিয়ে যায় নাকি? "জয়হরি স্টোর" নিয়েই তো দিন রাত পড়ে থাকে। শুধু তিন—চারবার কাটোয়ায় মামাবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল।'

'কাটোয়াই চলবে। শহরটার পাশ দিয়ে দু' দুটো নদী চলে গেছে—গঙ্গা আর অজয়। রচনায় এই দুই নদী, সেখানকার মানুষজন, পাখি, গাছপালা—যা যা দেখেছ, সব গুছিয়ে লিখে ফেলবে।'

প্রায় ঘণ্টাদুয়েক শ্রীমান ভন্টের সঙ্গে কাটিয়ে দিলাম। আমার একটু—আধটু ভয়—টয় যে ছিল না তা নয়। তবে ভন্টে এখন পর্যন্ত কোনও ঝামেলা টামেলা পাকায়নি। বেশ শান্তশিষ্ট হয়েই আছে। শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীগৌরাঙ্গর প্রসাদের জোর আছে। যাই হোক, সবসময় মনে হচ্ছে, বেশ কয়েকজন আড়ালে থেকে আমাদের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে। চালানোরই তো কথা। দোলগোবিন্দ গণেশকে দিয়ে তেমনটাই করতে বলে দিয়েছেন। নজরদারদের না দেখলেও মাঝে মাঝে তাদের ফিসফিসানি কানে এসেছে।

ভন্টের দিকে তাকালাম, 'যা—যা বললাম সব মন দিয়ে করবে। আজ আমি যাচ্ছি। কাল সকাল ন'টায় আসব, একটা পর্যন্ত থাকব।'

ভন্টের মুখচোখের চেহারাই পালটে গেল। কেমন যেন বুনো, হিংস্র। কিন্তু খুব ঠান্ডা গলায় বলল, 'কাল আপনি আসবেন না মাস্টারমশাই—'

'কেন?'

'কাল মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গলের খেলা আছে। ভোরবেলা গিয়ে টিকিটের জন্যে লাইন দিতে হবে। সন্ধেবেলায় ফিরে "বিজলি"তে সিনেমা দেখব। "কালোছায়া", ডিটেকটিভ গল্প —।'

বলে কী ছোকরা! জানি আমার বুকের মাপ সাড়ে সাতাশ ইঞ্চি, হাত—পা ফড়িংয়ের মতো কাঠি কাঠি, ওজন মেরেকেটে চল্লিশ কি একচল্লিশ সের। কিন্তু পদ্মাপারের বাঙালদের মাথায় মাঝে মাঝে গোঁ চাপে। আমারও চাপল। ঠিক করে ফেললাম, হাড়—বজ্জাত ছোকরাটাকে বাগে আনবই।

গুরুগম্ভীর গলায় বললাম, 'ডিসেম্বর মাসে ফাইনাল পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত খেলা, সিনেমা, বাঁদরামো, সব বন্ধ। কাল ন'টায় এসে যেন দেখি তুমি এখানে বসে আছ। পড়া, হোমটাস্ক, সব করে রাখবে।'

তেরিয়া হয়ে ভন্টে বলল, 'আপনাকে কাল আসতে বারণ করেছি। আসবেন না।—'

গলার স্বর অনেকটা উঁচুতে তুললাম, 'আসব।'

'মাস্টারমশাই, আপনার আগে বাবা তেরোজন মাস্টার রেখেছিল। তারা কেউ দু'দিনের বেশি টেকেনি। স্রেফ ভাগলবা। এরা সব্বাই পড়া—পড়া করে পাগল বানিয়ে দিচ্ছিল। আপনিও তাই করছেন কিন্তু। কী হবে জানেন?'

দোলগোবিন্দ সামন্ত কেন টিকে থাকার কথা বলেছিলেন, এতক্ষণে বুঝতে পারছি। ছোকরা আমাকে শাসাচ্ছে। মাথায় টগবগ করে রক্ত ফুটছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললাম, 'অসভ্য, বজ্জাত, পাজির পা ঝাড়া একটি চড়ে—'

বাকিটা শেষ হবার আগেই লাফ দিয়ে উঠে পড়েছে ভন্টে, 'চড় মারবে, ধুর শালা—'

আমার নাকের ওপর গদাম করে পেল্লায় হাতুড়ির ঘা এসে পড়ল যেন। আসলে ভন্টে ঘুসি চালিয়েছে। আমার গলা থেকে 'আঁক' করে একটা আওয়াজ বেরুল। আমি চেয়ার থেকে ছিটকে মেঝেতে চিতপাত হয়ে পড়লাম। বাইরে প্রচণ্ড চেচামেচি, 'ওরে, ভন্টে মাস্টারকে খুন করে ফেললে রে, শিগগির দোকানে গিয়ে খবর দে।' টের পেলাম নাকের

ফুটো দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। এরপর চারপাশ ঝাপসা হতে হতে অন্ধকার হয়ে গেল।

জ্ঞান ফেরার পর দেখলাম আমি হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। নাকটা ফুলে টেনিস বল, তার ওপর ব্যান্ডেজ।

বেডটা ঘিরে সুধাকরবাবু, আমার বাবা, মা, দোলগোবিন্দ সামন্ত, ডাক্তার, নার্স দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। আমাকে চোখ মেলতে দেখে দোলগোবিন্দ হাতজোড় করে বললেন, 'আমার জন্যে আপনার এত বড় ক্ষেতি হয়ে গেল। ক্ষমা করে দিন। ভন্টে পালিয়েছে। কিন্তু কোথায় যাবে? হাতে যখন পাব, গা থেকে চামড়া তুলে ফেলব। আর হ্যাঁ, আপনার সব চিক্কিচ্ছের ভার আমার।'

তিন দিন হাসপাতালে কাটিয়ে বাড়ি ফিরলাম। নাকটা আগের চেহারায় ফিরতে মাসখানেক সময় লাগল। দোলগোবিন্দ সামন্তের বাড়িতে আমার প্রথম এবং শেষ টুইশনি। ভন্টে আমার প্রথম এবং শেষ ছাত্র।

ভবানীপুরে আমরা খুব বেশিদিন থাকিনি। দক্ষিণ কলকাতার অন্য এলাকায় চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রথম টুইশনির স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে দোলগোবিন্দর দেওয়া পঁয়তিরিশটা টাকা অনেক দিন আমার কাছে ছিল।

—

ক্রিস্টিনা ডি' সিলভার গল্প

প্রায় আটান্ন বছর হয়ে গেল। আমি তখন বম্বেতে। সেই সময় বম্বে মুম্বই হয়নি। সেখানকার বর্ষা যে কী বিষম বস্তু আরব সাগরের পাড়ের ওই শহরটায় না গেলে মালুম হতো না।

অনেকেই হয়তো জানে ক্লাসিক্যাল মিউজিক মানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ওস্তাদ গাইয়েরা একবার গাইতে শুরু করলে গানের ঘেঁটি ধরে সন্ধে থেকে মাঝরাত পার করে ভোর না হওয়া অবধি ছাড়াছাড়ি নেই। ওস্তাদ কালোয়াতরা তবু রাত কাবার করে থেমে যায়। কিন্তু বম্বের বর্ষা আজ শুরু হলে কবে থামবে, কেউ জানে না। দিন নেই রাত নেই ঝম ঝম বৃষ্টি চলছেই। হয়তো পাঁচদিন কি গোটা সপ্তাহ পর বর্ষার এই একটানা ধ্রুপদ ধামার থামল। কিন্তু রেহাই নেই। দু'তিনদিন ইন্টারভ্যালের পর কোমর বেঁধে শুরু হয়ে গেল।

যারা এই গল্পটা পড়তে বসেছে, তাদের কপাল নিশ্চয়ই এর মধ্যে কুঁচকে গেছে। হয়তো ভাবছে, পড়ব তো একটা গল্প, তা বর্ষা নিয়ে এত ভ্যানর ভ্যানর কেন হে বাপু। সাতকাহনটা যে ফাঁদতে হল তার কারণ এই বর্ষাটা না হলে গল্পটাই যে হয় না।

বর্ষা ছাড়া আরও একজন আছেন। তিনি শ্রীমতী ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা। গোয়ার খ্রিস্টান। গোয়ার পানাজি থেকে কোন ছেলেবেলায় মহারাষ্ট্রের রাজধানী বম্বেতে চলে এসেছিলেন। তারপর থেকে এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা। একে দেখলে যাঁর ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তিনি হলেন স্বয়ং আমাদের রণচণ্ডী। না না, চেহারায় নয়, মেজাজে। প্রায় তেমনই ভয়ঙ্করী।

বর্ষা আর ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা এই গল্পের আসল নায়ক নায়িকা। এরা ছাড়া আমরা কয়েকজন পাঁচ ফোড়নের মতো এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি।

এবার আমার সম্বন্ধে দু'চার কথা না জানালেই নয়। কেননা আমাকে বাদ দিলে গল্পটা বলবে কে?

আমি হলাম পদ্মাপাড়ের আকাট বাঙাল। অল্প বয়স থেকেই আমার দু'পায়ে চাকা লাগানো। দু'চার দিন হয়তো শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের মতো চুপচাপ বাড়িতে বসে রইলাম। তারপরেই মাথায় পোকা নড়ে উঠল। আমিও বেরিয়ে পড়লাম। এইভাবেই সারা দেশটা চষে বেড়াতাম।

সেবার হাতে ঠাকুরদার আমলের সাত পুরোনো একটা স্যুটকেস ঝুলিয়ে আর কাঁধে শতরঞ্জি দিয়ে জড়ানো বিছানা ফেলে, ঘুরতে ঘুরতে বম্বেতে এসে হাজির হলাম।

বিশাল চোখধাঁধানো শহর। পকেটে রেস্ত বলতে হাজার দেড়েকের মতো টাকা। বম্বের মতো শহরে তা আর কতটুকু। আমাকে মেপে মেপে, টিপে টিপে খরচ করতে হবে। নইলে ওই মূলধন দু—চারদিনেই ফুড়ুত।

ঘুরে ঘুরে খুব সস্তাগণ্ডার কয়েকটা সেকেলে গুজরাটি শাকাহারী হোটেলে নোঙর ফেলে, নোঙর তুলে দেখা গেল পকেটের হাল খুবই খারাপ হয়ে এসেছে। দেড় হাজার কমে ছ—সাতশোয় দাঁড়িয়েছে।

এই মহা দুঃসময়ে একটি বন্ধু জুটে গেল। তার নাম পরমেশ্বরণ।

মাদ্রাজের (তখনও চেন্নাই হয়নি) তামিল। আমার অনেক আগে মাঝারি একটা থলে বোঝাই করে টাকাপয়সা নিয়ে বম্বেতে এসেছিল।

দেশের পশ্চিম দিকের এই মহানগরটির আগাপাশতলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখব বলে আমি বম্বেতে এসেছি। এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু তামিল ব্রাহ্মণ সন্তান তার বাবার তোরঙ্গ ভেঙে ভেতরে যা ছিল সাফ করে একটা বিরাট স্বপ্ন ঘাড়ে চাপিয়ে মাদ্রাজ থেকে বম্বেতে পাড়ি দিয়েছিল। স্বপ্নটা কী? সেটা ধীরে ধীরে জেনেছি। তার একমাত্র লক্ষ্য বা পাখির চোখ হল রাজ কাপুর, শাম্মী কাপুর, ধর্মেন্দ্র বা রাজেশ খান্নার মতো সুপারস্টার হওয়া। কিন্তু কয়েক মাস ফিল্ম কোম্পানির স্টুডিয়োগুলোতে সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা অবধি ধরণা দিয়ে দিয়েও তেমন জুত যে করতে পারেনি, তা মুখ ফুটে বলেনি। কিন্তু আমার তো চক্ষু কর্ণ নাসিকা আছে। ঠিক আঁচ করতে পেরেছি। এদিকে মাদ্রাজ থেকে টাকা বোঝাই যে থলেটা নিয়ে বম্বেতে এসেছিল সেটা চুপসে এতটুকু হয়ে গেছে। কিন্তু স্বপ্নটাকে হাত ছাড়া করতে সে আদৌ রাজি নয়। রাজ কাপুর ধর্মেন্দ্র রাজেশ খান্নারা তার ঘাড়ের ওপর ঠেসে বসে আছে।

মাদ্রাজ থেকে এসে গোড়ার দিকে সে বেশ দামি দামি হোটেলে কাটিয়েছে। তারপর সস্তা শাকাহারী হোটেলে।

একদিন পরমেশ্বরণ বলল, 'দ্যাখ ইয়ার, বম্বেতে টিকে থাকতে হলে কুছ কুছ কামাই করতে হবে। আমি একটা ফ্যাক্টরিতে পার্ট টাইম কাজ জুটিয়ে নিয়েছি। বিকেল চারটে থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত ডিউটি। তুইও একটা কিছু জুটিয়ে নে। কামাই না হলে বম্বেতে টিকে থাকা যাবে না।'

ঠিকই বলেছে পরমেশ্বরণ। আমার পকেটের যা হাল, কিছু না জোটালেই নয়।

পরমেশ্বরণ আরও বলল, 'দ্যাখ ইয়ার, আর হোটেল টোটেল নয়, আমি একটা আস্তানার খোঁজ পেয়েছি। এই গুজরাটি হোটেলে থাকা আর খাওয়ার জন্যে আমাদের যা খরচ হয় তার হাফ খরচে সেখানে থাকা যাবে।'

আমি চনমনে হয়ে উঠি, আস্তানাটা কোথায় রে, কোথায়?'

'খার—এ। সমুন্দরের কাছে ক্রিস্টিনা ডি সিলভার একঠো ব্যারাক টাইপের বিল্ডিং আছে। লোকে বলে 'চওল'। সেখানে পিদ্রুরাই (গোয়ার খ্রিস্টান) বেশি থাকে। মাসে একটা কামরায় ভাড়া পঞ্চাশ রুপিয়া। তুই আর আমি থাকব। ভাড়া আধা আধা। টোয়েন্টি ফাইভ, টোয়েন্টি ফাইভ। ইলেকট্রিসিটির বিল বেশি না। তোর হাফ, আমার হাফ। নজদিগ সর্দারজিদের ধাবা আর উদিপিদের ছোটা ছোটা হোটেল আছে। ছে—আনায় ব্রেকফাস্ট, বারো আনায় লাঞ্চ, আট আনায় ডিনার। বম্বেতে এর চেয়ে সস্তায় আর কোথায় থাকা যাবে?' আমার দিকে তাকিয়ে সে ভুরু নাচাতে লাগল।

আমি প্রায় লাফিয়ে উঠলাম,—'কবে সেখানে শিফট করতে চাস?'

'কবে আবার। আজই—এক্ষুণি। স্যুটকেশ আর বিস্তারা গুছিয়ে নে—।

দশ মিনিটের ভেতর স্যুটকেস টুটকেস ঘাড়ে চাপিয়ে এক তামিল আর এক বঙ্গসন্তান বড় রাস্তায় গিয়ে বি ই এস টি'র লাল রঙের ঝকঝকে বাস—এ উঠে পড়লাম। আধ ঘণ্টাও লাগল না, বাসটা খার—এর সমুদ্রতীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এদিকে রাস্তার হাল বেজায় খারাপ। চারিদিকে খানাখন্দ, কোথাও কোথাও বিরাট বিরাট গর্ত। কয়েকটা গর্তের চেহারা দেখলে ভিরমি খেতে হয়। একবার পা ফসকে পড়লে সোজা পাতালে।

বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কর্মীরা শহরের এই এলাকাটা এলোপাতাড়ি খুঁড়ে টুঁড়ে খুব সম্ভব গুপ্তধন খুঁজে চলেছে।

খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে আমরা শ্রীমতী ক্রিস্টিনা ডি'সিলভার চওল—এর সামনে চলে এলাম। গেট খোলা ছিল। ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, মাঝারি ধরনের ফাঁকা একটা চত্বর। তার ওধারে আদ্যিকালের লম্বা ব্যারাকের মতো দোতলা বিল্ডিং, মাথায় টালির চাল। বাড়িটার বয়স কম করে সত্তর আশি বছর তো হবেই। দেওয়ালের পলেস্তারা অনেক জায়গায় খসে গিয়ে ইট বেরিয়ে পড়েছে। জং ধরে রেন—ওয়াটার পাইপগুলো ঝুরঝুরে। ছাদের টালিগুলোর বেশির ভাগই ভাঙা। পুরো চওলটা কিন্তু বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা।

বম্বে শহরের অন্য সব চওল—এর মতোই এই চওলটারও একতলা এবং দোতলায় লাইন দিয়ে পর পর ঘর। আট দশটা কামরার পর খানিকটা গ্যাপ। সেখানে দোতলায় ওঠার সিড়ি। একটা কি দুটো করে ঘর নিয়ে এককেটা ভাড়াটে ফ্যামিলি।

সামনের খোলা চত্বরের একধারে সারি—সারি কয়েকটা জলের কল। অন্য দিকে সাত —আটটা পায়খানা। তা ছাড়া বাউন্ডারি ওয়াল ঘেষে বিরাট চাকার মতো টায়ার লাগানো দুটো ঠেলা গাড়ি।

সময়টা ভর দুপুর। লোকজন তেমন একটা চোখে পড়ছে না। খুব সম্ভব পুরুষ ভাড়াটেরা যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে। এধারে ওধারে কিছু মাঝবয়সি মহিলা আর বাচ্চা কাচ্চা ছাড়া আর কেউ নেই। তাদের চেহারা এবং লম্বা ঝুলের স্কার্ট আর শার্ট দেখে বোঝা যায় এরা পিদ্রু। দূর থেকে ওরা আমাদের লক্ষ করছে।

পরমেশ্বরণ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তার দেখাদেখি আমিও। সে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে। কেমন একটা অস্থির অস্থির ভাব।

এখানে আসার আগেই ঘর ভাড়ার অর্ধেক টাকা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে পরমেশ্বরণ। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানেই থেমে গেলি যে? আমাদের ঘরে চল।'

পরমেশ্বরণ জবাব দিল না। চওল—এর এ—মাথা থেকে ও—মাথায় তার চোখ দুটো চরকির মতো ঘুরেই চলেছে।

ওর রকম—সকম দেখে খটকা লাগছিল। ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, 'এখানেই স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি। আমাদের কামরাটা কোথায়?'

এতক্ষণে আমার দিকে ঘাড় ফেরাল পরমেশ্বরণ, বারকয়েক ঢোঁক গিলে মিয়ানো গলায় বলল, 'কামরা কামরা মাত করনা।'

আমি অবাক। বলছে কী আমার সঙ্গীটি! নিজের অজান্তেই গলা দিয়ে ফস করে বেরিয়ে এল, 'মতলব?'

'কামরা থোড়াই ভাড়া হয়েছে।'

এবার আমার গলা থেকে তোড়ে কিছু উৎকৃষ্ট গালাগাল ঠিকরে ঠিকরে বেরুতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই দুনিয়া—কাঁপানো বাজখাঁই আওয়াজ কানে এল, 'কৌন হো

রে?’

এমন কণ্ঠস্বর কোনও মানুষের হতে পারে বলে মনে হল না। এই বিকট শব্দের সোর্স যে চণ্ডল—এর দোতলায় তা আন্দাজ করে দুজনে সেদিকে তাকালাম। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ক্ষমতা যার, এবার তার দর্শন মিলল। রামায়ণ মহাভারতে যে অতিমানবীদের পাওয়া যায় ইনি খুব সম্ভব তাদের বংশধর। দু'মণ ওজনের গোলাকার একটা মাংসপিণ্ড দোতলার রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে আছে। বিপুল ধড়ের ওপর বিশাল মাথাটি ঠেসে বসানো। তার মাথায় টুপি, গায়ে ফুল প্যান্ট আর শার্ট। সে বলল, ‘এখানে কী চাস? কার হুকুমে চণ্ডল’—এর ভেতরে ঢুকেছিস?’

গলার স্বর আগের মতো ততটা তীব্র নয়। বুকের ধড়ফড়ানি কিঞ্চিৎ কমে এল। তবু ভয়ে ভয়ে পরমেশ্বরণ বলল, ‘শুনা হ্যায়—’

তাকে থামিয়ে দিয়ে শ্রীমতী রণচণ্ডী গলার স্বর আরেক পর্দা নামাল, হিঁয়াপে হিঁয়াপে, উপ্পর আ যা। দোমাল্লা দোমাল্লা। বীচবালা স্টেয়ারকেস। আ—আ—’

মাঝখানের সিঁড়ি দিয়ে আমাদের দোতলায় যেতে বলছে।

কেন দোতলায় যেতে বলা হচ্ছে? মতলবটা কী? দোনোমনো করে উঠেই পড়লাম। দেখাই যাক কী হয়।

দোতলাতেও সারি সারি কামরা। একটা কামরার মাথায় ইংরেজিতে বড় বড় হরফে লেখা—অফিস। রণচণ্ডী আমাদের ঘরে নিয়ে গেল।

মস্ত একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, আলমারি টালমারি দিয়ে অফিস ঘরটা সাজানো। টেবিলটার ওপর প্রচুর ফাইল, টেলিফোন। এক ধারে কাঠের তিনকোণা ফলকে লেখা —'ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা। নামের নিচে প্রোপ্রাইটর। শ্রীমতী রণচণ্ডীর নাম এবং সে যে এই ‘চণ্ডল’—এর মালকিন তখনই আমরা ভালো করে জানতে পারি।

টেবিলটার একধারে গদি—আঁটা, হাতল—লাগানো যে চেয়ারটায় ঠেসেঠুসে সে বসল। সেটার মাপ অন্য সব চেয়ারের ডাবল তো বটেই, বেশিও হতে পারে। নিশ্চয়ই অর্ডার দিয়ে এই ভেরি ভেরি স্পেশ্যাল কুরসিটি বানানো হয়েছে।

নিজের চেয়ারে গদিয়ান হয়ে ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা তার উলটো দিকের ক'টা কাঠের চেয়ারের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল, ‘বৈঠ যা, বৈঠ যা—’

কাঁধ থেকে লটবহর নামিয়ে বেশ ভয়ে ভয়েই বসে পড়লাম।

ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা জিজ্ঞেস করল, ‘ঘাড়ে স্যুটকেস ফুটকেস চাপিয়ে আমার চণ্ডল—এ ঢুকেছিস কেন? মতলবটা কী? বল—বল—বলে ফেল—’

এ প্রশ্নটা এবার নিয়ে খুব সম্ভব দ্বিতীয়বার। আমাদের দু'জনেরই জিভ টিভ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। পরমেশ্বরণ তার শুকনো জিভটা বের করে বার কয়েক ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বলল, ‘আন্টিজি।’

তার কথা শেষ হবার আগেই ক্রিস্টিনা ডি' সিলভার গলায় সেই বাজখাঁই আওয়াজটি ফিরে এল। পিলে—চমকানো একটা ধমক দিয়ে বলল, ‘আন্টিজি বলবি না। বল ম্যাম। বম্বের হর আদমি আমাকে ম্যাম বলে। মনে থাকবে?’

‘হাঁ, আন্টিজি।’

এবার দু'নম্বর ধমক। এবং সেটা আরও জোরদার। ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা আঙুল নাড়তে নাড়তে বলল, 'ফের আন্টিজি। উল্লু কাঁহাকা।'

হাতজোড় করে বেজায় কাঁচুমাচু হয়ে পরমেশ্বরণ বলল, 'কসুর হয়ে গেছে। আর হবে না আন্টি—না, না ম্যামজি—'

আমি তো জানি পরমেশ্বরণ একটি মিচকে শয়তান। আন্টি বলে মুহূর্তে সামলে নিয়ে কুঁকড়ে যাবার ভঙ্গিতে সে যে ভুল শুধরে 'ম্যামজি' বলল সেটা তার বজ্জাতি। হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু ঠোঁট টিপে বসে রইলাম। বুঝতে পারছি, প্রথম দিকে রণচণ্ডীর বিশাল বপু আর হুঙ্কার শুনে পরমেশ্বরণ যতটা ভয় পেয়েছিল, তার অনেকটাই কেটে গেছে। এখন রণচণ্ডীকে সে একটু নাচাতে চাইছে।

ওদিকে শ্রীমতী রণচণ্ডী চোখ সরু করে পরমেশ্বরণের 'ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না' গোছের সরল, নিষ্পাপ মুখটি কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে বলল, 'তুই বহুত বদমাশ।'

তার বজ্জাতি যে ধরা পড়ে যাবে, ভাবতে পারেনি পরমেশ্বরণ। মাথা নীচু করে সে বসে রইল।

ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা চোখ সরায়নি। বলল, 'এবার বল কী চাস।'

মিন মিন করে পরমেশ্বরণ বলল, 'ম্যামজি, আপনার চওল—এ ভাড়ায় একটা কামরা নিয়ে আমরা থাকতে চাই।'

'উল্লু কা পাঠ্‌ঠে, তোকে তো এই মহল্লায় আগে কখনও দেখিনি। আমার "চওল"—এ কামরা ভাড়া পাওয়া যায়, জানলি কী করে?'

'ম্যামজি, আপনার চওল'—এর নাম দুনিয়ার হর আদমি জানে। তাদের মুখে শুনে আমার এই দোস্তকে নিয়ে এসেছি। আমরা দুজনে যেখানে যাই একসাথ থাকি। মওত তক, একসাথই রহেঙ্গে।'

মাত্র দিন পনেরো হল এক গুজরাটি হোটেলে এই সাউথ ইণ্ডিয়ানটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এর মধ্যেই আমি নাকি তার এমন জিগরি দোস্ত হয়ে গেছি যে শেষ নিঃশ্বাস না ফেলা অবধি বাকি জীবন একসঙ্গে কাটাবে। ভারি মজা লাগছিল। আড়চোখে তাকে দেখতে লাগলাম।

ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা পরমেশ্বরণের দিকে তাকিয়ে আছে। বলল, 'দোনো মিলকে বহুৎ বঢ়িয়া জোড়ি!'

দেবশিশুর মতো মুখ করে বসে রইল পরমেশ্বরণ।

ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা এবার জিজ্ঞেস করল, 'তোদের দেখে তো মারাঠি, গুজরাটি, সিন্ধি, পার্সি, পিদ্রু—কিছুই মনে হচ্ছে না। কোন কোন মুল্লুক থেকে তোরা বম্বেতে এসে জুটেছিস?'

আমি বললাম, 'কলকাতা'। পরমেশ্বরণ বলল, 'মাদ্রাজ'।

'মতলব তুই কলকাত্তাবালা বেঙ্গলি আর তুই মাদ্রাজবালা তামিল। ইস্ট আর সাউথ। ঠিক বলছি?'

আমরা জানিয়ে দিলাম, শতকরা একশো ভাগ ঠিক।

'গুড। নাম বাতা—'

নাম বললাম।

‘তোরা তো আমার ”চওল”—এ থাকতে চাস। রুমের রেন্ট তো দিতে হবে। কামাই হয় কীভাবে? চোরি, ওরি, হিঁয়াকা মাল উঁহা, উঁহাকা মাল ইহাঁ—অ্যায়সা কুছ?’

আমরা আঁতকে উঠি, ‘না না, আমরা ভদ্র বংশের ছেলে। শিক্ষাদীক্ষা আছে। চুরি টুরির মতো নোংরা কাজ করব কেন?’

‘বহুৎ আচ্ছা। চোরি করিস না, তা হলে করিসটা কী? চারবেলা খেতে পয়সা লাগে, জামা কাপড় কিনতে হয়, বাসভাড়া, সাবার্বান ট্রেনের টিকিট কাটা, লন্ড্রিতে জামাকাপড় সাফাই, সেলুনে চুল কাটাই—কত রকমের খরচ। কী করে এসব জোটে?’

পরমেশ্বরণ বলল, ‘আমি একটা কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে কাজ করি।’

ডান হাতের বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুলটা সোজা আমার দিকে তাক করে শ্রীমতী রণচণ্ডী বলল, ‘আর তুই?’

সত্যের সঙ্গে মিথ্যের ভেজাল দিয়ে মুহুর্মুহু ঢোক গিলে বললাম, ‘খুব শিগগির আমার একটা কাজ হয়ে যাবে।’

‘যতদিন কাজটা না হচ্ছে, বাড়িভাড়া দিবি কী করে?’

‘আমার কাছে টাকা আছে। ফিকর মাত করনা ম্যামজি—।’

‘দ্যাখ, রুপাইয়া পাইসার ব্যাপারে আমি দুনিয়ার কারওকে বিশোয়াস করি না। পাইসা আমার মা—বাপ। যাদের পাকা নৌকরি বা বেওসা আছে তারা কামরা চাইলে এক মাহিনার রেন্ট অ্যাডভান্স নিই। তোদের কিন্তু তিন মাহিনার রেন্ট আগাম দিতে হবে। রাজি?’

আমরা দু’জনেই ঘাড় কাত করলাম—রাজি।

‘গুড। আমার আরও ক’টা কন্ডিশন আছে।’

‘বলুন।’

‘তোরা পান বিড়ি সিগারেট খাস?’

শ্রীমতী ক্রিস্টিনা ডি’সিলভার এই চওলটা রামায়ণ মহাভারতের সাধু—সন্ন্যাসীদের আশ্রম—টাশ্রম গোছের কিনা বোঝা যাচ্ছে না। হয়তো নেশা—টেশা এখানে নিষিদ্ধ। আমার কোনও রকম নেশাই নেই। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, ‘না’।

পরমেশ্বরণ ঘাবড়ে গেছে। সে দিনে কম করে তিরিশ চল্লিশটা সিগারেট ফোঁকে। বার কয়েক ঢোক গিলে সে বলল, ‘ম্যামজি, আমি দু’তিনটে সিগারেট খাই।’

ক্রিস্টিনা ডি’ সিলভা হুঙ্কার ছাড়লেন, ‘চলবে না। পোড়া বিড়ি সিগারেটের টুকরো ফেলে সামনের চত্বরটা নোংরা করা, পানের পিক ফেলে পেন্টিং করা—এসব আমি বিলকুল বরদাস্ত করি না। সমঝা?’

মাথাটা ডান দিকে হেলিয়ে হাত জোড় করল পরমেশ্বরণ, ‘সমঝ গিয়া। আজ থেকে দু’তিনটে সিগারেটও খাব না।’ তার ঠোঁটে মিচকে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

ক্রিস্টিনা ডি’সিলভা খুব সম্ভব হাসিটা লক্ষ করেনি। বলল, ‘ভেরি গুড। সিগারেট ফুঁকে লাংটা ঝাঁঝরা করার কী দরকার। উমর দশ বিশ সাল কমে যাবে। ব্রিদিং ট্রাবল নিয়ে

হাঁপাতে হাঁপাতে খতম হয়ে যাবি।—এবার তিন মাহিনার অ্যাডভান্স রেন্টটা বের কর। একটা কামরার হর মাহিনার রেন্ট কত জানিস।'

'জানি ম্যামজি, পঞ্চাশ রুপাইয়া।'

শ্রীমতী রণচণ্ডী অবাক, 'তাজ্জব কি বাত। তুই জানলি কী করে?'

'আগেই তো বলেছি, পুরা দুনিয়া আপনার "চওল"—এর খবর রাখে। তাদের কারও কাছ থেকে জেনেছি।'

চোখ গোলাকার করে ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা কয়েক লহমা তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'তোর মতো বিচ্ছু পুরা জিন্দেগিতে আর একটাও দেখিনি।' বলতে বলতে হেসে ফেলল।

এই ভয়ঙ্করী সারা জীবনে কখনও হেসেছে বলে মনে হয় না। তার মুখে হাসি ফোটানো সহজ ব্যাপার নয়। মাত্র আধ ঘণ্টা হল আমরা এই 'চওল'—এ এসেছি। এর মধ্যেই খুব সম্ভব পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন একটা কাজ করে ফেলল পরমেশ্বরণ। মনে মনে তাকে স্যালুট করলাম।

ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা বলল, 'তিন মাহিনার অ্যাডভান্সটা বের কর।'

আমি আগেই একমাসের জন্য পঁচিশ টাকা দিয়েছিলাম। আরও পঞ্চাশ বের করলাম। আমার ভাগের মোট পঁচাত্তর। পরমেশ্বরণ বের করল তার ভাগের পঁচাত্তর। পাঁচটা কড়কড়ে দশ টাকার নোট আর বাকিটা এক টাকা, আট আনা, চার আনার কয়েন 'চওল'—এর মালকিনের দিকে বাড়িয়ে দিল পরমেশ্বরণ।

টাকাপয়সা খুব মনোযোগ দিয়ে গুনে টেবিলের দেরাজে চালান করে রসিদ লিখে পরমেশ্বরণের হাতে দিয়ে ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা বলল, 'তিন মাস পেরুবার পর থেকে হর মাসের পাঁচ তারিখের ভেতর রেন্ট মিটিয়ে দিতে হবে।'

'দেব। ফিকর মাত কীজিয়ে।'

'এখন নীচে চল। আউর কুছু কুছ কন্ডিশন আছে। তোদের লাগেজ ঘাড়ে তোল।'

শ্রীমতী রণচণ্ডী এর মধ্যে দুটো চাবি বের করে হাতের মুঠোয় পুরে নিয়েছেন। আমরা স্যুটকেস ব্যাগ ট্যাগ তুলে নিলাম। সারি—সারি কামরার সামনে দিয়ে টানা বারান্দা চলে গেছে। নীচে নেমে একটা কামরার সামনে আমাদের নিয়ে এল ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা বলল, 'এটাতেই তোরা থাকবি।' কামরাটা তালাবন্ধ। তালা খুলে বলল, 'অন্দর আ।'

ভেতর ঢুকতেই চোখে পড়ল, কামরার দুই দেওয়ালে দুটো বড় বড় জানালা। মেঝেতে দেওয়াল ঘেঁষে দুটো তক্তপোষ। আর এক দেওয়ালের গায়ে একটা বুক—সমান হাইটের পুরনো, সেকেলে আলমারি। সিলিংয়ের মাঝখান থেকে একটা মোটা লোহার হুক নেমে এসেছে। সেটার দু'পাশে খানিকটা গ্যাপ দিয়ে দুটো লম্বা তারের নীচের দিকে আটকানো দুটো বাল্ব জ্বলছে।

আমরা মালপত্র নামিয়ে তক্তপোষের ওপর রেখেছিলাম। শ্রমতী রণচণ্ডী সিলিংয়ের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই দ্যাখ, বিজলির ব্যবস্থা আছে। দুটো বাল্বের জন্যে হর মাহিনা তিরিশ তিরিশ ষাট রুপিয়া। আর বম্বেতে তো বহুৎ গরম। ওই হুকটা থেকে তোদের ফ্যান ঝোলাতেই হবে। একটা ফ্যান কিনে ঝুলিয়ে নিস। না হলে টিকতে পারবি না। ফ্যান চালানোর জন্যে দিতে হবে চল্লিশ। ইলেকট্রিসিটির বিল হল থার্টি প্লাস থার্টি প্লাস ফোর্টি। মতলব পুরাপাক্কা ওয়ান হানড্রেড। হিসাব ঠিক হ্যায়?'

কামরা ভাড়া পঞ্চাশ, লাইট টাইটের বিল একশো। দু'জনে ভাগ করে দিলে মাথা পিছু পঁচাত্তর। এই টাকাতে বম্বের ফুটপাথেও থাকার জায়গা পাওয়া যাবে না। বলতেই হল, 'ঠিক হ্যায়।'

'রাজি?'

'বিলকুল।'

'এখন আমার সঙ্গে চত্বরে চল।' ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা আমাদের সামনের ফাঁকা জায়গাটায় নিয়ে এল। বলল, 'দ্যাখ, কেমন সাফ সুতরা। এক ভি পোড়া বিড়ি কি সিগারেটের টুকরা, ফালতু অন্য কোনও জিনিস টিনিস নেই।'

সত্যিই চত্বরটা পরিষ্কার। আবর্জনা টাবর্জনা কিচ্ছু নেই। ভাড়াটেদের শ্রীমতী রণচণ্ডী যে প্রবল দাপটে রাখে বোঝাই যাচ্ছে। তার সঙ্গে এক দিকের বাউন্ডারি ওয়ালের পাশে চলে এলাম। এখানে পর পর পাঁচটা জলের কল। আগেই আমরা তা দেখেছি। শ্রীমতী রণচণ্ডীর জন্য আরও একবার দর্শন করতে হল। সে বলল, 'বম্বে মিউনিশিপ্যাল কর্পোরেশন দিনে তিন দফে ওয়াটার সাপ্লাই করে। সুবে সাত বাজে একবার, দু'পহর বারো বাজে একবার, সামকো সাত বাজে ফির একবার। বম্বেতে পানি বহুৎ মাহেঙ্গা। এক বুঁদ ভি ওয়েস্ট মাত করনা। এই চওল—এ সিক্সটি ফ্যামিলি হ্যায়। তারা নিজেদের খানা উনা পাকায়। কমসে কম বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে দো'শো মানুষ। বহুৎ পানি দরকার। ও বাদে ফ্যামিলি নেই, তোদের মতো আরও চল্লিশ পঞ্চাশজন আছে। তারা খানা পাকায় না। বাইরে হোটেলে টোটেলে খায়। তোরা কি আপনা খানা পাকাবি?'

'না। আমরা একটু বেলা হলেই বেরিয়ে পড়ি। বাইরে হোটেল টোটেলে খেয়ে নিই। যেখানেই থাকি, ফিরতে ফিরতে সন্ধে পেরিয়ে যায়।'

'ফির ভি বহুৎ আচ্ছা। তোরা চওল'—এ থাকলে এটার জন্যে ওটার জন্যে পানি লাগবে। সারাদিন যখন থাকবিই না, সেই পানিটা বেঁচে যাবে। ওই যে ওদিকে দ্যাখ।' ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা কাছাকাছি কয়েকটা পুরোনো জংধরা টিনের চালার দিকে আঙুল বাড়াল, 'ওগুলো বাথরুম। সুবে সুবে উঠে ওখানে পানি নিয়ে গিয়ে চানটা সারবি। তোদের লাগেজের মধ্যে তো বালতি টালতি দেখলাম না।'

বললাম, 'আমাদের বালতি নেই।'

'আজই বালতি কিনে আনবি। কখন কী দরকার হয়, সব সময় কামরায় দো বালতি পানি মজুত রাখবি।'

পরামর্শটি খুবই মূল্যবান মনে হয়। বললাম, 'হ্যাঁ, ম্যামজি।'

'আউর দো কন্ডিশন।' সোজাসুজি অন্য দিকের বাউন্ডারি ওয়ালের গায়ে চটের পর্দা লাগানো পায়খানাগুলো দেখিয়ে শ্রীমতী রণচণ্ডী বলল, 'ওগুলো ইউস করে পানি দিয়ে সাফ করবি। গন্ধি হয়ে যেন না থাকে।'

আমরা রাজি।

'এবারে লাস্ট কন্ডিশন। রাত বারোটায় আমার চওল—এর গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। তারপর কেউ এলে ঢুকতে দেওয়া হয় না। মনে থাকবে?'

'থাকবে।'

‘যে কন্ডিশনগুলো বললাম, সবসময় মনে রাখবি। একটা কন্ডিশন যদি ভাঙিস ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে বের করে দেব। মনে থাকবে? কঠোর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল ক্রিস্টিনা ডি’সিলভা।

আমরা জানিয়ে দিলাম প্রতিটি শর্তই আমাদের সর্বক্ষণ মনে থাকবে। কোনওটাই অমান্য করা হবেনা।

‘ফাইন’। ক্রিস্টিনা ডি’সিলভা খুব সম্ভব আমাদের মতো ভাড়াটে পেয়ে অখুশি হয়নি। কামরার চাবি দুটো আমাদের হাতে দিয়ে দোতলায় উঠে গেল। আর আমরা তালা লাগিয়ে বালতি কিনতে বেরিয়ে পড়লাম।

আমরা—এক তামিল আর এক বঙ্গসন্তান ক্রিস্টিনা ডি’সিলভার খাসতালুকের প্রজা হয়ে গেলাম। এই চওল—এ এসেছি এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে। বম্বেতে তখন বেজায় গরম। যতদিন যাচ্ছে তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। এত গরমে টিকে থাকাই মুশকিল। নিজেদের পকেটের হাল তো জানি। ঝট করে নতুন একটা ফ্যান যে কিনে ফেলব, তা একেবারেই সম্ভব নয়। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল খার মার্কেটে একটা দোকানে পুরানো জিনিস টিনিস ভাড়া দেয়। সেখান থেকে মাসিক তিরিশ টাকা ভাড়ায় আদ্যিকালের চার ব্লেডের ফ্যান এনে ঘরের সিলিংয়ে লাগিয়ে দিলাম।

এখানে আসার দু’তিন দিনের মধ্যে জেনে গেলাম চওল—এ শুধু পিদ্রুরাই থাকে না, বাঙালি, বিহারি, ওড়িয়া, সাউথ ইন্ডিয়ান, নর্থ ইন্ডিয়ান—এসব অনেকেই থাকে। নেপালি, ভুটিয়া, টুটিয়াও বাদ নেই। সব মিলিয়ে মিনি ভারতবর্ষ।

আমাদের দিনগুলো এইভাবে কাটছে। সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় শুরু। আগের দিন দুটো বালতিতে যে জল ধরে রাখি তার সবটা খরচ করি না, কিছুটা বাঁচিয়ে রাখি। বালতিসুদ্ধ সেই জল নিয়ে প্রথমে চলে যাই পায়খানাগুলোর সামনে। ততক্ষণে সেখানে লম্বা লাইন পড়ে গেছে। চওল’—এ ষাটটা ফ্যামিলির দু—আড়াইশো মেম্বার ছাড়াও আমাদের মতো যাদের ফ্যামিলি নেই তাদের সংখ্যাটাও তো কম নয়। এদের অর্ধেক লাইন দেয় পায়খানাগুলোর সামনে, বাকি অর্ধেক জলের কলের দিকে। কে আগে তার কাজটি সারবে, তাই নিয়ে চলে ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, চিৎকার চেঁচামেচি। সব মিলিয়ে হুলস্থূল কাণ্ড। সুতরাং রঙ্গমঞ্চে ক্রিস্টিনা ডি’সিলভার আবির্ভাব। সাক্ষাৎ রণচণ্ডী হয়ে ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে সে চিৎকার করতে থাকে, ঝামেলা মাত করো। লাইনমে ঠিকসে খাড়া রহো। হল্লা মাত মচাও। যে ঝঞ্ঝাট করবে তাকে ঘাড় ধরে চওল থেকে বের করে দেব।’

তার দাবড়ানিতে ম্যাজিকের মতো কাজ হয়। ধাক্কাধাক্কি হল্লাটল্লা থেমে যায়।

এদিকটা ঠান্ডা করে নিজের বিপুল শরীরটা টানতে টানতে ক্রিস্টিনা ডি’সিলভা জলের কলগুলোর দিকে দৌড় লাগায়। সেখানেও ততক্ষণে লম্বা লাইন হয়ে গেছে। কে আগে বালতিতে জল ভরবে তাই নিয়ে চলছে তুমুল লড়াই। কলতলাটা যেন রণক্ষেত্র। ক্রিস্টিনা ডি’সিলভা এখানেও শাসিয়ে, তাড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে দেয়। এটাই রোজকার ঘটনা। আর ওইভাবেই শ্রীমতী রণচন্ডী চওল—এর শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখে। তার মুখের ওপর ট্যাঁ ফোঁ করার মতো বুকের পাটা কারও নেই।

আমরা রোজই এক দিকে লাইন দিয়ে পেটের ভার নামিয়ে আরেক দিকে গিয়ে লাইন দিয়ে চান টান সেরে দু’জনে দু’বালতি জল হাতে ঝুলিয়ে কামরায় ফিরে আসি। ঘরের

ভেতর দড়ি টাঙিয়ে রেখেছি। সেটার ওপর ভেজা জামা প্যান্ট মেলে দিয়ে পোশাক পাল্টে, ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে পড়ি। দু'দিকের লাইনে দু'আড়াই ঘণ্টা কাটিয়ে তৈরি হয়ে কোনও দিনই দশটা, সাড়ে দশটার আগে বেরুনো হয় না।

বাইরে গিয়ে পুরি ভাজি কি চা টোস্ট দিয়ে ব্রেকফাস্ট চুকিয়ে যে যার ধান্দায় চলে যাই। পরমেশ্বরণ পণ করেছে রাজকাপুর, ধর্মেন্দ্র কি রাজেশ খান্না বা শাম্মী কাপুর না হয়ে ছাড়বে না। সেটা তার ঘাড়ের ওপর থেকেই তো নামেইনি, আরও চেপে বসেছে। ব্রেকফাস্টের পর সে ফিল্মে একটা রোলের জন্য স্টুডিয়োতে স্টুডিয়োতে, বা প্রোডিউসারদের অফিসে অফিসে কিংবা নামকরা ফিল্ম ডিরেক্টরদের আস্তানায় হানা দেয়। এই চক্করটা চলে বিকেল অবধি। আমি বম্বেতে আসার অনেক আগে থেকেই এই চক্কর দেওয়াটা তার চলছেই। ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়।

আর আমি? রিজার্ভ ব্যাঙ্কটা তো স্যুটকেসে পুরে নিয়ে আসিনি। পকেট ধাঁ ধাঁ করে ফাঁকা হয়ে আসছে। আমদানির কিছু একটা ব্যবস্থা না হলে বোম্বাই মহানগরী আর রণচণ্ডী ক্রিস্টিনা ডি'সিলভাকে স্যালুট করে লটবহর কাঁধে ফেলে সোজা ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে গিয়ে ক্যালকাটা মেলে উঠে বসতে হবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, শ্রীমতী রণচণ্ডীর চওল—টা আমার পক্ষে বেশ পয়াই বলতে হবে। এখানে আসার একমাসের ভেতর একটা বিজ্ঞাপন এজেন্সিতে কাজ জুটে গেল। না না, দশটা—পাঁচটা চাকরি নয়। অতটা সময় এক জায়গায় আটকে থাকা আমার ধাতে নেই। এজেন্সি ফি সপ্তাহে আমাকে বেশ কিছু ইংরেজি কপি দেয়। সেগুলো ঝরঝরে, সহজ বাংলায় ট্রানস্লেশন করে দিতে হয়। খটমটো, দাঁত ভাঙা, যুক্তাক্ষরওয়ালা শব্দ ব্যবহার করা চলবে না। কপিগুলো বাংলায় তর্জমা করে এক সপ্তাহ বাদে এজেন্সির অফিসে দিয়ে আসি। সঙ্গে সঙ্গে হাতে চলে আসে কড়কড়ে নগদ এবং নতুন এক গোছা কপি। এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলছে।

বিজ্ঞাপন এজেন্সির ইংরেজি কপির অনুবাদই নয়, ছপ্পর ফুঁড়ে আরও এক সুযোগ একেবারে হাতের তালুতে নেমে এল। একটা হান্টারওয়ালি মার্কা ছবি চিত্রনাট্য লিখে দিতে হবে। আমদানি মন্দ হচ্ছে না।

এদিকে পরমেশ্বরণ রাজকাপুর, ধর্মেন্দ্র, রাজেশ খান্না টান্না হতে পারেনি ঠিকই, টানা এগারো মাস বম্বের মাটি কামড়ে পড়ে থেকে আমার মতো একটা হান্টারওয়ালি মার্কা ফিল্মের ডিরেক্টরের চার নম্বর অ্যাসিস্টান্টের কাজ জুটিয়ে নিয়েছে। এতেই সে ডগমগ। তার বিশ্বাস এই চতুর্থ অ্যাসিস্টান্টগিরির সিঁড়ি বেয়েই সে রাজ কাপুর বা রাজেশ খান্না বনে যেতে পারবে। আকাশের চাঁদ তখন তার হাতের মুঠোয়।

যারা এই লেখাটা পড়ছে, নিশ্চয়ই ভীষণ অধৈর্য্য হয়ে পড়েছে। ভাব ক্রিস্টিনা ডি' সিলভার দর্শন পাওয়া গেছে কিন্তু বম্বের বর্ষা কোথায়? তার হদিস তো মিলছে না। মিলবে, মিলবে। তার সময় হয়ে আসছে।

মার্চ মাসে আমরা এই চওল'—এ এসেছিলাম। তারপর এপ্রিল, মাস পার হয়ে মে মাসটাও শেষ হতে চলল। সময়টা জুনের প্রায় দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে।

এর মধ্যেই মনসুন উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে। আমাদের ঘরের জানলা খুললেই আরব সাগর। দেশের পশ্চিম দিকের এই সমুদ্র এমনিতে খুব শান্ত। বে অফ বেঙ্গলের মতো বদমেজাজি, খামখেয়ালি নয়, যখন তখন খেপে উঠে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ তুলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটায় না। বর্ষার সময়টা ছাড়া আরব সাগর বাকি বছর চুপচাপ, গ্রাম্য

কোনও নিরীহ জলাশয়ের মতো যেন ঘুমিয়ে থাকে। ঢেউ ওঠে কি ওঠে না। কেমন একটা ঝিমিয়ে থাকা ভাব। কিন্তু মনসুনের পায়ের আওয়াজ যেই কানে এল, আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠে।

আমাদের কামরার দুটো জানলা খুললেই চোখে পড়ছে, সমুদ্রের ঢেউ উঁচু উঁচু হয়ে ধেয়ে আসছে বেলাভূমির দিকে। মধ্য প্রাচ্য নাকি অন্য কোনও দিক থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ এসে বম্বের আকাশে জড়ো হতে শুরু করেছে। সি—গাল পাখিগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ করে ডানা ঝাপরাতে ঝাপরাতে মাঝসমুদ্র থেকে তীরের দিকে চলে আসছে। যে কোনও সময় যে দুর্যোগ এসে পড়তে পারে তার সংকেত খুব সম্ভব ওরা আগেই পেয়ে যায়।

মে মাসের বাকি দিন ক'টা নিমেষে ফুরিয়ে গেল। জুন মাস পড়ে গেছে। যত দিন যাচ্ছে আকাশ গাঢ় মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে। মেঘ চিরে ক্বচিৎ কখনও চকিতের জন্য মরা মরা রোদ দেখা দিয়েই মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। দিনের বেলাতেই আলো জ্বালতে হয়।

সেবার জুনের আট তারিখেই বর্ষা এসে গেল। প্রথমে দশ দিক কাঁপিয়ে ঘন ঘন বাজ পড়ার আওয়াজ, মেঘ আর আকাশ চিরে ফেড়ে বিদ্যুৎ চমকে যাওয়া আর অল্প অল্প বৃষ্টি। আরব সাগর কয়েক দিনে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

আরও তিন চার দিন পর যা শুরু হল তার নাম তাণ্ডব। বিপুল তোড়ে আকাশ থেকে জলের ধারা নেমে আসছে। চারিদিক ঝাপসা, বিশ ফিট দূরে যারা চলছে ফিরছে, সব যেন ছায়ামূর্তি।

এই গল্পের গোড়ায় ধ্রুপদ ধামারের কথা বলেছিলাম। তাই প্রবল প্রতাপে শুরু হয়ে গেছে। বর্ষার ক্লাসিক্যাল মিউজিক।

বম্বে এমন এক শহর, ঝড়বৃষ্টি ভূমিকম্প যাই হোক না তাকে ঘরে আটকে রাখা অসম্ভব। চওল'—এর সবাই সকালে চান টান করে কামধান্দায় বেরিয়ে পড়ে।

কলকাতায় থাকলে হয়তো গরম গরম খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে কম্বল চাপা দিয়ে ঘরের এককোণে তোফা একখানা ঘুম লাগাতাম। কিন্তু শহরটার নাম যে বম্বে। অঝোরে বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে এই অছিলায় যে যার ডেরায় পড়ে কী থাকবে? কক্ষনো না। বম্বেতে কয়েক মাস মাত্র আছি। কিন্তু এর মধ্যে পরমেশ্বরণ আর আমি এখানকারই মতো হয়ে গেছি। দু'জনে দুটো রেনকোট কিনে নিয়েছি। গায়ে তাই চাপিয়ে দুপুরের অনেক আগে আগে বেরিয়ে পড়ি।

এদিকে বৃষ্টির থামাথামি নেই। চলছে তো চলছেই। ফোর্ট এরিয়ায় বিজ্ঞাপন এজেন্সির অফিসে সপ্তাহে দু'দিন যেতে হয়। বাকি পাঁচদিন যোগেশ্বরীতে। যে ফিল্ম কোম্পানির চিত্রনাট্য লিখছি, তারা সেখানে আমার জন্য একটা গেস্ট হাউস ঠিক করে দিয়েছে। নিরিবিলিতে সেখানে লেখালেখির কাজটা চালাই।

বৃষ্টিটা একনাগাড়ে প্রবল বেগে চলার পর তোড় কমে আসে, কিছুক্ষণ পর আবার যে কে সেই।

চওল—এ ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। ততক্ষণে শহরের রাস্তাঘাট জলে ডুবে গেছে। সাবার্বন ট্রেনও বন্ধ, কেননা রেললাইন কোমর সমান জলের তলায়। একমাত্র ভরসা এই বি ই এস টি' র বাস।

জানতে পারলাম রাত বারোটার ভেতর চওল—এ ফেরার যে শর্তটা রয়েছে বর্ষকালে সেই কড়াকড়িটা থাকে না। ট্রেন বন্ধ, ট্যাক্সি বন্ধ, চওল—এর ভাড়াটেরা ঠিক সময়ে ফিরবে কী করে? গেট খোলাই থাকে। কেউ ফেরে রাত একটায়, কেউ দুটোয়, কি তারও পরে।

রোজই লক্ষ করি, দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা। শেষ ভাড়াটেটি না ফেরা অবধি দাঁড়িয়েই থাকে। কেউ ফিরলেই জিজ্ঞ্যেস করে, 'রাস্তায় বহুৎ তখলিফ হল তো? যা যা, বিলকুল ভিজে এসেছিস। কামরায় গিয়ে গা মাথা ভালো করে মুছে ফেল। বারিষের পানি বহুৎ খতরনাক। বুখার টুখার হয়ে যায়। এই মনসুনে তোদের জন্যে খুব চিন্তা হয়। যা—যা—।'

শ্রীমতী রণচণ্ডীর এই ভারী নরম চেহারাটা আগে আর কখনও দেখিনি। বেশ অবাকই হই। কিন্তু আরও বড় রকমের বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তা কি জানতাম।

সেই আমার প্রথম বম্বেতে আসা। লোকের মুখে মুখে শুনলাম সেবারের মতো বেয়াড়া, সৃষ্টিছাড়া মনসুন বম্বে আগে আর কখনও নাকি দেখেনি। অন্য সব বছর চার কি পাঁচ দিন একটানা বৃষ্টির পর দু'—একদিনের ইন্টারভ্যাল, তারপর নতুন এনার্জি ফের নিয়ে শুরু।

কিন্তু সেবার? সেই যে একদিন ভোরবেলায় টিপ টিপ, ঝিপ ঝিপ করে শুভারম্ভটা হয়েছিল তারপর বৃষ্টিটা জোর বাড়িয়ে টানা দশ দিন ঝরেই যাচ্ছে। বিশ্রাম টিশ্রাম নেই। শহরের নীচু এলাকাগুলো পনেরো ফিট জলের তলায়। রেললাইনে আট দশ ফিট জল। বেশির ভাগ রাস্তা ডুবে আছে। ট্যাক্সি, ট্রেন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ। বাসও অনেক কম বেরুচ্ছে। খবেরর কাগজে লিখেছে বম্বের ইতিহাসে এটাই নাকি রেকর্ড বৃষ্টিপাত। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে আরও পাঁচদিন বর্ষণ চলবে।

এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগও বম্বেকে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে পারেনি। গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে। মাথার ওপর বৃষ্টি নিয়ে হাঁটু কি কোমর সমান জল ঠেলতে ঠেলতে চলেছে তারা নিজের নিজের কাজের জায়গায়—অফিসে, আদালতে, ফ্যাক্টরিতে।

পরমেশ্বরণ শহরে নেই। সে গেছে দার্জিলিংয়ে। সেখানে তাদের ছবির শুটিং চলছে। দু'সপ্তাহ পর ফিরবে।

আমিও অন্য সবার মতোই বেরিয়ে পড়ি। চিত্রনাট্যটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। তাই বিজ্ঞাপন এজেন্সিকে জানিয়ে দিয়েছি, একটা সপ্তাহ ফোর্ট এরিয়ায় তাদের অফিসে যেতে পারব না। পরে গিয়ে ইংরেজি কপিগুলো নিয়ে আসব।

খার—এর চওল থেকে বেরিয়ে জল ভাঙতে ভাঙতে সেদিন বড় রাস্তায় অর্থাৎ এস ভি রোডে চলে এসেছি । সেখান থেকে দু'তিনটে বাস পালটে যোগেশ্বরীর সেই গেস্ট হাউসে। সেখানে আমার একপ্রস্থ শুকনো পোশাক রেখে দিয়েছি। যোগেশ্বরীতে পৌঁছে সারা শরীর মুছে ভেজা জামা প্যান্ট পালটে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলাম। তারপর এক কাপ কফি নিয়ে চিত্রনাট্যের খাতা খুলে বসে পড়লাম। লেখার ফাঁকে একসময় লাঞ্চ, বিকেলের চা এবং রাত বারোটায় ডিনার। তারপর গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বেরিয়ে এলাম।

রাস্তা সুনসান। সমানে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে চোখে পড়ল, বাসের চিহ্নমাত্র নেই। সাত আটটা লোক, তাদের গায়েও রেনকোট, বিরাট বিরাট চাকাওয়ালা মস্ত একটা ট্রাকে উঠছে। একরকম দৌড়েই তাদের কাছে চলে গেলাম।

জিজ্ঞ্যেস করে জানলাম, ওদের কেউ বান্দ্রায় যাবে, কেউ খার—এ, কেউ সান্তাক্রুজে। বললাম, 'আমাকে কাইন্ডলি আপনাদের সঙ্গে নিন। আমি খার—এ সমুদ্রের ধারে যাব।'

ট্রাক ড্রাইভার আমাদের কথা শুনছিল। বলল, 'সমুন্দরের দিকে যাব না সাহেব। ওদিকে রাস্তার হাল বহুৎ বুরা। চাক্কা ফাঁস যায়েগা। বড়ে সড়ক এস ভি রোড তক নিয়ে যেতে পারি। ভাড়া দেড়শো।'

এস ভি রোড পর্যন্ত যেতে পারলে সমুদ্রের দিকের রাস্তাটা হেঁটেই যেতে পারব। বললাম, 'ঠিক হ্যায়।'

'চড়িয়ে।'

ওপরে উঠে ট্রাকের ছাউনির তলায় ঢুকে গেলাম। আমার সহযাত্রীরা সেখানেই রয়েছে। কথায় কথায় জানা গেল, যোগেশ্বরীর দিকে বাস বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় তারা দাঁড়িয়ে ছিল। আচমকা এই ফাঁকা ট্রাকটা দেখে থামিয়েছে।

একজন বলল, 'একেবারে হেভেন—সেন্ট, ঈশ্বরপ্রেরিত। ট্রাকটা না পেলে আজ কী হাল যে হতো!'

ট্রাকটা যখন খার—এর পাশে এস ভি রোডে আমাকে নামিয়ে চলে গেল, রাত প্রায় দেড়টা।

সমুদ্রের দিকের রাস্তাটা আর রাস্তা নেই, প্রায় নদী হয়ে উঠেছে। প্রবল বেগে স্রোত চলছে আমাদের চাওলটার দিকে।

কোথাও মানুষজন নেই। বর্ষার এই মাঝরাতে বম্বে যেন এক ভুতুড়ে শহর। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। আমি পা বাড়িয়ে দিলাম। হাঁটতে আর হল না, জলস্রোত আমাকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে চলল। একটু অসাবধান হলেই ফেলে দেবে। কোনও রকমে ব্যালান্স রাখতে রাখতে এগিয়ে চললাম।

এই রাস্তাটা শুকনো থাকলে পনেরো মিনিট হাঁটলেই ক্রিস্টিনা ডি'সিলভার চওল। আজ তার কাছাকাছি পৌঁছতে তার তিনগুণ সময় লেগে গেল।

রেনকোট গায়ে থাকলেও বম্বের বর্ষাকে ঠেকানো প্রায় অসম্ভব। ক'দিন ধরে সমানে ভিজতে ভিজতে যোগেশ্বরীতে যাচ্ছি, আবার ভিজতে ভিজতেই ফিরছি। শরীর এমনিতেই কাহিল হয়ে আছে। জ্বর জ্বর ভাব। এই নিয়েই বেরুচ্ছিলাম। কিন্তু বম্বের মনসুন আজ আমাকে আগাগোড়া ঝাঁকিয়ে যাচ্ছে। ঠিকমতো হাঁটতে পারছি না; এক কোমর জলের তলায় এলোমেলো ধুঁকতে ধুঁকতে এলোমেলো পা ফেলছি। মাথাটা ভীষণ ঘুরছে। যে কোনও মুহূর্তে বোধ হয় টাল খেয়ে পড়ে যাব।

আমাদের চওলটার খুব কাছেই প্রচুর খানাখন্দ এবং একটা বিশাল গর্ত। প্রথম যখন এখানে আসি ওগুলো চোখে পড়েছিল। তারপর থেকে খুব সাবধানে যাওয়া—আসা করেছি। কিন্তু আজ টাল সামলাতে না পেরে জলে বোঝাই মস্ত গর্তটার ভেতর পড়ে গেলাম। গর্তটা যে এত গভীর, আগে বুঝতে পারিনি।

হাত বাড়িয়ে সেটার একটা দিক ধরে যে ওপরে উঠে আসব তেমন শক্তি শরীরে নেই। ক্রমশ মনে হচ্ছে আমি নীচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি। গোঙানির মতো আওয়াজ করে শুধু বলতে পারছি, 'বাঁচাও—বাঁচাও!' বলছি! আর জলের ভেতর এলোপাতাড়ি হাত—পা ছুড়ছি। বাঁচার মরিয়া চেষ্টা।

হঠাৎ তুমুল বৃষ্টি ভেদ করে কয়েকটি শব্দ কানে এল, 'এ যোহন, এ ব্রাগাঞ্জা, এ রামনাথ! ঘরসে জলদি জলদি নিকালকে আ—'

নিশ্চয়ই ক্রিস্টিনা ডি' সিলভার কণ্ঠস্বর। মনে পড়ল, যত রাতই হোক চওল—এর সব বাসিন্দা না ফেরা পর্যন্ত সে দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

একটু পরেই আবছাভাবে দেখতে পেলাম কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা দৌড়তে দৌড়তে এসে আমাকে গর্ত থেকে টেনে তুলল। ভালো করে তাকাতে পারছি না, চোখ বুজে বুজে আসছে। তারই মধ্যে দুজন আমাকে কাঁধে তুলে আমাদের কামরাটার সামনে নিয়ে এল।

যারা আমাকে কাঁধে চাগিয়ে এনেছে তারা ছাড়াও কয়েকজন রয়েছে। ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'লেড়কাটার পকেটে চাবি আছে। নিকালকে কামরা খুলো।'

তালা খোলার মতো শব্দ কানে এল। তারপর আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে, আলো জ্বেলে, রেন কোট, ভেজা জামা প্যান্ট খুলে, দড়িতে ঝুলানো শুকনো পোশাক পরিয়ে দিয়ে আমাকে শুইয়ে দেওয়া হল।

যারা আমাকে পাতাল প্রবেশ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে তাদের সারা শরীর, পোশাক ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। কামরায় মেঝেতে জলের স্রোত।

ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করছিল। কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠল, 'আরে! বঙ্গালি লেড়কাটার গা তো পুড়ে যাচ্ছে। তাওয়া বসিয়ে রোটি সেঁকা য্যায়সে। বহুৎ টেম্পারেচার। আভি ডক্টর নিম্বলকারের কোঠিতে চলে যা। ডক্টরকে সাথ নিয়ে চলে আসবি। ফিরে এসে কামরার জল মুছে দিয়ে তোদের কাপড়া উপড়া চেঞ্জ করে আসবি। তারপর আমি চেঞ্জ করে আসব। যা—জলদি ওয়াপস আনা—।'

সবাই চলে গেল। আমরা দুটো প্লাস্টিকের টুল কিনেছিলাম। একটা টেনে এনে আমার বিছানার পাশে বসল ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা। কপালে হাত বুলোতে বুলোতে ভারি কোমল গলায় বলল, 'খুব দর্দ হচ্ছে?'

রণচণ্ডী মার্কা এই মানুষটাকে আজ যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। একটা মানুষের মধ্যে কতরকম মানুষ যে লুকোনো থাকে। মাথাটা যন্ত্রণায় টন টন করছে, কপালের দুপাশের রগগুলো যেন ছিঁড়ে পড়বে। বললাম, 'হ্যাঁ।'

'ডক্টর নিম্বলকাকরের খুব নাম। সব ঠিক হয়ে যাবে। ডরো মাত।' ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা আমার কপালের দু'পাশে টিপে দিতে লাগল।

যারা ডাক্তার নিম্বলকারকে আনতে গিয়েছিল আরেক দফা বৃষ্টিতে ভিজে জামাপ্যান্ট আরও সপসপে করে ফিরে এসে জানাল, 'ডাক্তারের গাড়ির চাক্কা ফেঁসে গেছে। তাছাড়া তিনি যেখানে থাকেন, সেদিকের রাস্তা টাস্তার হালও ভীষণ খারাপ। এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব নয়।'

ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা এক রকম লাফ দিয়েই উঠে দাঁড়াল। চড়া গলায় বলল, 'সম্ভব না বললেই হল। আমরা থাকতে এই বঙ্গালি লেড়কা মরে যাবে? দু'জন এখান থেকে লেড়কাকে দ্যাখ। বাকি সবাই আমার সঙ্গে চল?' দলবল নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

আমার চোখ দুটো আধাআধি বোজা। কষ্ট করে পুরোটাই খুললাম। যা দেখলাম ভাবতেও পারিনি। সামনের চত্বরের একধারে বিরাট বিরাট চাকা লাগানো দুটো ঠেলাগাড়ি

রয়েছে। বেশ উঁচু উঁচু। তার একটা বের করে ঠেলতে ঠেলতে ওরা চলে গেল।

মিনিট কুড়ি পঁচিশ বাদে দেখা গেল ঠেলা গাড়ির ওপর স্যুটবুট পরা, বর্ষাতিতে মোড়া, মাথায় বৃষ্টি ঠেকানোর ক্যাপ—একজন বসে আছেন। নিশ্চয়ই ডাক্তার নিম্বলকার। তাঁর মাথার ওপর ঠেলাগাড়ির দু'পাশ থেকে দু'জন তেরপোল ধরে আছে। দু'জন পেছন থেকে গাড়িটা ঠেলছে, সামনের দিক থেকে আরও দু'জন টেনে আনছে। তাদের আগে আগে হুঁশিয়ার করতে করতে এগিয়ে আসছে ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা,—'সামহালকে—সামহালকে। সড়ককা গাড্ডা বাচাকে—।'

ধুম জ্বরের মধ্যেও মজাই লাগল। ছেলেবেলায় পূর্ব বাংলায় নৌকো, ঘোড়া বা পালকিতে চড়ে ডাক্তার কবিরাজকে রুগিদের বাড়িতে যেতে দেখেছি। কলকাতায় এসে মোটরে চড়া ডাক্তারদের দেখেছি। কিন্তু ঠেলাগাড়িতে চড়া ডাক্তার সেই প্রথম।

খোলা গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে গাড়িটা চওল—এর চত্বর পেরিয়ে আমাদের কামরার সামনে এসে দাঁড়াল।

ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা বলল, 'আসুন ডক্টর, আসুন। পেশেন্ট এখানেই আছে।' বলে সে আমাদের কামরায় ঢুকে পড়ল। তার পেছনে পেছনে পেট মোটা, ঢাউস একটা মেডিক্যাল ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে ডাক্তার নিম্বলকার। যারা ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসেছে তারা বাইরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। তারা এমন ভিজেছে যে ঘরে ঢুকলে তাদের জামা প্যান্ট থেকে জল ঝরে মেঝেতে ঢেউ খেলে যাবে।

ডাক্তার নিম্বলকার পরমেশ্বরণের ফাঁকা বিছানায় তাঁর ব্যাগটা রেখে আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন, 'এই ছেলেটাই পেশেন্ট তো?'

ক্রিস্টিনা ডি'সিলভা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

ডাক্তার আমার কপালে হাত রেখেই তক্ষুনি সরিয়ে নিয়ে চটপট তাঁর ব্যাগটা খুলে থার্মোমিটার আর স্টেথিসকোপ বের করে প্রথমে আমার জিভের তলায় থার্মোমিটার ঢুকিয়ে দিয়ে জ্বর দেখলেন। টেম্পারেচার এক শো পাঁচ। তারপর চোখের তলা টেনে, বুক পিঠ পরীক্ষা করে বললেন, 'কেসটা বেশ সিরিয়াস।'

ক্রিস্টিনা ডি' সিলভার চোখে মুখে উদ্বেগ ফুটে বেরোল। 'কীরকম—'

'মনে হয় ছেলেটা অনেকক্ষণ জলে ভিজেছে। নিমুনিয়া হল কিনা ব্লাড টেস্ট না করলে বোঝা যাবে না। কালই টেস্টের ব্যবস্থা করব। যাই হোক, আজ একটা ইনজেকশান দিচ্ছি। দু'দিনের মতো ট্যাবলেটও দিয়ে যাব। দাওয়াই এম্পটি স্টমাকে খাওয়াবেন না। আজ একটা ট্যাবলেট, কাল তিনটে। শক্ত খাবার চলবে না। তিন দিন দুধ আর পাতলা সুজি। আর হাঁ, অ্যারেবিয়ান সী থেকে খুব ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। পেশেন্টকে এভাবে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। কম্বল টম্বল দিয়ে ওর বডিটা ঢেকে দিন।'

'ভুল হয়ে গিয়েছিল। ব্যবস্থা করছি।'

ইনজেকশন দেওয়া হল। একটা ছোট কাগজের প্যাকেটে ট্যাবলেট ভরে ক্রিস্টিনা ডি'সিলভাকে দিতে দিতে কখন কখন খাওয়াতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে ডাক্তার বেজার মুখে বললেন, 'ম্যাডাম, আপনি আমাকে ধমকি দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এসেছেন, অন্য কেউ হলে তা পারত না। এই বারিষে আমার খুব তকলিফ হয়েছে।'

'ঝড় তুফান, বারিষ, আর্থকোয়েক যাই হোক, পেশেন্টের বাড়ি থেকে ডাক এলে আপনাকে যেতেই হবে। মানুষের জান বাঁচানোই আপনার কাজ।'

ডাক্তার কেমন যেন মিইয়ে গেলেন। উত্তর দিলেন না। বুঝতে পারলাম, শুধু এই চওল—এই নয়, সমস্ত এলাকাটা জুড়ে ক্রিস্টিনা ডি'সিলভার প্রবল দাপট।

শ্রীমতী রণচণ্ডী তার শার্টের পকেট থেকে একতাড়া ভিজে নোট বের করে বলল, 'ডক্টর, আপনি তো পেশেন্টের বাড়ি গেলে ফী নেন ফোর হানড্রেড রুপিজ। এখানে এইট হানড্রেড আছে। বারিষে আপনার তখলিফ হয়েছে। তাই ফী—টা ডবল। যে কদিন বেঙ্গলি লেড়কাটা বিলকুল কিওরড না হচ্ছে, খাড়া হয়ে না বসছে, রোজ আপনাকে আসতে হবে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আরও কয়েকদিন জোর বারিষ হবে। হোক। রোজ ঠেলা গাড়ি পাঠিয়ে দেব। রোজ ফী—টা ডবল। আর হ্যাঁ, নোটগুলো ভিজে গেছে। বাড়ি ফিরে ওভেনে তাওয়া চাপিয়ে তার ওপর রেখে ওগুলো শুকিয়ে নেবেন।'

এবারও ডাক্তারের জবাব নেই। তাঁকে ঠেলাগাড়িটায় তুলে দেওয়া হল। যারা তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল, তারাই তাঁকে পৌঁছে দিতে গেল।

এদিকে এত মানুষের গলার আওয়াজে চওল—এর অনেকের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তারা দৌড়ে আমাদের কামরায় চলে এল।

ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা তাদের বলল, 'তোরা এসেছিস, ভালো হয়েছে। যোহন রামনাথরা ডক্টরকে পৌঁছে দিতে গেছে। ওরা বারিষে খুব ভিজেছে। আর ওদের খাটাব না। ওদের যার যার কামরায় পাঠিয়ে দেব। বাকি রাতটা ঘুমিয়ে নিক। তোরা দু'জন বাঙ্গালি লেড়কাটার পাশে বোস। বাকি সবাই বালতি কাপড়া ঝাড়ু এনে ফ্লোরের জল সরিয়ে মুছে ফেল। আমি কম্বল খুঁজি।'

ক্ষীণ গলায় জানালাম, আমাদের কোনও কম্বল টম্বল নেই।

ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। আমি ওপরে যাচ্ছি। ড্রেস ট্রেস চেঞ্জ করে জলদি ফিরে আসব।'

ঘরের জল সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা ভেজা পোশাক পালটে গরম দুধ এবং একটা কম্বল হাতে নিয়ে ফিরে এল। আমার গায়ে কম্বলটা চাপিয়ে ট্যাবলেট আর দুধ খাইয়ে দিয়ে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়।' সে আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগল।

ট্যাবলেট আর ইঞ্জেকশনে এমন কিছু ছিল, আর তাকিয়ে থাকা গেল না। দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল।

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল, সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু বৃষ্টি থামেনি। চোখে পড়ল, শিয়রের কাছে বসে আছে ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা। সারারাতই তা হলে এখানেই না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে।

সে বলল, 'তোর মুখ ধোবার জন্যে জল, টুথ পাউডার, দুধ হালুয়া টালুয়া নিয়ে আসছি।' চওল—এর দু'জনকে ডেকে আমার দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে চলে গেল।

এরপর আমার রক্ত, থুতুটুকু পরীক্ষা করা হল। না, নিমুনিয়ার কোনও লক্ষণ নেই। জ্বরটা হয়েছে দিনের পর দিন বৃষ্টিতে ভিজে।

বর্ষার বিক্রম এতটুকু কমেনি। একটানা ঝরেই চলেছে। অতএব রোজই ঠেলা গাড়িতে আরোহণ করে আমাকে দেখতে আসছেন ডাক্তার নিম্বলকার।

রোজই দিনের বেশির ভাগ সময়টা আমার ঘরে থাকে ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা। পুরো রাতটা আমার পাশে বসে কাটিয়ে দেয়। সকালে মুখ ধুইয়ে দুধ সুজি খাইয়ে ওষুধ খাওয়ায়। দুপুরে এবং রাত্তিরে ফের সুজি।

পাঁচ দিন পর বৃষ্টি থামল। আমার জ্বরটাও আর নেই। ডাক্তার দিয়েছে ওষুধ। পথ্যও। আমি ডিম মাংস খাই—না, তাই আমার জন্য ভেজিটেবল সুপ এবং মাছ ভাজা আর ফল।

আরও কয়েকদিন বাদে বেশ কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলাম। ডাক্তার আর আসছে না। ফোনে ক্রিস্টিনা ডি' সিলভার কাছ থেকে আমার খবর নেন।

ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা আগের মতো সারারাত আমার শিয়রে বসে কাটায় না। তবে বেশ খানিকটা সময় কাছেই থাকে। দিনের বেলা খাবার তৈরি করে আনে। সেসব খাওয়ানোর পর ওষুধ খাইয়ে যায়।

পুরোপুরি সুস্থ হতে আরও কিছুদিন লাগল। ডাক্তারের অ্যাডভাইস, এখন বাইরে বেরুতে পারি। তবে বেশি ঘোরাঘুরি বা বেশি কাজের চাপ নেওয়া চলবে না।

দার্জিলিংয়ের শু্যটিং সেরে পরমেশ্বরণ ফিরে এল। ক্রিস্টিনা ডি' সিলভার দায়িত্বও কিছুটা কমে গেল।

এর ভেতর একদিন যে প্রোডিউসারের চিত্রনাট্য লিখছিলাম তিনি আমার জ্বরটরের খবর পেয়ে বেশ কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

একদিন বিকেলে হাজার চারেক টাকা পকেটে পুরে দোতলায় ক্রিস্টিনা ডি' সিলভার অফিসে গেলাম। চওল—এর মালকিন টেবিলের ওপর ঝুঁকে গুচ্ছের কাগজপত্র দেখছিল। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল, 'আয় আয়। বৈঠ।'

আগে আমাকে তুমি করে বলত। জ্বরটা বাধাবার পর 'তুমি' টা 'তুই' হয়ে গেছে।

মুখোমুখি বসে পড়লাম।

ক্রিস্টিনা ডি' সিলভা এবার বলল, 'এতটা সিঁড়ি ভেঙে উঠলি। তখলিফ হচ্ছে না তো?'

'না। আমি ঠিক আছি।'

'কিছু বলবি?'

'হ্যাঁ।' পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে বললাম, 'আমার জন্যে রাতের পর রাত জেগেছেন, কত যত্ন করেছেন। আমাকে বাঁচিয়েছেন। অনেক টাকা খরচ হয়ে গেছে। তাই —'

'তাই কী?'

নোটের গোছাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'যাঁদের কাজ করছি তাঁরা টাকা পাঠিয়েছেন। এখানে চার হাজার আছে।'

মুহূর্তে বাজ পড়ার মতো আওয়াজ হল, 'তুই আমাকে টাকা দিতে এসেছিস! ইউ আর অ্যাজ গুড অ্যাজ মাই সন। এত সাহস হল কী করে? বান্দর, উল্লু কাঁহিকা। যা, ভাগ।'

আমি হতচকিত। ভয়ে ভয়ে উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে একবার ফিরে তাকালাম। ক্রিস্টিনা ডি' সিলভার মুখে ভারি মিষ্টি একটি হাসি ফুটে উঠেছে। এমন হাসি শুধু মায়েরাই হাসতে পারে। একে কী বলে? স্বর্গীয় হাসি কি?

আমি প্রায় সারা দেশ ঘুরেছি। মায়েদের দেখেছি, দেখেছি কখনও আন্দামানের পেনাল কলোনিতে, কখনও কলকাতার অলিগলিতে, কখনও মাদ্রাজের মেরিনা বীচে। সেদিন দেখলাম আরব সাগরের ধারের এক চওল'—এ।

—

কবি উমাপতি চাকলাদারের জীবনচরিত

নামটি দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে এই গল্পের নায়ক উমাপতি চাকলাদার এবং তিনি একজন কবি। কিন্তু তাঁর কথা বলার আগে কল্পতরু সমাদ্দার সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে নিতেই হবে। কারণ কল্পতরু না থাকলে উমাপতি চাকলাদারের সঙ্গে কোনওদিনই আমার দেখা হতো না। এ গল্পে কল্পতরুর ভূমিকা অনেকটা যোগাযোগকারীর।

সাতান্ন আটান্ন বছর আগে, আমার বয়স তখন সতেরো আঠারো, কলেজে পড়ি, সেইসময় কল্পতরু সমাদ্দারের সঙ্গে আমার আলাপ। কীভাবে আলাপটা হয়েছিল, এ গল্পে তার প্রয়োজন নেই। তবে একটা কথা জানানো দরকার কল্পতরু সেই সময় ছিলেন একজন নামকরা লেখক। বাংলা সাহিত্যের খোঁজখবর যাঁরা রাখেন কল্পতরুর নামটা তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন।

কল্পতরু সমাদ্দারের দেশ ছিল অখণ্ড বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) বরিশালে। দেশভাগের পর পর তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন। গড়িয়ার কাছাকাছি একটা জবরদখল উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকতেন। দাঙ্গা, পার্টিশন আর রিফিউজিদের নিয়ে লেখা তাঁর কয়েকটি উপন্যাস আর গল্প তখন বেশ নাম করেছিল।

আমার সঙ্গে কোথাও দেখা হলে তাঁদের বাড়িতে যেতে বলতেন। অনেকবার বলার পর একদিন বিকেলে খুঁজে খুঁজে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। সঙ্গে আমার কলেজের এক বন্ধু কল্যাণ।

উদ্বাস্তু কলোনির বর্ণনা দেবার দরকার নেই। আমার ধারণা এই গল্পের পাঠকেরা প্রায় সবাই কলকাতার আশপাশে উদ্বাস্তুদের অগুনতি উপনিবেশ স্বচক্ষে দেখে থাকবেন।

কল্পতরুর বাড়িটা সেকালের পূর্ব বাংলার বাড়িঘরের চেহারা মনে করিয়ে দিয়েছিল। মাথায় ছিল ঢেউখেলানো টিনের চাল, চারপাশে চেরা বাঁশের দেওয়াল, মেঝে লাল সিমেন্টের।

আমাদের দেখে কল্পতরু সমাদ্দার ভীষণ খুশি হলেন। হাত ধরে সামনের শেড—দেওয়া ঢালা বারান্দায় নিয়ে গেলেন। সেখানে শতরঞ্চি পাতা ছিল। বোঝা গেল এটিই তাঁর বৈঠকখানা। বললেন, 'বোসো বোসো'—

আমরা বসে পড়লাম।

ছাপার অক্ষরে নাম এবং গল্প টল্প বেরোয়, কল্পতরু সমাদ্দার ছাড়া অন্য কারওকে আমাদের সেই বয়সে দেখিনি। তিনি ছিলেন আমাদের স্বপ্ন জগতের বাসিন্দা।

আমাদের পেয়ে কল্পতরু নানারকম গল্প জুড়ে দিলেন। সবই সাহিত্য আর সাহিত্যিকদের অন্দর মহলের গল্প। কোন লেখক ভালো লিখছে, কোন লেখক জঘন্য, কে সারাজীবন কাগজের ওপর কলম ঘষে গেলেও লেখক হতে পারবে না, কে পুরস্কারের জন্য পুরস্কার—কমিটির মেম্বারদের বাড়িতে দিনের পর দিন হানা দিয়ে জুতোর তলা ক্ষইয়ে ফেলছে, ইত্যাদি।

মানুষটি এমনিতে চমৎকার, স্নেহপ্রবণ কিন্তু একবার কথা বলতে শুরু করলে সহজে থামেন না। যেন একটি টকিং মেশিন।

ঘণ্টাখানেক পর দম ফেলার জন্য তিনি একটু থামতেই সেই ফাঁকে বললাম, 'আপনি এখন নতুন কিছু লিখছেন?'

'হ্যাঁ, লিখছি তো—'কল্পতরু বললেন, আমাদের এই গড়িয়া নাকতলা এলাকার জবরদখল কলোনিগুলো নিয়ে একটা উপন্যাস শুরু করেছি।'

'কতটা লেখা হয়েছে?'

'খুব বেশি না। এই পঁচিশ তিরিশ পাতার মতো।'

লেখকের মুখ থেকে তাঁর লেখা শুনতে আমার আর কল্যাণের খুব ভালো লাগে। আগ্রহের সুরে বললাম, 'লেখাটা পড়ে শোনান না। আমাদের শুনতে ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে।' মনে হয়, দারুণ একটা উপন্যাস হবে।'

এই গল্পটা যাঁরা পড়ছেন তাঁরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। যাঁকে নিয়ে এই গল্প এখনও তাঁর আবির্ভাব হচ্ছে না, ধৈর্য হারানোর তো কথাই। আরেকটু অপেক্ষা করুন, উমাপতির দর্শন পাবেন।

এদিকে আমাদের আবদার শুনে একটু ভেবে কল্পতরু সমাদ্দার বললেন, 'মানে পাণ্ডুলিপি থেকে টাটকা শুনতে ইচ্ছে করছে? আমি যেটা লিখেছি, একটা ম্যাগজিনের লোকেরা এসে তা নিয়ে গেছে। তারা এই উপন্যাসটা ধারাবাহিকভাবে মাসে মাসে ছাপবে। কিন্তু তোমাদের ইচ্ছেটা পূরণ না করলেই নয়। চলো আমার সঙ্গে—'

'কোথায় যাব!' আমরা অবাক।

'সেখানে গেলেই দেখতে পাবে। উঠে পড়ো—'

কল্পতরু আমাদের সঙ্গে করে খানিকটা দূরে কলোনিরই অন্য একটা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এই বাড়িটা মোটামুটি তাঁর বাড়ির মতোই। সেইরকম টিনের চাল, চেরা বাঁশের দেওয়াল, সিমেন্টের মেঝে, সামনের দিকে শেড—লাগানো প্রশস্ত বারান্দা।

বারান্দায় গদি—পাতা বড় তক্তপোশে একজন গোলগাল ভারী চেহারার মাঝবয়সি ভদ্রলোক বসে ছিলেন। প্রায় পুরো মাথা জুড়ে চকচকে টাক; সেই টাকের তলা দিয়ে কাঁচাপাকা চুলের ঘের। গোল গোল চোখের ওপর রোমশ ভুরু। চৌকো ধরনের মুখ, ঘন রোমশ ভুরু। হাইট খুব একটা বেশি হবে না, বড় জোর পাঁচ ফিট তিন কি চার ইঞ্চি। গায়ে প্রচুর মেদ, থুতনির তলাতেও তিন থাক চর্বি।

তাঁর পরনে ধুতি এবং হাফ—হাতা ফতুয়া। শরীরের যে অংশগুলো ঢাকা পড়েনি, সেই সব জায়গার অজস্র ঘন লোম বেরিয়ে আছে। চোখে নিকেল ফ্রেমের গোলাকার বাইফোকাল চশমা। ঝুঁকে কিছু একটা দেখছিলেন। উঠোনে পায়ের শব্দ কানে যেতেই মুখ তুলে তাকালেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, 'আসুন কল্পতরুবাবু, আসুন। বলতে বলতেই তাঁর নজর এসে পড়ল আমাদের দিকে। গোল চশমার তলা দিয়ে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আমাকে এবং কল্যাণকে যেন জরিপ করে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'এই শাবক দু'টি কারা?'

বুঝতে পারলাম আমাদের অল্প বয়স, তাই আমরা শাবক।

কল্পতরুবাবু রহস্যময় হেসে বললেন, 'এ দুটিকে আপনার শিকারও বলতে পারেন আবার খাদ্যও বলতে পারেন।' বলে চোখ ছোট করে কী ইশারা যেন করলেন।

ভদ্রলোকের দু'চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। আমাদের দিকে তাকিয়েই ছিলেন। বললেন, 'বোসো বোসো। তোমাদের নাম দুটি কী ভাই। নিশ্চয়ই পড়াশোনা করছ?'

আমরা বারান্দায় উঠে তক্তপোশে তাঁর কাছাকাছি বসে পড়ি। ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই কল্পতরু সমাদ্দার আমাদের নাম, কোন কলেজে কোন ইয়ারে পড়ছি, সব জানিয়ে দেন। এবং ভদ্রলোকের পরিচয়টাও আমাদের জানানো হয়। তাঁর নাম উমাপতি চাকলাদার।

উমাপতি ভীষণ খুশি হয়ে বললেন, 'তোমরা এসেছ। খুব ভালো লাগছে। সাহিত্যের চুলকুনি শুরু হয়েছে বুঝি?

উমাপতির কথাগুলো এরকম ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে কল্পতরু সমাদ্দার চোখ টিপে বললেন, 'চুলকুনি বলে চুলকুনি। সেটি না হলে এই গড়িয়া পর্যন্ত দৌড়ে আসে।'

উমাপতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন। 'খুব ভালো খুব ভালো।' বলেই শরীরটাকে হেলিয়ে বাঁ দিকের একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, 'চারু, চারু—'

একটি কুড়ি বাইশ বছরের রোগাটে চেহারার তরুণী ভেতর দিক থেকে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। নীচু গলায় বলল, 'ডাকলে কেন বাবা, কিছু দরকার আছে?'

'হ্যাঁ। খুব ভালো করে ময়ান দিয়ে পরোটা আর আলুর দম বানিয়ে ফেল। আর ঝানুকে পাঠিয়ে দে—'

চারু চলে গেল। মিনিট দুয়েক বাদে টিনটিনে ফড়িঙের মতো চেহারার চোদ্দো পনেরো বছর বয়সের একটি ছেলে সামনে এসে দাঁড়াল। চোখ পিট পিট করে আমাদের পা থেকে মাথা অবধি নিরীক্ষণ করার পর আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে উমাপতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা, আজ বুঝি এই দু'জনকে পাকড়েছ?'

উমাপতি গর্জে উঠলেন, 'হারামজাদা, বাঁদরামো হচ্ছে? যাও,দিদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে 'গৌরহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' থেকে রাজভোগ আর ল্যাংচা নিয়ে এসো। পনেরোটা পনেরোটা করে।'

কানু চলে যাবার পর কল্যাণ আমার কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'লোকটার কী মতলব বল তো—'

আমি অবাক।—'কীসের আবার মতলব?'

'উমাপতি চাকলাদার আজ প্রথম আমাদের দেখল। নাম টাম কী পড়ছি, ব্যস এটুকুই জানে। কিন্তু পরোটা রাজভোগ, টাজভোগ খাওয়াতে চাইছে। ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

উমাপতি যাতে শুনতে না পান, গলা অনেকটা নামিয়ে ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, 'তোর ভীষণ খুঁতখুঁতুনি। সব কিছুতেই সন্দেহ। আদর করে খাওয়াতে চাইছে। ভালোই তো।' বলতে বলতে আমার মনে একটা খটকা দেখা দিল। সত্যিই তো এই প্রথম এখানে আসা, তাও কল্পতরু সমাদ্দার নিয়ে এসেছেন বলে। উমাপতি চাকলাদার আমাদের খাওয়ার কথা বলেননি। আমরাই বেশি বেশি ভেবে ফেলেছি। এবার বললাম, 'দেখা যাক—'

কল্যাণের সন্দেহটা কাটছে না। স্বগতোক্তির মতো সে বলল, 'প্রথম দর্শনেই ল্যাংচা পরোটা টরোটা দিয়ে জামাই আদর করতে চাইছে। আমার মন বলছে লোকটা আমাদের

কোনও ঝামেলায় ফেলে দেবে।'

কল্যাণ ধরেই নিয়েছে, খাবার দাবারের এত আয়োজন আমাদের জন্যই। আমি জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, আচমকা আরও দু'জন ভদ্রলোক এসে হাজির। তাঁদের একজনের চেহারা বিলকুল কুস্তিগীরদের মতো। পেটানো স্বাস্থ্য। হাইট ছ'ফিটের কাছাকাছি। ছাতি কম করে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন ইঞ্চি। মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। বয়স পঞ্চাশের নীচেই, পরনে প্যান্টশার্ট।

দু'নম্বর ব্যক্তিটির চেহারা খানিকটা বোতলের মতো। বয়স এক নম্বরের চেয়ে অনেকটাই বেশি। ষাট ছুঁই ছুঁই। শজারুর কাঁটার মতো খাড়া খাড়া চুলের চারভাগের তিনভাগ সাদা, একভাগ কালো। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি।

এই দু'জনকে দেখে উমাপতি বেশ সমাদরের সুরে বললেন, 'আসুন রামবাবু, আসুন নরেশ্বরবাবু—'

রামবাবুরা এসে আমাদের গা ঘেঁষে বসে পড়লেন। তাঁদের দু'জনের সঙ্গে আমাদের দু'জনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ধুতি—পাঞ্জাবি পরা বয়স্ক লোকটি হলেন রামগোপাল দত্ত। তিনি একটা স্কুলে ভূগোলের টিচার। পালোয়ানের মতো নিরেট, জবরদস্ত চেহারা যাঁর তিনি একটা আখড়ায় কুস্তি সেখান। তা ছাড়া গড়িয়া বাজারের কাছে একটা বড় জামাকাপড়ের দোকান আছে। নাম নরেশ্বর নন্দী। দু'জনেই নাকি বইয়ের পোকা। সাহিত্যপাগল মানুষ।

রামগোপালবাবুরা আসতেই মজলিশ বেশ জমে উঠল। আর তার মধ্যেই উমাপতিবাবুর মেয়ে চারু প্লেটে প্লেটে পরোটা, আলুর দম এবং রসগোল্লা সাজিয়ে সবাইকে দিয়ে চলে গেল।

তখন বিকেল ফুরিয়ে এসেছে। আকাশের গড়ানে পাড় বেয়ে সূর্যটা কিছুক্ষণ আগেই পশ্চিম দিকের বাড়িঘর আর উঁচু উঁচু গাছপালার আড়ালে নামতে শুরু করেছে। পাখিরা সারাদিন খাবারের খোঁজে ঘোরাঘুরির পর এখন নিজেদের আস্তানায় ফিরে যেতে শুরু করেছে। রোদের দাপট আর আগের মতো নেই, দ্রুত ম্যাড়মেড়ে হয়ে যাচ্ছে। কতক্ষণ আর? খুব বেশি হলে ঘণ্টাখানেক। তারপরই ঝপ করে সন্ধে নেমে যাবে। চারিদিকে তারই তোড়জোড় চলছে।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে। চারু চা নিয়ে এল।

চা খাওয়া যখন শেষ ঠিক সেই মাহেন্দ্রক্ষণে উমাপতি চাকলাদার তাঁর প্রথম ব্যালিস্টিক মিসাইলটি আমাদের দিকে তাক করে ছাড়লেন। 'তোমাদের সবাইকে পাওয়া গেছে। আজ তা হলে সাহিত্যের আসর বসানো যাক। তোমরা কী শুনতে চাও—কবিতা, ছোট গল্প, বড় গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, রম্যরচনা, নাকি উপন্যাস?'

আমার মুখটা পাক্কা তিন মিনিট হাঁ হয়ে রইল। তারপর জোরে দম নিয়ে বললাম, 'আপনি এত সব লিখেছেন?'

উমাপতি ভারিক্কি চালে মিটিমিটি হেসে বললেন, 'সাহিত্যের হেন শাখা নেই যা নিয়ে কলম চালাইনি। ষোলোশো পাতার উপন্যাস লিখেছি সাঁইত্রিশখানা। মহাকাব্য লিখেছি ছ'টা, প্রবন্ধ দেড় হাজার, গল্প সাড়ে সাত শো, নাটক তিনশো একটা, কবিতা রম্যরচনা যে কত লিখেছি তার হিসেব নেই। হেঁ—হেঁ—' নেই।

কল্পতরু সমাদ্দার টিপ্পনি কাটলেন, 'উমাপতিদার বয়েস মাত্র পঞ্চান্ন। এর মধ্যেই লেখে লিখে দেড় টন কাগজ ভরে ফেলেছেন! একটা বড় পেপার মিলকে আরও দেড় টন কাগজ সাপ্লাই করার জন্যে অর্ডার দিয়েছেন।'

উমাপতি হেঁ হেঁ করে আরও একটু হেসে আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'কই, বললে না তো কী শুনবে?'

আমরা পাণ্ডুলিপি থেকে নতুন টাটকা লেখা শুনতে ভালোবাসি ঠিকই কিন্তু সেসব নামকরা লেখকের। উমাপতি চাকলাদারের নাম আমাদের চোদ্দো পুরুষে কেউ কখনও শোনেনি। দেড় টন কাগজ লিখে লিখে যিনি ভরিয়ে ফেলেছেন তাঁর লেখার একটি বর্ণও কোনও পত্র—পত্রিকায় চোখে পড়েনি। তিনি কীরকম লেখেন, ধারণাই নেই। কল্পতরু সমাদ্দার এ কার কাছে আমাদের নিয়ে এসেছেন! ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে, একটু একটু ভয়ও। উঠে যে চলে যাব তারও উপায় নেই। পরোটা আলুর দম টম আগেই খাইয়েছেন। হাজার হোক, ভদ্রতা বলে একটা কথা তো আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য বললাম, 'কবিতা শুনব।' মনে মনে ভাবলাম, একটা কবিতা শুনতে কতক্ষণই বা লাগবে। বড় জোর পাঁচ কি সাত মিনিট। তারপরই এই জবরদখল কলোনি থেকে কল্যাণকে সঙ্গে নিয়ে চম্পট।

উমাপতি চাকলাদার বেশ মনমরা হয়ে গেলেন যেন। 'কবিতা! একটা জব্বর সামাজিক উপন্যাস লিখেছি। এই তোমাদের বয়সি আজকালকার যুবক যুবতীদের নিয়ে। দারুণ জমে গেছে। সেটা শোনো—'

ভীষণ ভড়কে গেলাম। কী উত্তর দেবো, ভেবে পাচ্ছি না, আকাশ পাতাল হাতড়াচ্ছি, পাশ থেকে কল্যাণ বলে উঠল, 'আমরা দু'জনে কবিতা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। কবিতার মতো জিনিস হয় না।" আহা তিন চার মিনিটে মন ভরে যায়।'

উমাপতি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর মাথাটা অল্প অল্প নাড়তে লাগলেন, 'বেশ' কবিতাই যখন শুনতে চাইছ, তাই হোক।' বলেই গলা চড়িয়ে হাঁক হাঁক দিলেন, 'ঝানু'—

তৎক্ষণাৎ সেই রোগা ডিগডিগে ছেলেটি এসে দর্শন দিল। খুব সম্ভব কাছাকাছি কোথাও ছিল। উমাপতি তাকে বললেন, 'যা, ভাঙা মসজিদটার সামনে একখানা শতরঞ্চি বিছিয়ে রেখে চলে আয়।' তারপর আরও কাজ আছে।'

আমরা যেখানে বসে আছি সেখান থেকে ডান দিকে তাকালেই রাস্তা। রাস্তার ওধারে একটা অনেক কালের পুরনো ভাঙা মসজিদ চোখে পড়ে। সেটার সামনে সবুজ কার্পেটের মতো খানিকটা ঘাসের জমি। ঝানু সেখানে পরিপাটি করে একখানা বেশ বড় সাইজের শতরঞ্চি পেতে রেখে ফিরে এসে পিতৃদেবের দু'নম্বর হুকুমের জন্য দাঁড়িয়ে রইল।

উমাপতি এবার বললেন, 'এখন আমার এপিকের তোরঙ্গখানা নিয়ে আয়।'

হুকুম অচিরেই তামিল হল। ঝানু ডান দিকের বড় ঘরখানায় ঢুকে তক্তপোশের তলা থেকে কালো রঙের ঢাউস একটা টিনের বাক্স বের করে আনল। সেটা বইতে তার পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে; গলার শিরগুলো দড়ির মতো ফুলে উঠেছে; হাতদু'টো মনে হচ্ছে বাক্সর ভারে আরও দেড় ফুট লম্বা হয়ে যাবে। আমাদের সামনে দিয়ে সে যখন গেল, চমকে উঠে দেখলাম, বাক্সটার গায়ে একটা সাদা কাগজ আঠা দিয়ে সাঁটা রয়েছে। কাগজটার ওপর কালো কালিতে লেখা—'সেনাপতি রোমেলের মহাসমর (EPIC = মহাকাব্য। আন্দাজ করা গেল আজ প্রচুর দুর্ভোগ আছে।

কল্যাণ আমার কানে মুখ গুঁজে ফিসফিস করে বলল, 'পরোটা রসগোল্লার ঠ্যালা এবার সামলা।'

'আমি উত্তর দিলাম না।

ঝানু ইতিমধ্যে বাক্সটা মসজিদের সামনে রেখে ফিরে এসেছিল। উমাপতি তাকে বললেন, 'যা, এবার একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ওখানে রেখে আয়।'

চার নম্বর হুকুমটি সুচারু রূপে পালন করার পরঝানু চলে গেল। উমাপতি চাকলাদার এতক্ষণে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। 'এবার একটু কষ্ট করে ওখানে যাওয়া যাক। কিছুক্ষণ কাব্যচর্চা করে সন্ধেটা কাটাই।'

বধ্যভূমিতে পশুদের যেভাবে নিয়ে যাওয়া হয়, অবিকল সেইভাবে উমাপতির পেছন পেছন শোভাযাত্রা করে আমরা ভাঙা মসজিদের সামনের ঘাসের জমিটায় চলে এলাম। কে জানত এটাকে শোভাযাত্রা নয়, শোকযাত্রা বলাই ভালো।

উমাপতি আমাদের দু'জনকে বললেন, 'বোসো, বোসো—'কল্পতরু সমাদ্দারদেরও হাত নেড়ে বসতে বললেন।

এর মধ্যে সূর্য ডুবে গেছে। সন্ধে নামতে শুরু করেছে। চারিদিক ঝাপসা ঝাপসা।

প্রকাণ্ড বাক্সটার ওপর হ্যারিকেনটা জ্বলছে। উমাপতি সেটার ওধারে বেশ আসনপিঁড়ি জাঁকিয়ে বসলেন। এধারে একপাশে কল্পতরু সমাদ্দার আর আমি বসলাম। আরেক পাশে বসলেন রামগোপালবাবু আর নরেশ্বর বাবু।

উমাপতি চাকলাদার কল্যাণ আর আমাকে তাক করে বললেন, 'আমি তোমাদের এখন যা বলব সেসব কল্পতরুবাবুরা জানেন। তোমরা মন দিয়ে শোনো। সবাই বলে এই যুগটা হল লিরিক মানে গীতিকবিতার যুগ। ছোট ছোট প্যানপেনে সব কবিতা। আজকাল নাকি মহাকাব্য লেখা সম্ভব নয়। তার কারণ একালে রাম রাবণের যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, ট্রোজান ওয়ার—এইরকম মহা মহা যুদ্ধ হয় না। কিন্তু আমি বলি মহাকাব্য লেখার মতো প্রচুর মালমশলা আমাদের এযুগেও রয়েছে এই তো কয়েক বছর আগে সারা পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। তাতে পাঁচ কোটি মানুষ মারা গেছে। রামরাবণের যুদ্ধ বা কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ এর তুলনায় তুচ্ছ। রামের মতো, অর্জুনের মতো বীর একালেও রয়েছে।' বলতে বলতে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে গলার পর্দার কণ্ঠস্বর কয়েক পর্দা চড়িয়ে দিলেন, 'যেমন ধর, সেকেন্ড গ্রেট ওয়ারে জার্মান সেনাপতি রোমেল। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সে যে লড়াইটা করেছিল তা অমর করে রাখার জন্যে আমি একটা এপিক লিখেছি। এই মহাকাব্য একশো আট ক্যান্টোতে সাড়ে তিন হাজার পাতায় শেষ হবে। তার মধ্যে আটাত্তরটা ক্যান্টো শেষ করেছি। এখন পর্যন্ত দু'হাজার সাতশো পাতা লেখা হয়েছে। জোর দিয়ে বলছি, পুরোটা লেখা হলে রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড অডিসির মতো শত শত বছর ধরে লোকে তা পড়বে। তা হলে শুরু করা যাক।' কবিতা শুনতে চেয়েছিলাম। উমাপতি চাকলাদার কিঞ্চিৎ গাঁইগুঁই করে তাতেই রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু কবিতা মানে যে সাড়ে তিন হাজার পাতার গন্ধমাদন পাহাড়, তা দেখার মতো দূরদৃষ্টি আমাদের ছিল না। বুকের ভেতর হৃদপিন্ডটা দুরু দুরু করতে লাগল।

কল্পতরু সমাদ্দার প্রবল উৎসাহে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করে দিন। শুভকাজে দেরি করতে নেই।'

উমাপতি টিনের তোরঙ্গটা খুলে মহাকাব্যের ঢাউস পাণ্ডুলিপি বের করে সেটার ওপর রেখে হ্যারিকেনের তেজ বাড়িয়ে পড়তে শুরু করলেন :

'রোমেলের তুল্য বীর ধরাতলে নাই।

মহাকাব্যে তার কথা লিখে দিয়ে যাই।

এমন বীরের কথা যে জন শুনিবে,

দেহে আর মনে সে জন শক্তি লভিবে।

রোমেলের কথা ভাই অমৃত সমান।

দীন উমাপতি ভনে, শুনে জ্ঞানবান।

পাঁচ ছয় পাতা পড়ার পর আচমকা কল্পতরু সমাদ্দার চিড়িক মেরে উঠে পড়লেন। বললেন, 'মাপ করবেন উমাপতিদা, আমি আর বসতে পারছি না। আসানসোল থেকে আমার মেজো জামাইয়ের আসার কথা। এতক্ষণে হয়তো চলেও এসেছে। এমন অমৃতসমান মহাকাব্য শোনা হল না। বড় আপশোশ হচ্ছে। কী আর করব, উপায় নেই। জামাই বলে কথা। যাচ্ছি—' উমাপতিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে তিনি বিদায় নিলেন।

কিছুক্ষণ মুহ্যমানের মতো বসে রইলেন উমাপতি। তারপর নতুন উদ্যমে মহাকাব্য পাঠ শুরু হল।

আরও দশ বারো পাতা পড়ার পর হঠাৎ ভূগোলের টিচার রামগোপাল বাবুর কিছু মনে পড়ে গেল। হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁকপাঁক করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'এই রে, ছেলের জন্যে ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিলাম। এমন চমৎকার মহাকাব্য শুনতে শুনতে একেবারেই মনে ছিল না, আজ আমাকে ছেড়ে দিন উমাপতিদা—'

লক্ষ করলাম পরোটা আলুর দমটম খাওয়ার সময় জামাইয়ের আগমন, ছেলের জন্য ওষুধ ইত্যাদি জরুরি ব্যাপারগুলো কারও মাথায় ছিল না।

যাই হোক পাঁচ শো গ্রাম চিরতার জল খাওয়ার মতো মুখ করে উমাপতি বললেন, 'আপনিও তা হলে চললেন। ঠিক আছে, যান। ছেলের অসুখ হলে কী আর করা যাবে —'

রামগোপালবাবু কী যেন আন্দাজ করে দ্রুত পকেট হাতড়ে দলাপাকানো কাগজ বের করলেন। তাতে কী লেখা আছে, কে জানে। উনি বললেন, 'আপনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করলেন না কিন্তু এই দেখুন প্রেসক্রিপশন।'

উমাপতি বেজায় বিরক্ত হয়ে বিড় বিড় করতে লাগলেন, 'কবেকার প্রেসক্রিপশন, কে জানে। দেখতে চেয়ে আপনাকে বিপদে ফেলব না। আচ্ছা, যান—'

রামগোপাল আর এক সেকেন্ডও দাঁড়ালেন না। সট করে সরে পড়লেন।

উমাপতির বিড়বিড়ানি চলছিল। আপন মনেই বললেন, 'দু'জন খসে গেল। যাক, আরও তিনজন তো আছে। কিন্তু নরেশ্বরটা বদ্ধ কালা, কিছুই শুনতে পায় না। না শুনতে পাক, সে চলে গেলে আসরটা ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাবে। বলেই আবার শুরু করলেন।

'রোমেলের কথা ভাই মহিমায় ভরা

যেজন শুনিতে চাও, চলে এসো ত্বরা।'

শুনতে শুনতে আমার দিকে ঘন হয়ে এসে আবার ফিস ফিস করতে লাগল, 'রোমেলের মহিমা আর কত শুনবি! পরোটা রসগোল্লা টোল্লার মহিমা কেমন সেটা বুঝতে পারছিস।'

কী উত্তরই বা দেব। যা ফাঁদে পড়ে গেছি, কখন যে মুক্তি পাব, কে জানে। চুপ করে রইলাম।

ঝড়ের বেগে মহাকাব্য পাঠ চলছে। চোখে পড়ল বদ্ধ কালা নরেশ্বর নন্দী তারিফের ভঙ্গিতে সমানে মাথা নেড়ে চলেছেন। মহাকাব্য পড়ার শুরু থেকেই তাঁর মাথা ডাইনে—বাঁয়ে সমানে নড়ে চলেছে। তিনি কী শুনতে পাচ্ছেন, তিনিই জানেন। উমাপতি চাকলাদার একজন সমঝদার জুটিয়েছেন বটে।

আশি নব্বই পাতা পড়া হয়ে যাবার পর কলাণ আর আমি উসখুস করতে লাগলাম। এদিকে বেশ রাত হয়ে গেছে। নতুন রক্তের স্বাদ পেয়ে গড়িয়ার দেড় দু'কোটি মশা তখন আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

খুব সহজে উমাপতি চাঁকলাদারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আমরা উঠে দৌড় লাগাব কিনা তার প্ল্যান করছি।

উমাপতি বোধ হয় মুখ দেখে মনের কথা পড়তে পারেন। মহাকাব্য পড়তে পড়তেই নিজের দুই হাত দু'দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আমার আর কল্যাণের হাত বজ্রমুষ্টিতে ধরে ফেললেন। আমরা হাত ছাড়িয়ে নেবার জন্য টানাটানি করতে লাগলাম। কিন্তু ছাড়ানো যাচ্ছে না। উমাপতির হাত আমাদের কবজির ওপর সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে। আমরা প্রাণপণে হাত ছাড়াতে চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছি। এই অবস্থাতেই জেট প্লেনের গতিতে রোমেল চরিত পড়া চলছে।

টানাটানিতে কিভাবে যেন উমাপতির মুঠোটা একটু আলগা হয়ে গিয়েছিল। তারপরেই দেখলাম কল্যাণ আমার পাশে নেই। একটা সাদা ট্রাউজার সামনের কালভার্টের ওপর দিয়ে উল্কার গতিতে উধাও হয়ে গেল। উমাপতি পড়তে পড়তেই বললেন, 'আরও একজন খসে পড়ল।'

আমি এবার কাঁদো কাঁদো মুখ করে বললাম, 'দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। অনেক রাত হয়ে গেছে।'

উমাপতি আমার কান্নাকাটি উড়িয়ে দিলেন, 'কোথায় রাত? সবে সাড়ে সাতটা। এই ক্যান্টোটা শেষ করে নিই। তারপর তোমাকে ছেড়ে দেবো।'

'বাড়িতে খুব বকাবকি করবে। কাল কলেজ আছে।'

'আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। কেউ বকবে না।'

'আপনার সামনে কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু চলে এলেই একটানা বকুনি চলবে। আপনি আমাদের বাড়ির লোকজনকে চেনেন না।'

ঘোর অনিচ্ছায় বেজার মুখে উমাপতি আমাকে ছেড়ে দিলেন। আমি এক দৌড়ে বড় রাস্তায় এসে দেখলাম কল্যাণ দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, 'কলকাতার এদিকটায় আর কখনও আসবি?'

তখন আমি হাঁপাচ্ছি। বললাম, 'নেভার।'

'সব সময় মনে রাখবি, মহাকবি উমাপতি চাকলাদার এখানে থাকেন।

ছ'নম্বর বাস চলে এসেছিল। আমরা উঠে পড়লাম।

এরপর ছ'সাত বছর কেটে গেছে। আমি তখন লেখালেখি শুরু করে দিয়েছি। নামকরা পত্রপত্রিকায় গল্প—উপন্যাস বেরোচ্ছে। দু'তিনটে বইও বাজারে বেরিয়ে গেছে। এই সময় একদিন সার্দান অ্যাভেনিউতে এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি, হঠাৎ পেছন দিক থেকে কাঁধের ওপর কার হাত পড়তেই ঘুরে দাঁড়িয়ে চমকে উঠলাম। অন্য কেউ নয়, স্বয়ং উমাপতি চাকলাদার। হেসে হেসে তিনি বললেন, 'অনেকদিন পর তোমার সঙ্গে দেখা হল। তবে তোমার সব খবরই আমি রাখি। তুমি তো এখন ফেমাস লোক একটু থেমে শুরু করলেন, 'যেখানে যে লেখা তোমার বেরোয়, খুঁজে খুঁজে সব পড়ি। তুমি আমাদের গর্ব।'

বিব্রতভাবে বললাম, 'এসব বললে আমি কিন্তু খুব লজ্জা পাবো।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। সেই যে আমার মহাকাব্য শুনতে শুনতে পালালে, তারপর কতদিন পার হয়ে গেছে বল তো?'

'ছ'সাত বছর হবে।'

'এতকাল পর দেখা। আজ কিন্তু তোমাকে ছাড়ছি না।

আঁতকে উঠলাম। মেরুদন্ডের ভেতর দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল যেন। বুকের ভেতর ধাঁই ধাঁই হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। উমাপতি যখন আমাকে ধরতে পেরেছেন তখন নিশ্চয়ই গল্প উপন্যাস বা মহাকাব্যের বাকি অংশটা শোনাবার মতলব করছেন। চোখের পলকে সারা মুখে অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ ফুটিয়ে বললাম, 'ক'দিন ধরে পেটে অসহ্য পেইন হচ্ছে।' মাঝে মাঝে একটু কমে, তারপরেই চাড়া দিয়ে ওঠে।'

উমাপতি করুণ হেসে বললেন, 'আমাকে দেখলেই সবার মুখে প্রায় এক কথা। তোমার মতো কারও পেটের যন্ত্রণা, কারও বাতের ব্যথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কারও গা ম্যাজমেজ, নার্ভের পেন। আরে বাবা, আমি তোমাকে কিছু শোনাতে চাই না। শুধু তোমার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই।'

এক হিসেবে এটা মন্দের ভালো। অন্তত উমাপতির ভয়াবহ মহাকাব্য বা মহা উপন্যাস শুনতে হবে না। বললাম, 'আচ্ছা একদিন আপনার বাড়ি যাব।

'তোমাকে ছেড়ে দিলে আর গেছ আমার বাড়ি। পরামর্শটা আজই করে নিতে চাই। খুব জরুরি ব্যাপার। চল, চল, লেকের ধারে গিয়ে জুত করে বসা যাক।'

একরকম টেনে হেঁচড়ে উমাপতি আমাকে লেকের পাড়ে নিয়ে গেলেন। পাশে বসে বললেন, 'ছ'সাত বছর পর তোমার দর্শন পেলাম। এর মধ্যে কী কী করেছি সেই খবরটা আগে দেওয়া যাক। আরও ষোলোটা উপন্যাস, তিনটে মহাকাব্য দেড়শো ছোটগল্প লিখেছি। তা ছাড়া আগে যা লিখে রেখেছি তুমি তা জানো।'

তাঁর কথা শুনতে শুনতে চমকে চমকে উঠছিলাম। ঢোঁক গিলে বললাম, 'জানি তো।'

আরেকটু ঘন হয়ে এলেন উমাপতি।' 'তোমার তো অনেকের সঙ্গে জানাশোনা। পাবলিশার আর পত্র—পত্রিকার সম্পাদকরা তোমাকে কত খাতির করে। তাদের বলে কয়ে আমার মহাকাব্য, উপন্যাস, গল্পগুলোর একটা হিল্লে করে দাও।' তুমি তাঁদের বললেই কাজটা হয়ে যাবে।'

তাঁর অমর সৃষ্টিগুলো চোখে দেখামাত্র সম্পাদক আর প্রকাশকদের যে হিক্কা উঠে যাবে তা কি আর জানি না। কিন্তু উমাপতি চাকলাদারের হাত থেকে রক্ষা তো পেতে হবে। চোখ বুজে কয়েকজন বাঘা বাঘা সম্পাদক আর প্রকাশকের নাম গড়গড় করে বলে দিলাম। 'এঁদের সঙ্গে দেখা করবেন—'

'তুমি আমাকে তাঁদের কাছে পাঠিয়েছ, এটা বলব তো? ব্যাকুলভাবে উমাপতি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

আমি একেবারে মরিয়া। 'তাই বলবেন।'

'কাজটা ঠিক হয়ে যাবে তো?'

'গিয়ে দেখাই করুন না।'

'তুমি যখন ভরসা দিয়েছ আর চিন্তা নেই। হা—হা—' উমাপতি চাকলাদার দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে হেসে উঠলেন।

'আমার একটা আর্জেন্ট কাজ আছে', বলে চোখের পলকে উঠে পড়লাম।

পরে ওই সব পত্রপত্রিকার সম্পাদক আর প্রকাশকদের সঙ্গে যখন দেখা হল, তাঁদের সবার গলায় এক সুর—'আপনার সঙ্গে আমাদের তো কোনও শত্রুতা ছিল না ভাই। তা হলে উমাপতি চাকলাদারকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিলেন কেন?'

উমাপতি চাকলাদারের যাবতীয় কীর্তিকাহিনি জানিয়ে দিয়ে বললাম, 'নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এছাড়া আমার আর কিছু করার ছিল না।'

সম্পাদক এবং প্রকাশকরা হো হো করে হাসতে লাগলেন। হাসির তোড় কমে এলে একে একে সবাই জানিয়ে দেন উমাপতির বিশাল বিশাল পাণ্ডুলিপি দেখে তৎক্ষণাৎ তাঁকে বিদায় করে দিয়েছেন।

দেখতে দেখতে আরও কয়েকটা বছর কেটে যায়। আমি এখন একটা নামকরা দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক। সারাদিন ঘাড় গুঁজে নানারকম লেখা পড়ে সেসবের ভেতর থেকে আমাদের কাগজের ছাপার যোগ্য গল্প প্রবন্ধ ইত্যাদি বেছে নিয়ে বাকি সব বাতিল করে দিই।

একদিন অফিসে আমার দপ্তরে বসে কাজ করছি, উমাপতি চাকলাদারের আবির্ভাব ঘটল। এখন তাঁর বেশ বয়স হয়েছে। প্রায় চুয়াত্তর পঁচাত্তর হবে। তাঁর টাকের চারপাশে রেলিংয়ের মতো যেসব চুলের ঘের ছিল তার একটিও কালো নেই। শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে। ছানি কাটানো চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা।

উমাপতি খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন, 'খবর পেলাম তুমি ডেইলি 'নতুন বাংলা' পত্রিকার রবিবারের ম্যাগাজিনের এডিটর হয়েছ। শুনেই লাফাতে লাফাতে চলে এলাম। আহা, ইহ জীবনে এর চাইতে ভালো খবর দু'একটার বেশি পাইনি।'

আমার বুকের ভেতরটা মহা আশঙ্কায় কাঁপতে লাগল। ঢোঁক গিলতে গিলতে বললাম, 'আপনি ভালো আছেন তো?'

'সম্পাদকের দপ্তর, প্রকাশকদের অফিসে লাস্ট পঞ্চাশ বছর ঢুঁ মারতে মারতে জীবনী শক্তি প্রায় ক্ষয়ে গিয়েছিল। বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল অনন্ত হতাশা নিয়ে শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করে এই পৃথিবী থেকে চলে যাব। আজ তোমাকে এখানে

পেয়ে বয়েসটা এক ধাক্কায় চল্লিশ বছর কমে গেছে। কী আনন্দ যে হচ্ছে, বলে বোঝাতে পারব না। টগবগে ইয়াং ম্যানদের মতো উৎসাহ পাচ্ছি।'

ওঁর বয়স চল্লিশ বছর কমে গেছে কিন্তু উনি কি টের পাচ্ছেন আমার বয়েসটা হঠাৎ ষাট বছর বেড়ে গেছে? নির্জীব গলায় বললাম, 'বসুন। চা আনাই?'

ঝপ করে আমার টেবিলের ওধারে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন উমাপতি। বললেন, 'শুধু চা কেন, যা খাওয়াবে তাই খাব।'

বেয়ারাকে দিয়ে চা এবং কাঁচাগোল্লা আনালাম। কলকাতার যে এলাকায় আমাদের অফিস সেটা হল নানা ধরনের মিষ্টির জন্য বিখ্যাত। সন্দেশ, রসগোল্লা, চমচম, কাঁচাগোল্লা, ছানার গজা ইত্যাদি ইত্যাদির নন্দন কাননই বলা যায়।

খেতে খেতে বিপুল উৎসাহে গল্প জুড়ে দিলেন উমাপতি। তিনিই তোড়ে বলে যাচ্ছেন। আমি মরণাপন্ন রোগীর মতো ক্ষীণ গলায় হুঁ হাঁ করে যাচ্ছি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কথার তুবড়ি চালাবার পর একটু থেমে নতুন এনার্জি নিয়ে উমাপতি বললেন, 'তোমার কাছে ভাই অনন্ত আশা নিয়ে এসেছি। তিয়াত্তর বছর বয়েস হল। বিয়ের ক'টা পদ্য ছাড়া আমার লেখা একটি শব্দও ছাপা হয়নি। আমার পাঁচটা লেখার ম্যানাসক্রিপ্ট নিয়ে এসেছি। একে একে আরও নিয়ে আসব। একটু গতি করে দাও ভাই।'

তিনি যে সঙ্গে করে পেল্লায় চটের ব্যাগে তাঁর গল্প উপন্যাস নিয়ে এসেছিলেন আগে লক্ষ করিনি। এবার তিনি ব্যাগটার ভেতর থেকে এক গোছা কবিতা, একটা দেড় কেজি ওজনের উপন্যাস আর কেজি পাঁচেক ওজনের মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি বের করে হাসি হাসি মুখে টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'এগুলো ধারাবাহিক ভাবে তোমাদের কাগজে ছেপে দিও। দেখবে কী আলোড়নটা না পড়ে যায়—' বলে হেলেদুলে তিনি চলে গেলেন।

উমাপতিকে টানা কয়েক বছর পর দেখেই আমার হৃৎকম্প শুরু হয়েছিল। ধাতস্থ হতে পাক্কা আধঘণ্টা সময় লাগল। পাহাড়প্রমাণ পাণ্ডুলিপিগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে বেয়ারাকে বললাম, 'এগুলো ডান দিকের আলমারির মাথায় তুলে রাখো।'

মাস দেড়েক বাদে ফের আমার হৃদকম্পন দশগুণ বাড়িয়ে উমাপতি চাকলাদারের ফের আবির্ভাব ঘটল। বললেন, 'কী হল, আমার লেখা একটা অক্ষরও তো ছাপা হয়ে বেরুল না।'

ইশারা করতে বেয়ারা আলমারির মাথা থেকে সেইসব অবিনশ্বর সৃষ্টি নামিয়ে এনে টেবিলের ওপর রেখে দিল। স্থির দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ সেগুলো দেখলেন উমাপতি। তারপর মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। 'এগুলো মানে—'

কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম, মানে—মানে—

'বুঝতে পেরেছি।' আজও তিনি একটা চটের ব্যাগ নিয়ে এসেছিলেন। মহাকাব্য মহাউপন্যাস ব্যাগে পুরে দরজার দিকে কয়েক পা গিয়ে ফিরে এলেন। বললেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব। ঠিক ঠিক উত্তর দেবে?'

'কী কথা?'

'আমার এই লেখাগুলোর একটা অক্ষরও ছাপার যোগ্য নয়—কী বল?'

কী জবাব দেব, ভেবে পেলাম না। মাথা নীচু করে বসে রইলাম।

'সারা জীবন বোধহয় দিস্তা দিস্তা কাগজ লিখে পণ্ডশ্রমই করে গেলাম।' উমাপতি চাকলাদারের কথাগুলো এবার হাহাকারের মতো শোনালো।

আমি নিরুত্তর। হেঁটমুন্ডেই বসে থাকি। যখন মুখ তুললাম উমাপতি চাকলাদার ঘরে নেই। কখন অদৃশ্য হয়ে গেছেন টের পাইনি। এ জীবনে তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

—

দণ্ডকারণ্যের সেই সন্ন্যাসী

প্রায় ছাপ্পান্ন বছর আগে আমি দণ্ডকারণ্যে যাই। সেই সময় তোমরা যারা এই লেখাটি পড়ছ, তারাই শুধু নও, তোমাদের অনেকেরই বাবা—মায়েরও জন্ম হয়নি।

রামায়ণে দণ্ডকারণ্যের কথা নিশ্চয়ই পড়েছ। এটা সেই দণ্ডকারণ্য। শত সহস্র বছর আগেকার সেই প্রাচীন বনভূমি।

দণ্ডকারণ্য ঠিক কোথায়, সেটা জানিয়ে দিই। আমি যখন গিয়েছিলাম, মধ্যপ্রদেশ তখনও ভাগ হয়নি, যারা ভূগোল পড়েছ রায়পুর শহরটার নাম তাদের জানা। আজকের রায়পুর এক বিশাল নগরী। ছাপ্পান্ন বছর আগে তেমনটি ছিল না। বেশির ভাগ রাস্তাই আঁকাবাঁকা, সরু সরু গলি, ধুলোময়লা এবং খানাখন্দে ভরা। রাস্তার দুধারে আদ্যিকালের সব দালানকোঠা। ছিরিছাঁদহীন। কোথাও বা আবর্জনার ডাঁই। অবশ্য কোনও কোনও মহল্লায় দু—চারটে চওড়া চওড়া তেলতেলে মসৃণ সড়কও ছিল। সেগুলোর দুপাশে চোখধাঁধানো ঝাঁ—চকচকে সব বাড়ি—দোতলা, তেতলাই বেশি। কয়েকটা চারতলা পাঁচতলাও চোখে পড়েছে।

এই রায়পুর শহরটা সেই সময় দক্ষিণ দিকে যেখানে শেষ হয়েছে, তার পর থেকে একটা জাতীয় সড়ক, খুব সম্ভব তেতাল্লিশ নম্বর, কখনও কয়েক মাইল (তখন কিলোমিটার হিসেবে দৈর্ঘ্যপ্রস্থ মাপা হত না) সোজা চলার পর পাহাড়ের চড়াই বেয়ে ওপরে উঠে আবার নীচে নেমেছে, কখনও গভীর জঙ্গল ভেদ করে, ছোট—বড় বহু পাহাড়ি নদীর ওপর ব্রিজ পেরিয়ে এগিয়ে গেছে। যেদিকেই তাকানো যাক, শুধু জঙ্গল, পাহাড়, ঝরনা। এখানকার বেশির ভাগ মাটিই কালচে, পাথুরে।

মধ্যপ্রদেশের পর ওড়িষা, তারপর অন্ধ্রপ্রদেশের অনেকটা অংশ জুড়ে এই দণ্ডকারণ্য। তিন রাজ্য মিলিয়ে যে সুবিশাল বনভূমি তার আয়তন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় তিনগুণ। এতবড় একটা অঞ্চলে মানুষজন বলতে বেশির ভাগই আদিম জনজাতি। সাঁওতাল কোল ভিলদের কথা তোমরা শুনেছ। বা নাগা খাসিয়া গারো মিজোদের কথাও অজানা নয়। তেমনি দণ্ডকারণ্যে রয়েছে গোণ্ড মারিয়া মুরিয়া অবুঝমার ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ তো দণ্ডকারণ্যের পটভূমি। হঠাৎ আমার মাথায় জঙ্গল আর পাহাড়ে ঘেরা এমন একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গায় যাবার ইচ্ছাটা চাড়া দিয়ে উঠল কেন? এই কৌতূহলটা তোমাদের হতেই পারে।

আসলে দণ্ডকারণ্যে আসার তিন বছর আগে আমার প্রথম উপন্যাস ‘পূর্বপার্বতী’ লিখেছিলাম উত্তর—পূর্ব ভারতের নাগা উপজাতির জীবনের নানা খুঁটিনাটি নিয়ে। তোমরা সবাই জানো আমাদের এই বিশাল দেশের নাগাদের মতো অসংখ্য ট্রাইব মানে আদিবাসী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। নাগাদের নিয়ে বইটা লেখার পর এই সব আদিবাসীদের সম্বন্ধে আমার ভীষণ আগ্রহ হয়।

এই সময় হঠাৎ একজন বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক, ইংরাজিতে যাকে বলে অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, তাঁর লেখা একটা বই পড়ে মুগ্ধ হই। তিনি দণ্ডকারণ্যের গোন্ড জনজাতিদের নিয়ে চমৎকার গবেষণা করেছেন। তাঁর বইটা পড়ে ঠিক করে ফেলি গোন্ডদের নিয়ে একটা

উপন্যাস লিখব। কিন্তু এদের সঙ্গে না মিশলে, তাদের সঙ্গে কম করে বছরখানেক না কাটালে তো উপন্যাস লেখা যায় না।

আমি যখন দণ্ডকারণ্যে আসার তোড়জোড় করছি, সেই সময় একটা ঘটনা ঘটল।

তোমরা সবাই জানো উনিশশো সাতচল্লিশে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষকে দু—টুকরো করে একটা অংশ হয় পাকিস্তান, বাকিটা ভারত বা ইন্ডিয়া। এখন যেটা বাংলাদেশ তখন সেটা হয় পূর্বপাকিস্তান। দেশটা ভাগ হয়ে যাবার পর লক্ষ লক্ষ মানুষ বাড়িঘর, জমিজমা ফেলে এপারে চলে আসে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এত উদ্বাস্তু কোথায় থাকবে? এত জমিজমা তো এখানে নেই। তাই তাদের বসতির জন্য অনেককে প্রথমে পাঠানো হচ্ছিল আন্দামানে, তারপর দণ্ডকারণ্যে।

একটি বিখ্যাত খবরের কাগজের সেই আমলে বার্তা সম্পাদক যিনি ছিলেন, তিনি একজন নামকরা কথাসাহিত্যিকও। তাঁকে আমরা তরুণ লেখকরা খুবই শ্রদ্ধা করতাম। দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছি শুনে ডেকে পাঠিয়ে তিনি বললেন, 'নতুন জায়গায় উদ্বাস্তুরা কীভাবে আছে, তাদের জমিটমি ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে কি না, সব ইনফরমেশন জোগাড় করে আমাদের কাগজের জন্যে লিখে পাঠাবে। সপ্তাহে অন্তত দুটো করে লেখা চাই।'

মিন মিন করে বললাম, 'দাদা, আমি গোন্ডদের নিয়ে একটা লেখার জন্যে যাচ্ছি—'

তিনি কষে আমাকে ধমক দিলেন, 'গোন্ডদের চেয়ে উদ্বাস্তুদের ইমপর্টান্স অনেক বেশি। যা বললাম তাই করবে।'

তাঁকে অমান্য করার মতো বুকের পাটা আমার ছিল না।

তখন রোজই বম্বে মেলের চারখানা বগিতে উদ্বাস্তুদের নিয়ে রায়পুরে ট্রেন যেত। রায়পুরে নামার পর ছিন্নমূল মানুষগুলোকে নিয়ে যাওয়া হত দণ্ডকারণ্যে। একদিন আমিও তাদের সঙ্গে বম্বে মেলে চড়ে বসলাম। ভাবনা—চিন্তা থেকে গোন্ডদের ঝেড়ে ফেলতে হল।

যদিও দণ্ডকারণ্য, গোন্ড, উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে এত কথা বললাম, আসল গল্পটা কিন্তু তাদের নয়—সেটা একজন আশ্চর্য সন্ন্যাসীকে নিয়ে। তার কথায় পরে আসছি।

আগেই জানিয়েছি রায়পুর স্টেশন থেকে দক্ষিণ দিকে লম্বা জাতীয় সড়ক কখনও সোজা হয়ে কখনও এঁকেবেঁকে পাহাড়—জঙ্গল ফুঁড়ে চলে গেছে। এই সড়কের দুপাশে তিরিশ —চল্লিশ মাইল পর পর উদ্বাস্তুদের জন্য ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প বসানো হচ্ছিল। ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্পগুলো ঘিরেই উদ্বাস্তুদের বাড়িঘর কলোনি তৈরি হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুহারাদের জন্য দণ্ডকারণ্যের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল তখন সেটিকে বলা হতো ডি এন কে প্রজেক্ট। এর সর্বেসর্বা ছিলেন ফ্লেচার সাহেব। কেরালার খ্রিস্টান। চমৎকার মানুষ। তিনি দণ্ডকারণ্যে প্রজেক্ট ঘুরে দেখার জন্য আমাকে একটা জিপ আর একজন ড্রাইভারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তেলের খরচ, ড্রাইভারের মজুরি সবই প্রজেক্টের তরফ থেকে মেটানো হবে।

দণ্ডকারণ্য তো একটুখানি জায়গা নয়। বলতে ভুলে গেছি অন্ধ্রপ্রদেশকে বাদ দিয়ে ওড়িষা আর মধ্যপ্রদেশের যে সব অঞ্চল জুড়ে দণ্ডকারণ্যের বিস্তার, শুধু সেই অংশেই পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের জন্য তখন নতুন বসতি গড়ে তোলার কাজ চলছে।

বসতি কি একটা—দুটো। অগুনতি। কোনওটাই কাছাকাছি নয়। আগেই জানিয়েছি একটা কলোনি বা ওয়ার্কসাইট ক্যাম্প থেকে আরেকটার দূরত্ব তিরিশ—চল্লিশ কি পঞ্চাশ

মাইল। জিপে চক্কর দিয়ে একদিনে দু—তিনটের বেশি ওয়ার্কসাইটে যাওয়া সম্ভব নয়। সে সব জায়গায় উদ্বাস্তুদের সঙ্গে কথা বলে রিপোর্ট তৈরি করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিই। রাত্তিরে সুবিধামতো কোনও একটা ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পে থেকে যাই।

মাস দুয়েক এইভাবেই চলছিল। হঠাৎ বম্বে থেকে মহেশ চাপেকারের আবির্ভাব। সে আমার চেয়ে বছর চার—পাঁচেকের বড়। বম্বের একটা নামকরা খবরের কাগজের রোভিং রিপোর্টার। ঘুরে ঘুরে তাঁর পত্রিকার জন্য খবর জোগাড় করাই মহেশের কাজ। দণ্ডকারণ্যে যে বনজঙ্গল সাফ করে উদ্বাস্তুদের কলোনি বসছে সেই তথ্য জোগাড় করে রিপোর্ট পাঠাবার জন্য এসেছে।

মহেশ আমুদে, হাসিখুশি, চমৎকার মানুষ। একই ধরনের কাজে আমাদের দণ্ডকারণ্যে যাওয়া। আমি কলকাতা থেকে গেছি, সে এসেছে বম্বে থেকে। গোড়ার দিকে দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টের খুব বেশি গাড়ি—টাড়ি ছিল না। ঘোরাঘুরি করার জন্য প্রজেক্টের কর্তারা আমার সঙ্গেই মহেশকে জুড়ে দিল। অর্থাৎ আমরা এক বাঙালি আর—এক মারাঠি একই জিপে দণ্ডকারণ্যে চক্কর দিয়ে বেড়াব।

মহেশের মধ্যে একটা আপন—করা ব্যাপার আছে। আলাপ—পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

তোমরা যারা এই লেখাটা পড়ছ তারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই অধৈর্য হয়ে উঠেছ। এক সন্ন্যাসীর গল্প শোনাতে গিয়ে কিনা দণ্ডকারণ্য, মহেশ, উদ্বাস্তু, কলোনি—টলোনির মতো হাজার গণ্ডা কচকচানি এসে যাচ্ছে। যাই হোক, যথেষ্ট ভণিতা হয়েছে। এবার সন্ন্যাসীর কথায় আসা যাক। প্রশ্নটা হল তার খোঁজ পেলাম কী করে?

আগেই জানিয়েছি, রায়পুর শহরের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যে জাতীয় সড়কটা দণ্ডকারণ্যের পাহাড়, জঙ্গল—টঙ্গল ভেদ করে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে, সেটা ধরে ওড়িষার দিকে শ'দেড়েক মাইল গেলে কেশকাল পাহাড়।

পাহাড়ের পরিসর অনেকটা এলাকা জুড়ে। কিন্তু মাঝখানের একটা অংশ মোটামুটি গোলাকার। সেখানকার হাইট খুব বেশি নয়, বড়জোর তিনশো—সাড়ে তিনশো ফিট। জাতীয় সড়ক বা ন্যাশনাল হাইওয়েটা কেশকাল পাহাড়ের এই এলাকাটা বেড় দিয়ে ফের দৌড় শুরু করেছে। এখানকার তলার দিকে একটা গুহা ছিল। এখন আছে কিনা জানি না।

সেই গুহায় সারাদিন ধুনি জ্বালিয়ে, যে সন্ন্যাসীর কথা বলছি, সে থাকত। তার বয়স কত জানি না। ষাটের ওপরেই হবে। বেশ তাগড়াই চেহারা। কোমর থেকে গেরুয়া লুঙ্গির মতো বসন হাঁটুর তলা অবধি নেমে এসেছে। শরীরের ওপর দিকটা একদম খালি। মাথায় জটা। ওড়িষার দিক থেকে যত গাড়ি—টাড়ি সড়ক ধরে রায়পুরের দিকে যায় কিংবা রায়পুর থেকে যে সব ওড়িষায় যায়, প্রতিটি যান সন্ন্যাসীর গুহার সামানে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়।

ড্রাইভার থেকে আরোহী সবাই নেমে এসে সন্ন্যাসীর গুহার সামনে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে টাকাপয়সা, ফলমূল, নানারকম মিঠাই রেখে ফের গাড়িতে উঠে চলে যায়। সন্ন্যাসীর এতটুকু হেলদোল নেই। সে টাকাকড়ি, ফলটল বা মিঠাইয়ের দিকে তাকায়ও না, যারা এসব দিচ্ছে তাদের সঙ্গে একটি কথাও বলে না। শুধু নির্বিকার মুখে বসে থাকে।

দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টে উদ্বাস্তুদের ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পগুলো চষে বেড়াতে মহেশ আর আমি কতবার যে এই গুহার সামনে দিয়ে গেছি তার লেখাজোখা নেই। কিন্তু সাধুসন্ন্যাসীতে কখনও মহেশ এবং আমার তেমন একটা ভক্তি ছিল না, আবার অশ্রদ্ধাও নয়। আমরা

একবারও জিপ থামিয়ে গুহার সামনে নামিনি; মাথা ঝুকিয়ে প্রণাম তো করিইনি, কোনওরকম ভেটও দিইনি।

রিফিউজিদের নিয়ে যে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল তার প্রধান অফিসটা ছিল ওড়িষার কোরাপুটে, আর এই পরিকল্পনার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের মূল অফিস ছিল মধ্যপ্রদেশের জগদলপুরে।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে মহেশ আর আমি কোরাপুটে এসেছি। এখানকার একজন বড় অফিসার ছিলেন গিরিজা গাঙ্গুলি। তাঁদের দেশ ছিল পূর্ববাংলার বরিশালে। দেশভাগের আগেই অবশ্য তাঁরা সীমান্তের এপারে চলে এসেছিলেন। বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়, 'তুমি' করে বলতেন। দারুণ আড্ডাবাজ, আমুদে মানুষ। কথায় কথায় সেদিন বললেন, 'সারা দণ্ডকারণ্য প্রজেক্ট তো ঘুরে ঘুরে দেখছ। ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপর কেশকাল পাহাড়ের পাশ দিয়ে নিশ্চয়ই যাতায়াত করেছ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, অনেকবার।'

'ওই পাহাড়ের গুহার ভেতর একজন সন্ন্যাসী থাকে, লক্ষ করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'পাহাড়টার মাথায় একটা বাংলো আছে। সেটা কি নজরে পড়েছে?'

'না। খেয়াল করিনি।'

একটু ভেবে গিরিজা গাঙ্গুলি বললেন, 'দিন কয়েক বাদে পূর্ণিমা। তখন দুটো দিন ওখানে কাটিয়ে দাও। বাংলোর কেয়ারটেকার রঘুবর সিংকে চিঠি লিখে দিচ্ছি। সে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। পূর্ণিমার সময় ওই বাংলোটায় থাকার আলাদা একটা মজা আছে।'

কৌতূহল হল।—'কীসের মজা?'

'গিয়ে থাকোই না। তখন নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে। এমন দৃশ্য জীবনে কখনও দেখার সুযোগ পাবে না।'

বুঝলাম দৃশ্যটি আমাদের গিয়েই দেখতে হবে। গিরিজা গাঙ্গুলি আগেভাগে কিছুই জানাবেন না। ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। আমরা আর কোনও প্রশ্ন করলাম না।

কৌতূহলটা বেড়েই যাচ্ছিল। গিরিজা গাঙ্গুলির চিঠি নিয়ে মহেশ আর আমি কেশকাল পাহাড়ের মাথায় সেই বাংলোয় গিয়ে হাজির হলাম।

বাংলোটা একটু অদ্ভুত ধরনের। গোলাকার। চারপাশে বুক সমান হাইটের ইটের মজবুত দেওয়াল। মাথার ওপর কংক্রিটের ছাদ। চারদিক ঘিরে দেওয়ালের ওপর ছাদ অবধি লোহার গ্রিল বসানো। গ্রিলের এধারে মাঝে মাঝেই কাচের জানলা। জানলা খুললে বাইরের সব দৃশ্যই চোখে পড়ে। জানি না সেই বাংলোটি এতদিন বাদে আদৌ আর আছে কিনা। এই পাহাড় চূড়ার তলাতেই সেই সন্ন্যাসীর গুহা।

গিরিজা গাঙ্গুলির চিঠিটা পড়ে কেয়ারটেকার রঘুবর সিং আমাদের যথেষ্ট খাতির করে ভেতরে নিয়ে গেল।

বাংলোটা খুব একটা বড় নয়। সবসুদ্ধ তিনখানা শোবার ঘর।

দুটো ঘরে দু—একদিনের টুরিস্ট বা গেস্টরা এসে থাকে। তিন নম্বর ঘরটা কেয়ারটেকারের। সেটা তার বেডরুম এবং অফিসও। বেতের সোফা, সেন্টার টেবিল দিয়ে

সাজানো। একটা মাঝারি মাপের ড্রইংরুমও আছে। আর আছে দুটো বাথরুম। কিচেন। রান্না এবং অন্য কাজের জন্য তিনজন লোকও আছে। তারা রাত্তিরে ড্রইংরুমের একধারে শোয়।

আমরা পৌঁছেছিলাম সন্ধের আগে আগে। চারদিকে কেশকাল পাহাড়ের আরও অনেক উঁচু—নীচু চূড়া। যেদিকেই তাকানো যায় শুধুই বনভূমি। বিশাল বিশাল মহাবৃক্ষ তো আছেই। তা ছাড়া মাঝারি, ছোট গাছও অজস্র। আর আছে প্রচুর ঝোপঝাড়।

সমস্ত এলাকাটা একেবারে নিঝুম। ডাইনে—বাঁয়ে সামনে পেছনে ঘন জঙ্গল থেকে একটানা ঝিঁঝিদের ডাক আর মাঝে মাঝে নীচের হাইওয়ে দিয়ে দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টের দু—একটা মোটর বা ট্রাক যাওয়ার শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই।

গাছপালা এবং পাহাড়ের চূড়াগুলোর আড়ালে সূর্য আগেই নেমে গিয়েছিল। আমরা বাংলোয় পৌঁছোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝপ করে সন্ধে নেমে এল।

পাহাড়ের আবহাওয়া বিচিত্র ধরনের। দিনের বেলা যে তাপমাত্রা থাকে, সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে সেটা লহমায় কয়েক ডিগ্রি কমে যায়। অগত্যা মহেশ এবং আমাকে জামাপ্যান্টের ওপর গরম উলের পুল—ওভার চাপিয়ে নিতে হল।

পূর্ণিমা পক্ষ, তাই আকাশে রুপোর থালার মতো গোলাকার চাঁদ। যতদূর চোখ যায়, রুপোলি আলোয় চারিদিক ভেসে যাচ্ছে।

গিরিজা গাঙ্গুলি আমাদের পাঠিয়েছেন। তাই আমরা পৌঁছোবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলোয় তুমুল তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল।

রঘুবর সিংয়ের ইঙ্গিতে একটি কাজের লোক দুজনের সুটকেস, হোল্ড—অলটল দুটো বেড রুমে রেখে এল। রঘুবর বলল, ‘বাবুজি, আপনাদের হোল্ড অল খোলার দরকার নেই। বাংলোয় গেস্টদের জন্যে চমৎকার বিছানার বন্দোবস্ত আছে।’

লক্ষও করলাম দুই ঘরেই পুরু তোশক, বালিশ এবং একজোড়া করে দামি আরামদায়ক কম্বল রয়েছে।

বাথরুম থেকে হাত—মুখটুখ ধুয়ে ড্রইংরুমে এসে বসতেই গরম চা এবং নানারকম ভাজাভুজি চলে এল। সেই কোরাপুট থেকে অনেকটা পথ পাহাড়ি রাস্তার চড়াই—উতরাই ভেঙে এসেছি। গাড়ির ঝাঁকুনিতে হাড়মাংস যেন আলগা হয়ে গেছে। গরম মশলাদার চা শরীরে খানিকটা এনার্জি ফিরিয়ে আনল। নার্ভগুলো বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

রঘুবর একধারে দাঁড়িয়ে আমাদের চা খাওয়ার তদারক করছিল।—’বাবুজি আপনাদের আর কয়েকটা করে আলুর বোন্দা (বড়া) দিতে বলি?’

মহেশ, আমি দুজনেই বললাম, ‘দরকার নেই। অনেক দিয়েছেন। আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।’

আমাদের সামনে কিছুতেই বসবে না রঘুবর। গিরিজা গাঙ্গুলির গেস্টদের তাতে সম্মানহানি হতে পারে বলে তার আশঙ্কা। অনেকবার বলার পর আলগোছে একটা সোফায় বসল সে। বলল, ‘বাবুজিরা, রাত্তিরে খেতে একটু দেরি হবে কিন্তু। লগভগ দশ—সাড়ে দশ বেজে যাবে।’

মহেশ হেসে—হেসে বলল, ‘তা বাজুক। আমরা পত্রকার (সাংবাদিক), রাতে বারোটার আগে খাওয়ার অভ্যাস নেই।’

দণ্ডকারণ্যের ওয়ার্কসাইট ক্যাম্পগুলো ঘুরে ঘুরে উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করে কলকাতার কাগজে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পাঠাচ্ছি, তাই মহেশের ধারণা আমি একজন পত্রকার বা সাংবাদিক। আমি যে আসলে একজন লেখক সেটা সে পরে জেনেছে।

রঘুবর সিং একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে এবার বলল, 'বাবুজিরা, আজ কিন্তু এখানে কষ্ট করে আপনাদের শাকাহারী (নিরামিষ) ভোজন করতে হবে। এখানে ডিম,মাংস, মছলি—টছলি পাওয়া বহুত মুশকিল।'

আমি ডিম—মাংস খাই না, তবে মাছটা খাই। রঘুবরের কথার উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই মহেশ বলল, 'যা হোক খেতে পেলেই হল। শাকাহারী ভোজনে আমাদের আপত্তি নেই।

রঘুবর কৃতার্থভাবে একটু হাসল। বাংলোর অতিথিরা ডিম, মাংস—টাংস না পেয়ে যে অসন্তুষ্ট হবে না, তাতে সে বেশ স্বস্তি বোধ করছে।

রাত সাড়ে দশটার মধ্যেই আমাদের খাবার দেওয়া হল। ঘি—মাখানো গরম গরম চাপাটি, আলুর তরকারি, বেগুনভাজা, ঘন ছোলার ডাল, আচার এবং ক্ষীর (এখানে এক ধরনের পায়েস) দিয়ে বেশ তরিজুত করে খেলাম।

যতক্ষণ খাওয়া চলল, রঘুবর পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মহেশ আর আমি তাকে আমাদের সঙ্গেই খেয়ে নিতে বললাম। কিন্তু সে রাজি হল না। বসতে বললেও এবার বসল না।

খাওয়াদাওয়া শেষ হলে বলল, 'বাবুজিরা এখন শুয়ে পড়বে না। আপনাদের একটা অদ্ভুত জিনিস দেখাতে চাই।'

'কী জিনিস?'

'গাঙ্গুলিসাহেব আপনাদের দেখাতে লিখছেন। ইধর আইয়ে—

আন্দাজ করে নিলাম গিরিজা গাঙ্গুলি কেশকাল পাহাড়ে যে রহস্যময় দৃশ্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অথচ বারবার জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেননি, খুব সম্ভবত মুখ—আঁটা খামের চিঠিতে রঘুবরকে সেটা দেখানোর জন্য লিখে দিয়েছেন। কৌতূহলটা তীব্র হয়ে উঠেছিল।

রঘুবর সিং দেওয়াল জোড়া, গ্রিল বসানো জানলার একটা কাচের পাল্লা খুলে দিল।

পূর্ণিমা রাতে সন্ধের পর থেকে জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। যতদূর চোখ যায় সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাংলোর তলা দিয়ে যে হাইওয়েটা চলে গেছে সেটা একেবারে শুনশান। গাড়ি—টাড়ি মানুষজন কিছুই চোখে পড়ছে না। অক্লান্ত ঝিঁঝিদের ডাক আর মাঝে মাঝে রাতজাগা পাখিদের কর্কশ চিৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

মহেশ বলল, 'কী ব্যাপার সিংজি, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

সিংজি অর্থাৎ রঘুবর বলল, 'থোড়াসা সবুর করুন বাবুজিরা, যা দেখাতে চাইছি ঠিক দেখতে পাবেন।'

আধঘণ্টা ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করার পর সত্যিই দেখা গেল! প্রথম এক ঝাঁক হরিণ জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের জানলার ঠিক নীচে এসে চাঁদের দিকে মুখ তুলে মিহি শব্দ করে নাচের ভঙ্গিতে হুল্লোড় শুরু করল। মনে হল তারা বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে। খানিকক্ষণ নাচানাচির পর হঠাৎ কীসের যেন ডাক শুনে চকিতে কান

খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তেই বিদ্যুৎগতিতে বাঁ—দিকে ঘুরে দৌড় লাগাল।

এতক্ষণ খেয়াল ছিল না, এবার মনে পড়ল, আরে ওখানেই কেশকাল পাহাড়ের সেই সন্ন্যাসীর গুহা। গুহাটা বাংলো থেকে দেখা যাচ্ছে না। হরিণগুলো কি ওখানেই গেল? ঠিক বুঝতে পারছি না।

হরিণরা চলে যাবার পর হাইওয়ে ফের ফাঁকা। দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। মজা করে রঘুবর সিংকে বললাম, 'হরিণ দেখাবার জন্যে কি জানালার কাছে টেনে এনেছেন?'

রঘুবর হসাল।—'নেহি বাবুজি, আরও বহুত চমৎকারি আছে। একটু ওয়েট করুন—'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। নীচের হাইওয়েটা যেন থিয়েটারের মঞ্চ। হরিণের পাল চলে যাবার পর সাত—আটটা বিশাল আকারের পাহাড়ের মতো জংলি মোষ চলে এল। তাদের লম্বা বাঁকানো সিং, চোখের দৃষ্টি হিংস্র। হাইওয়ে থেকে মোষের দঙ্গল আমাদের দেখতে পাচ্ছে ঠিকই কিন্তু আমরা এত উঁচুতে যে ভয়ঙ্কর জন্তুগুলোর কিছুই করার নেই। সামনাসামনি পেলে ওরা সিং দিয়ে আমাদের লহমায় ছিন্ন—ভিন্ন করে ফেলত। কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রচণ্ড আক্রোশে ভোঁস ভোঁস আওয়াজ করে, যে আওয়াজ শুনে হরিণেরা বাঁ—দিকে চলে গিয়েছিল, তারাও চলে গেল। জংলি মোষেদের পর এল বুনো দাঁতাল একদল শুয়োর। তারাও আমাদের কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে চলে গেল।

আমরা যেমন চিড়িয়াখানায় ঘেরা জায়গায় জন্তু—জানোয়ার দেখতে পাই, পূর্ণিমার রাতে দণ্ডকারণ্যের হরিণ—মোষ—শুয়োরেরা তেমনি যেন আমাদের দেখে চলে যেতে লাগল।

এবার এল সাত—আটটা বাঘ। আমাদের দেখতে পাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু আমরা তো তাদের নাগালের বাইরে। লোভনীয় খাবার এত কাছাকাছি। কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না। রাগে গরগর করতে করতে তারা মাঝে মাঝে চারপাশের বনভূমি কাঁপিয়ে গর্জন ছাড়ছিল। তারা চলে যাবার পর আর কোনও জংলি প্রাণী এসেছিল কিনা, এতকাল বাদে আমার আর তা মনে পড়ে না।

আমাদের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল রঘুবর সিং। ঘণ্টা দুই আমরা কেউ কোনও কথা বলছিলাম না। অবাক—করা আশ্চর্য দৃশ্য দেখছিলাম।

রঘুবর সিং বলল, 'আজ আর অন্য কোনও জন্তু আসবে বলে মনে হয় না। বাবুজিরা, এবার আপনারা গিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

আমার মনে একটা ধন্দ দেখা দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'সব পূর্ণিমা পক্ষে কি বনের জন্তু—জানোয়াররা এখানে আসে?'

'তার কোনও ঠিক নেই। অন্য সময়েও আসে। তবে পূর্ণিমা পক্ষে বেশি আসে। অবশ্য—'

'অবশ্য কী?'

'ডাক পেলেই চলে আসে।'

'কীসের ডাক?'

একটু চপ করে রইল রঘুবর। তারপর বলল, 'আমাদের এই বাংলোর তলার গুহার ভেতর এক সাধু—মহারাজ থাকে। সড়ক দিয়ে গাড়িতে যাবার সময় তাকে আপনাদের জরুর নজরে পড়েছে—'

বললাম, 'হ্যাঁ, পড়েছে।'

'ওহী মহারাজই শের—ভালুদের ডাকেন।'

বলে কী লোকটা? মহেশ আর আমি অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

আমরা যে তার কথাগুলো বিশ্বাস করিনি হয়তো রঘুবর তা আঁচ করে নিয়েছিল। বলল, 'আমি সচ বলছি কি ঝুট, কাল সুবেহ একবার সাধুমহারাজকে পুছিয়েগা। সব বুঝতে পারবেন।' একটু থেমে ফের বলল, 'বহুত রাত হুয়া। আজ আর জানোয়াররা আসবে বলে মনে হয় না। আপনারা এবার শুয়ে পড়ুন।'

বাকি রাতটা ভালো ঘুম হল না। রঘুবর যা বলল তা পুরোপুরি বিশ্বাস হচ্ছে না, আবার উড়িয়েও দিতে পারছি না। মনের সে এক অদ্ভুত অবস্থা। বিছানায় এপাশ—ওপাশ অস্থিরভাবে কাটিয়ে দিলাম।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দু'জনে সোজা বাথরুমে। চটপট মুখ—টুখ ধুয়ে বাসি জামাপ্যান্ট পালটে নীচে নামার তোড়জোড় করছি, রঘুবর সিং সামনে এসে দাঁড়াল। আমরা কোথায় যাচ্ছি সে আন্দাজ করে নিয়েছে। বলল, 'সাধু—মহারাজের কাছে যাচ্ছেন বাবুজিরা?'

দুজনেই মাথা নাড়লাম।—'হ্যাঁ—'

'বহুত আচ্ছা। আমি সচ বলেছি কিনা, নিজেদের কানেই শুনে আসুন। তবে চা খেয়ে যান। আমি এখনই ব্যবস্থা করে দিচ্চি।'

'এখন চা থাক। ফিরে এসে খাব।'

'ঠিক হ্যায়। আপনাদের যেমন মরজি।'

হাইওয়ে থেকে চড়াই বেয়ে বাংলোয় উঠতে হয়। নামবার সময় উলটো। উতরাই—এর পথ ধরতে হয়। মহেশ আর আমি জিপে নয়, পায়ে হেঁটেই নীচের হাইওয়েতে নেমে এলাম।

রাস্তাটা শুনশান। এখনও কোরাপুট বা রায়পুরের দিক থেকে মোটর কিংবা ট্রাক চলাচল শুরু হয়নি। গাড়ি—টাড়ি বা ক্বচিৎ কখনও দু—চারজন আদিবাসী গোন্ড, মারিয়া বা মুরিয়াদের দেখা পাওয়া যায় বেলা অনেকটা চড়লে।

নীচে নেমে আমরা বাঁয়ে ঘুরে সন্ন্যাসীর আস্তানার কাছে চলে এলাম। এই পথে যাওয়া—আসার সময় যে দৃশ্য দেখেছি, এখনও ঠিক তেমনটাই চোখে পড়ল।

সাধু গুহার একটু ভেতর দিকে পদ্মাসনে বসে আছে। তার সামনে ধুনি জ্বলছে। যতবার সাধুর গুহার পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছি, কখনও জিপ থামিয়ে তার কাছে গিয়ে কথা—টথা বলিনি। তাই সেভাবে লক্ষ করিনি। চলন্ত গাড়ি থেকে তা সম্ভব ছিল না। এবার চোখে পড়ল, সাধু যেখানে বসে আছে তার দু'পাশে প্রচুর ফল—কলা, আপেল, অম্রত (পেয়ারা), শসা ইত্যাদি। প্রায় স্তূপাকার হয়ে আছে। যাতায়াতের সময় অন্য সব গাড়ি—টাড়ির যাত্রী এবং চালকেরা এসব দিয়ে গিয়েছিল, সেটা আমাদের চোখে পড়েছে। ফল

ছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের মিঠাই—প্যাঁড়া, লাড্ডু, বুন্দিয়া। ফল, মিষ্টি—টিষ্টি বেশিরভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। বোঝা যায় সাধু এসব কিছুই ছোঁয়নি। শুধু কি ফলটলই, অজস্র রুপোর টাকা, আধুলি সিকি এবং পাঁচ দশ টাকার নোটও এধারে—ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। ভক্তদের প্রণামী। কিন্তু সাধু সে সবও স্পর্শ করেনি।

দু—চারজন সাধু—সন্ন্যাসী আগে যে দেখিনি তা নয়। তারা ভয়ঙ্কর রগচটা। অগ্নিশর্মা বলতে যা বোঝায় তা—ই। তাদের ধারেকাছে ঘেঁষার যো নেই। কিন্তু কেশকাল পাহাড়ের এই সন্ন্যাসী একেবারে অন্যরকম। শান্ত, মুখে প্রসন্ন হাসি লেগেই আছে। হিন্দিতে বলল, 'বোসো—।'

গুহার মুখটা মোটামুটি পরিষ্কার। সেখানে মহেশ আর আমি থেবড়ে বসে পড়লাম।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করল, 'এত সুবেহ সুবেহ তোমরা কোত্থেকে এলে?'

জানিয়ে দিলাম।

সন্ন্যাসী বলল, 'কাল একটা জিপের আওয়াজ পেয়েছিলাম। সেটা ওপরের বাংলায় উঠেছি। তোমরাই তা হলে ওই জিপে ছিলে? রাতও ওখানে কাটিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'পুনমের রাতে বনের জন্তু—জানোয়ার দেখতে এসেছিলে?'

অস্বীকার করলাম না।—'হ্যাঁ তাই।'

একটু চুপচাপ।

তারপর মহেশ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কত সাল এই গুহায় আছেন?'

সাধু বলল, 'হোগা বিশ—তিশ সাল। ঠিক মনে নেই।'

'এখানে এত ফল—মিঠাই পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। আপনি কি এসব খান না?'

'না, বেটা। মানুষের ইচ্ছা হয়, দিয়ে যায়। ওসব পড়েই থাকে।'

'আপনি তা হলে কী খান?'

সন্ন্যাসী হাসল। ওপর দিকে আঙুল তুলে বলল, 'উনি যখন যা জোটান তাই খাই।—'

উনি বলতে ঈশ্বর বা ভগবান, সেটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসীর জন্য কী আহারের ব্যবস্থা করেন, সে সম্পর্কে ধন্দ থেকেই গেল। অবশ্য এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করলাম না।

ফের কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর আমি বললাম, 'আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে।'

'হাঁ, হাঁ, পুছো না।—'

'কাল বেশি রাতে নানা ধরনের জানোয়ারের দল একে একে বাংলোর তলায় চলে এসেছিল। হরিণ, বুনো শুয়োর, বুনো মোষ, বাঘ—এমন অনেক। তাদের কেউ যেন ডাকছিল—ওরাও সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আপনার এই গুহার দিকেই এসেছে—'

সন্ন্যাসী হাসল।—'ঠিকই ধরেছ। আমিই ওদের ডেকেছিলাম।'

‘বাঘ, বুনো দাঁতাল শুয়োর, জংলি মোষ—এরা তো ভয়ঙ্কর সব জন্তু। আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, নিজের কাছে ডেকেও নেন। ভয় করে না?’

সন্ন্যাসীর হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।—’কীসের ভয়? ওরাও জীব। আমিও জীব, তোমরাও জীব। আমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে এই পরমাত্মা। শের দেখলে, হিরণ (হরিণ) দেখলে, বুনো ভঁইস দেখলে গোলি (গুলি) করে মারব—এটা ঠিক নয়। বহুত বুরা কাম। পেয়ার করো, ভালোবাসতে শেখো। দেখবে ওরা তোমাদের বন্ধু হয়ে যাবে। এই যে এত সাল আমার এখানে কেটে গেল, শের বলো, জংলি বরা বলো—কেউ কি আমার ক্ষতি করেছে? আমি ডাকলেই ওরা চলে আসে, বিশেষ করে পুনমের (পূর্ণিমার) রাতে। দুনিয়ার সবসে আচ্ছা চিজ হল—পেয়ার, ভালোবাসা। এই কথাটা মনে রেখো।’

এরপর অনেক সাধুসন্ন্যাসী দেখেছি কিন্তু, দণ্ডকারণ্যের সেই আশ্চর্য সন্ন্যাসীর মতো এ জীবনে আর একজনও চোখে পড়েনি।

—

এক উকিল এবং তার এক মক্কেল

শুরু করার আগে পুরনো দিনের কথা একটু বলে নেওয়া যাক। নইলে গল্পটা তেমন জমবে না। তখনও দেশভাগ হয়নি। এপার বাংলা আর ওপার বাংলা মিলিয়ে ছিল আস্ত বাংলাদেশ। সারা পৃথিবী জুড়ে সেই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে।

রন্টুর বয়স তখন দশ কি এগারো। তাদের বাড়ি ছিল অখণ্ড বাংলার ঢাকা ডিস্ট্রিক্টের বিক্রমপুরের বিশাল একটা গ্রামে।

গ্রামের পাশেই ইছামতী নদী। বসিরহাটের গা ঘেঁষে সরু, শীর্ণ আরেক ইছামতী বয়ে গেছে। এই দুই নদী এক নয়। ঢাকা জেলার সেই ইছামতী পদ্মা থেকে বেরিয়ে এসেছে। পদ্মার মতো বিরাট না হলেও তার কাছাকাছি। বহুদূরে পেনসিলের আবছা আঁচড়ের মতো এপার থেকে ওপারটা মনে হত। এই ইছামতীর মাঝামাঝি ছিল বড় বড় চার—পাঁচটা চর। কোনও চরই ফাঁকা নয়। সব ক'টাতেই টিন বা খড়ের চালের বাড়িঘর বানিয়ে প্রচুর মানুষজন থাকত। চারপাশে জল, মধ্যিখানে বসতি।

রন্টুদের গ্রাম থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে ছিল মস্ত এক গঞ্জ। সেখানে বিস্তর দোকানপাট, ধান—চাল—পাটের আড়ত, ডাক্তারখানা, কবিরাজখানা, তা ছাড়া সরকারি নানা অফিস, আদালত আর ছিল স্টিমারঘাটা, লঞ্চঘাটা, কেরায়া নৌকো আর গয়নার নৌকোর ঘাট। সকাল থেকে সন্ধে অবধি এলাকাটা গমগম করত।

এখানে যে গয়নার নৌকোর কথা বলা হল সেটা আসলে কী? স্টিমার বা লঞ্চ যেমন অনেক প্যাসেঞ্জার নিয়ে নানা জায়গায় পাড়ি দেয়, গয়নার নৌকোও অনেকটা সেইরকম। বিপুল আকারের নৌকোগুলো তিরিশ— চল্লিশজন করে যাত্রী তুলে যে যেখানে যাবে সেখানে পৌঁছে দিত। কাছাকাছি কোথাও গেলে ভাড়া কম, দূরে গেলে ভাড়া বেশি।

ফি রবিবার গঞ্জের লাগোয়া প্রায় সিকি মাইল জায়গা জুড়ে হাট বসত। সেদিন চারপাশের পঁচিশ—তিরিশটা গ্রাম আর ইছামতীর চরগুলো থেকে হাজারে হাজারে মানুষ নৌকোয় চেপে হাটে চলে আসত। গঞ্জের সামনের দিকটা শ'য়ে শ'য়ে নৌকোয় ছেয়ে যেত। অন্য দিনের চেয়ে হাটের দিনে গঞ্জে দশ—বিশগুণ মানুষের ভিড়। তাই হইচইও বেশি। দু—আড়াই মাইল দূর থেকে লক্ষ কোটি মাছির ভনভনানির মতো সেই আওয়াজ শোনা যেত।

রবিবারের হাটের দিন রন্টুকে নিয়ে তার দাদু নৌকোয় চড়ে নানা জিনিসপত্র কেনাকাটার জন্য গঞ্জে যেতেন। রন্টুকে সঙ্গে না নিয়ে উপায় ছিল না। কেননা সে তো আর শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকটি নয়। না নিয়ে গেলে তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে।

গঞ্জে দেদার মজা। সেখানে গাজি—বেকারির কেক পাওয়া যায়। শুধু কি কেক, কলকাতার ব্রিটানিয়া কোম্পানির বিস্কুট, লজেন্স ছাড়াও আসে 'দেব সাহিত্য কুটির'—এর প্রহেলিকা আর কাঞ্চনজঙ্ঘা সিরিজের নতুন নতুন ডিটেকটিভ গল্পের বই। কেক বিস্কুট লজেন্স তো বটেই, তার চেয়ে বেশি করে চাই দমবন্ধ—করা গোয়েন্দা কাহিনি। সেই সঙ্গে দেশ—বিদেশের ভ্রমণের গল্পের বই পাওয়া গেলে রন্টু আহ্লাদে একেবারে ডগমগ। সেসব কিনে না দিলে দাদুর নিস্তার নেই।

এক রবিবার রন্টুরা গঞ্জে গেছে। আদালতে দাদুর জরুরি কিছু কাজ ছিল। তাই নৌকো থেকে নেমে রন্টুকে নিয়ে তিনি সোজা সেখানে চলে গেলেন। হাটের কেনাকাটা পরে হবে। হলুদ রংয়ের লম্বা একটা দালানে ছিল কোর্ট। বিল্ডিংটার ভেতরে তিনটে দেওয়াল তুলে তিনটে বড় বড় কামরায় ছিল তিনজন ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাস। বাকি চার নম্বর কামরাটায় সাব—রেজিস্ট্রি অফিস।

কোর্টের সামনের দিকে একশো বছরের প্রাচীন এক বটগাছ। সেটার ডালপালা থেকে কত ঝুরি যে নেমেছে তার লেখাজোখা নেই। বটগাছের তলায় বারো—চোদ্দোটা বেঞ্চি পাতা। সেগুলো উকিলদের সেরেস্তা। কোর্টে মামলা না থাকলে মক্কেলদের নিয়ে সেখানে বসত তারা। সেরেস্তাগুলো থেকে একটু দূরে বটগাছের তলাতেই তিনটে মিষ্টির দোকান। রাজভোগ, মোহনভোগ, মাখা সন্দেশ, পান্তুয়া ছাড়াও বাখরখানি ওই দোকানগুলোতে পাওয়া যেত।

বটগাছটার পর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর ইছামতীর পাড় ঘেঁষে গয়নার নৌকোর ঘাট।

দাদু রন্টুকে নিয়ে বটগাছের তলায় চলে এলেন। সেখানে ভিড় কম। তিন—চারজন উকিল তাদের মক্কেলদের নিয়ে এধারে—ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে কথা বলছে। অন্য উকিলরা নিশ্চয়ই আদালতে মামলা করতে গেছে।

রন্টুর দাদু তাঁদের গ্রাম তো বটেই, চারপাশের তিরিশ—চল্লিশটা গ্রামের সবচেয়ে বয়স্ক মানুষদের একজন। সেই সময় মানুষের আয়ু বেশি হত না। বড়জোর ষাট—পঁয়ষট্টি। দাদু তখন ষাট, সত্তর পেরিয়ে তিয়াত্তরে পা দিয়েছেন। তিনি ছিলেন খুবই জ্ঞানী মানুষ, সেই আমলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। চারদিকে গ্রামের মানুষজন তাঁকে চিনত, সমীহ করত।

বটগাছের তলায় যে উকিলরা বসে ছিল, সবাই দাদুকে দেখে হাতজোড় করে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বলতে লাগল, 'প্রণাম প্রণাম বড়কর্তা, মেলা দিন পর এহানে আপনের পায়ের ধূলা পড়ল। লগে নাতিরেও দেখতে আছি। বহেন বহেন।' গ্রামগঞ্জের মানুষ যাদের সঙ্গে মা সরস্বতীর একটু আধটুও সম্পর্ক আছে তারা তাঁকে বলত 'বড়কর্তা', আর যারা বর্ণপরিচয়ের একটি অক্ষরও চোখে দেখেনি তাদের কাছে তিনি 'বড়কত্তা'।

ওদিকে উকিলদের মক্কেলরাও উঠে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

রন্টু আগেও বেশ কয়েকবার দাদুর সঙ্গে আদালতে এসেছে। এখানকার সব উকিলকেই সে চেনে, নামও জানে। যে তিন—চারজন এখন বটগাছের তলায় রয়েছে, চুপচাপ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

দাদু বলছিলেন, 'না রে, আজ আর বসার সময় হবে না। একটা দরকারি কাজ সেরে আমাকে হাটে দৌড়োতে হবে। অনেক কিছু কেনার আছে। সেসব সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে যাবে। আরেক দিন তোদের সঙ্গে বসে গল্প করব।' তাঁর চেয়ে বয়স যাদের কম, তিনি তাদের 'তুই' করে বলতেন। সেটা তাদের ছোট বা তুচ্ছ করার জন্য নয়, তাঁর বলাটার মধ্যে স্নেহ মাখানো থাকত।

নেংটি ইঁদুরের মতো শুঁটকো চেহারার একটা উকিল, নাকের তলায় খাড়া খাড়া কাঁচা—পাকা গোঁফ, চোখে নিকেলের গোল চশমা, পরনে ছাই ছাই রংয়ের কোট—প্যান্ট, পায়ে বাটা কোম্পানির আদ্যিকালের ফিতে—বাঁধা ফ্যাকাসে কেডস—নাম তার নিশিকান্ত

সাহা রায়। দাদুর সঙ্গে রন্টু যখনই কোর্টে এসেছে, অবিরল এই পোশাকেই তাকে দেখা গেছে। কোট—প্যান্ট একসময় কুচকুচে কালো আর কেডস জোড়া ধবধবে সাদাই ছিল হয়তো। রং উঠে উঠে এখন সেগুলোর ওই দশা।

নিশিকান্ত বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে দাদুর কাছে চলে এল। তড়বড় করে বলল, 'আপনে বহেন তো বড়কর্তা। কী কাম আমারে হুদা ক'ন। অহনই কইরা দিতে আছি।' তার গলার স্বরটা ক্যানকেনে, ফাটা কাঁসর বাজালে যেমন আওয়াজ বেরোয় অনেকটা সেইরকম।

দাদু বললেন, 'না না, তোকে দিয়ে হবে না। সাব—রেজিস্ট্রি অফিস থেকে আমাকেই গিয়ে সই করে দুটো রসিদ নিতে হবে। তুই একটা কাজ কর—'

'ক'ন ক'ন কী করতে হইব?'

'আমার এই নাতি রন্টুকে চিনিস তো?'

'চিনুম না?' কত ছোট থিকা দেখতে আছি। জবর ভালা পোলা।'

দাদু চোখ কুচকে বললেন, 'ভালো ছেলে! একেবারে হাড় বিচ্ছু। আমি রেজিস্ট্রি অফিসের কাজটা সেরে আসি। ততক্ষণ রন্টুকে তোর কাছে রাখ। এক মুহূর্তও স্থির হয়ে বসে থাকার পাত্র নয়। কখন যে ওর মাথায় কী খেয়াল চাপবে, কেউ জানে না। হুট করে হয়তো কোনও দিকে টহল দিতে বেরিয়ে গেল—'

'চিন্তা কইরেন না বড়কর্তা। রন্টু তেমুন কিচ্ছু করব না। আমার পাশে অরে বহাইয়া রাখুম। আপনে ঘুইরা আহেন।'

দাদু আর দাঁড়ালেন না, সোজা কোর্ট বিল্ডিংটার দিকে চলে গেলেন। অন্য যে উকিলরা ছিল তারা একে একে নিজেদের মক্কেলদের সঙ্গে করে দূরের বেঞ্চিগুলোতে গিয়ে বসল।

নিশিকান্ত রন্টুকে বলল, 'বহো, বহো—' তাকে বেঞ্চিতে বসিয়ে পাশে বসতে বসতে একটা খাবারের দোকানের দিকে গলা বাড়িয়ে তার মার্কামারা ক্যানকেনে গলায় হাঁকল, 'মহেশ, বড়কর্তার নাতির লেইগা দুইখান বাখরখানি, দুইখান রাজভোগ আর একদলা মাখা সন্দেশ পাঠাইয়া দে—'

একটু পরেই একটা অল্পবয়সি ছোকরা পদ্মপাতায় বাখরখানি আর মিষ্টিগুলো সাজিয়ে এনে দিয়ে গেল।

নিশিকান্ত বলল,'খাও রন্টু, আমি এয়ার লগে একটু কথা কই—'

রন্টু আগেই লক্ষ করেছিল, একটা লোক, বয়স চল্লিশ—বেয়াল্লিশ হবে, নিশিকান্ত উকিলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। ভিজে বেড়ালের মতো চেহারা। গোল গোল চোখ, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। গায়ের চামড়া খসখসে। পরনে আধময়লা ধুতির ওপর ফতুয়া। খালি পা। দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। লোকটা যে নিশিকান্ত উকিলের মক্কেল তা বোঝা যাচ্ছিল।

রন্টু পদ্মপাতায় সাজানো রাজভোগে মনোনিবেশ করেছিল ঠিকই, তবে তার চোখ দুটো ছিল নিশিকান্ত উকিল আর তার মক্কেলটির দিকে।

মক্কেল বলল, 'উকিলবাবু, বড়কত্তায় তো রেজিস্টারি অফিসে চইলা গ্যাছেন, এইবার কী কইবেন ক'ন।'

নিশিকান্ত ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কয়বার কইতে হইব—অ্যাঁ?'

রন্টুর মুখে রাজভোগ, কিন্তু চোখ আর কানদুটো শুঁটকো উকিল আর তার মক্কেলের দিকেই রয়েছে। বুঝতে পারছিল তারা গঞ্জে আসার আগে কোনও ব্যাপারে দু'জনের কথাবার্তা চলছিল। ফের সেটা শুরু হয়েছে।

এবার মক্কেলটি মাথা নীচু করে খুব মনোযোগ দিয়ে ঘাড় চুলকোতে লাগল।

একদৃষ্টে কয়েক লহমা তার দিকে তাকিয়ে রইল নিশিকান্ত। চশমার ওধারে চোখ দুটো যেন জ্বলছে। আচমকা তার গলার ভেতর থেকে বাজ পড়ার মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল —'হারামজাদা চৈতন পাল—' বলেই চিড়িক মেরে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা নাচাতে লাগল, 'ট্যাকা, ট্যাকা, ট্যাকা বাইর কর।'

আস্তে আস্তে মাথা তুলল চৈতন। চোখ পিট পিট করতে করতে ঢোঁক গিলে মুখটা বেজায় করুণ করে বলল, 'বড়কত্তারা আহনের আগে আপনেরে চাইর ট্যাকা দিছি না?'

মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে মুহুর্মুহু গর্জন ছাড়তে লাগল, নিশিকান্ত।—'তিন তিন বার তর মামলা লইয়া জজসাহেবের এজলাসে চিল্লাইয়া চিল্লাইয়া গলা ফাইড়া ফালাইছি। হাররা মামলা অহন জিতার মুখে। একেক দিন কোর্টে উঠলে আট ট্যাকা কইরা আমার ফি। তাইলে তিনদিনের পাওনা হইল তিন আষ্টে চব্বিশ ট্যাকা। সিধা হিসাব। আগে দিছস সাত ট্যাকা, আইজ পাইছি চাইর ট্যাকা। একুনে এগারো ট্যাকা। বাকি তেরো ট্যাকা বাইর কর।' তার হাতটা আরও জোরে জোরে নড়তে লাগল।

ভীষণ মুষড়ে পড়ল চৈতন।—'উকিলকত্তা, আমার কাছে আর ট্যাকা নাই। জজসাহেবের এজলাস থিকা বাইর হওনের সোমায় কইছিলেন একমাস পর ফির মামলার তারিখ পড়ছে। হেই দিন আপনের পুরা ট্যাকা মিটাইয়া দিমু। বিশ্বাস করেন, মা রক্ষাকালীর কিরা।'

'রক্ষাকালীরে টানাটানি করিস না। এইর আগেও তো তেনার নামে দশবার কিরা কাটছস কিন্তু দিছস কি? আইজ কোনও কথা শুনুম না, ট্যাকা বাইর কর—'

কাঁচুমাচু হয়ে হাতজোড় করে চৈতন পাল বলল, 'যে চাইরডা ট্যাকা আছিল আপনেরে দিয়া দিছি। আমার কাছে আর কিচ্ছু নাই। মা রক্ষাকালী থাউক, মা দুগগা, মা লক্ষ্মী, মা বিষহরি, মা নাটাই চণ্ডী, বাবা ভোলানাথ, বম্মা, বিষ্ণু—হগগল দেব দেবীর নামে কিরা কাটতে আছি, পরের মাসের মামলার দিন সব মিটাইয়া দিমু—'

কী ভেবে এবার আর হুঙ্কার ছাড়ল না নিশিকান্ত উকিল। অনেকক্ষণ তার মক্কেলের পা থেকে মাথা অবধি নিরীক্ষণ করল। তারপর খুব নরম গলায় বলল, 'চৈতন পাল, একবার আমার কাছে আয়—'

চৈতন অবাক।—'আমি তো কাছেই আছি—'

'আরও কাছে—'

'ক্যান কত্তা, আরও কাছে যামু ক্যান?'

'তর লগে এট্টু কোলাকুলি করুম। আয়—

হতভম্বের মতো এগিয়ে এল চৈতন। নিশিকান্ত উকিল বলল, 'ক্যান এত কাছে ডাকলাম, কিছু বুঝলি?'

আস্তে আস্তে মাথাটা ডাইনে—বাঁয়ে নাড়ল চৈতন পাল। তার মানে বোঝেনি।

'এইবার বুঝবি। তর জামা কাপড়গুলান এট্টু ভালা কইরা দেখুম।'

চৈতন এতক্ষণ সিঁটিয়ে ছিল। এবার একগাল হেসে বলল, 'দ্যাখেন দ্যাহেন। আমার আপত্তি নাই।'

নিশিকান্ত চৈতনের ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু চারটে পকেটে একটা সিকি—আধলাও পাওয়া গেল না। সব ফাঁকা। সে জানে তার মক্কেলটি সোজা সরল ব্যক্তি নন, অতি ধুরন্ধর। নিশিকান্ত তার বুকে চাপড় মেরে মেরে বুঝতে চেষ্টা করল, জামার ভেতর লুকোনো টাকার থলি টলি আছে কিনা। না, নেই। তার হাত এবার একই কায়দায় সারা পেটে তল্লাশি চালাল। না, সেখানেও কোনও কিছুর হদিস পাওয়া গেল না।

রন্টুর খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চোখদুটো গোলাকার করে সে উকিল আর মক্কেলের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। লক্ষ করল, নিশিকান্তর মুখচোখ রাগে গন গন করছে কিন্তু চৈতন্যের মুখে সেই হাসিটি লেগেই আছে।

নিশিকান্ত সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। তার হাত এবার মক্কেলের তলপেটে নেমে এল।

চৈতন আঁতকে উঠল, 'করেন কী উকিল কত্তা, করেন কী! আর নীচে নাইমেন না।'

হুঁশ ফিরে এল নিশিকান্তর। সত্যিই তো, আরও নীচে হাত নামালে সেটা ভীষণ বিশ্রী ব্যাপার হবে। অগত্যা ক্ষান্ত দিতে হল। তবে আশা ছাড়ল না উকিলবাবু, দুই হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'পিছন ফিরা খাড়া—'

আদেশ পালিত হল। পেছন ফিরে দাঁড়াল চৈতন। নিশিকান্ত বুক—পিঠের মতো তার সারা পিঠেও হাত চালাল। না, গুপ্তধন সেখানেও নেই।

ওদিকে ইছামতীর গয়নার নৌকোর ঘাট থেকে মাঝিরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি শুরু করেছে, 'যেনারা যেনারা চরবেগুলা, চরলখিন্দর, চরইসমাইল, চরবাসন্তীতে যাইবেন, চইলা আহেন, আহেন। নাও অহনই ছাইড়া দিব। আহেন আহেন—'

চৈতন ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। সে রীতিমতো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বলল, 'উকিলকত্তা, খুজাখুজি তো মেলা করলেন। চরের নাও ছাইড়া দিলে পরের নাও—এর লেইগা আমারে গঞ্জে তিন—চাইর ঘণ্টা বইয়া থাকতে হইব। হুকুম করেন, আমি চইলা যাই। চিন্তা নাই, আপনের ট্যাকা মাইর যাইব না। কড়ায় গণ্ডায় মিডাইয়া দিমু। অ্যালা যাই কত্তা?'

এত করেও কিছু মিলল না। নিশিকান্ত উকিল হতাশ হয়ে পড়েছে। চিরতা—গেলা মতো মুখ করে বিরস গলায় বলল, 'যা তাইলে—' সে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে।

রণ্টু বুঝতে পেরেছে চৈতন পাল ইছামতীর কোনও একটা চরে থাকে।

চৈতন বলল, 'পন্নাম উকিলকত্তা—' বলেই লম্বা লম্বা পায়ে গয়নার নৌকোর ঘাটের দিকে হাঁটা দিল। বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে সে, আচমকা নিশিকান্ত উকিলের দুচোখে যেন ঝিলিক খেলে গেল। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে ডাকতে লাগল, 'এই চৈতন, চৈতন, যাইস না, যাইস না—'

চৈতন থমকে গেল। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ডাকেন ক্যান কত্তা?'

'একহান কথা শুইনা যা—'

'নাও ছাইড়া দিব।'

'ছাড়ব না। মাঝিরা আধাঘণ্টা চিল্লাচিল্লির পর নাও ছাড়ে। আমার কথাহান কইতে তিন মিনিটও লাগব না। আয়—আয়—'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল চৈতন। বলল, 'ক'ন উকিলকত্তা—'

'আরেকবার পিছন ফিরা খাড়া দেহি।'

'ক্যান কত্তা, ক্যান?'

'যা কই তাই কর—'

ধন্দ—ধরা মানুষের মতো একবার নিশিকান্তর দিকে তাকিয়ে পেছন ফিরল চৈতন।

নিশিকান্ত বলল, 'তর সারা গায়ে তালাশ করছি, খালি কাছাডা দেখা হয় নাই।'

'না, না—' গলা ফাটিয়ে চিক্কর ছেড়ে তিন—চারটে পাক খেয়ে ভিরমি খেতে খেতে কোনওরকমে সামলে নিল চৈতন।—কাছায় হাত দিয়েন না উকিলকত্তা, হাত দিয়েন না—'

কে কার কথা শোনে। নিশিকান্ত ততক্ষণে চৈতনের কাছাটা টেনে খুলে হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছে। মুহূর্তে সেটার ভেতর থেকে একটা ছোট কাপড়ের থলি বের করে বলল, 'এইডা কী?'

চৈতন চেঁচাতে লাগল, 'খুইলেন না উকিলকত্তা, খুইলেন না। ওইডার ভিতরে কিছু নাই—'

তার কথা কানেই তুলল না নিশিকান্ত সাহা রায়। মুহূর্তে থলির মুখটা খুলে তার ভেতর থেকে বের করে আনল ষষ্ঠ জর্জের ছবিওয়ালা আটটা রুপোর টাকা, কিছু সিকি, আধুলি, দু—আনি আর তামার পয়সা।

তখন ইংরেজ রাজত্ব চলছে। সেই আমলে পূর্ব বাংলার গ্রামেগঞ্জে কাগজের নোট ক'টাই বা দেখা যেত! কাজ কারবার চলত রুপোর টাকা, সিকি আধুলি—টাধুলি দিয়ে।

হাতের ভেতর টাকাগুলো নাচাতে নাচাতে নিশিকান্ত বলল, 'কী রে চৈতন, তুই তো কইছিলি কিছু নাই, তাইলে এগুলি কী?'

চৈতন হাহাকার করে উঠল, 'নিয়েন না, নিয়েন না, আমি এক্কেরে পথে বইয়া যামু।'

নিশিকান্ত উত্তর দিল না। দুই ঠোঁটের ফাঁকে হালকা একটু হাসি ফুটিয়ে টাকাগুলো কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

চৈতনের হাহাকার চলছেই।—'মইরা যামু কত্তা, এক্কেরে মইরাই যামু—'

নিশিকান্তকে গলানো গেল না। বলল, 'নিজের বড় টেটন ভাবছিলি। কাছায় ট্যাকাপয়সার থইলা গুইজা পার পাইয়া যাবি, কেমুন? ঘুঘু দেখছ, ফান্দ দেখো নাই, তুমি যাও ডাইলে ডাইলে, আমি যাই পাতায় পাতায়। যা ভাগ—'

চৈতনের নড়ার লক্ষণ নেই।

গয়নার নৌকোর মাঝিদের হাঁকাহাঁকি চলছেই। নিশিকান্ত বলল, 'কী রে, অহনও খাড়াইয়া অছিস যে!' নাও তো ছাইড়া দিব।'

বারকয়েক ঢোঁক গিলে চৈতন কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, 'উকিলকত্তা, আপনে তো আমার সব্বস্ব কাইড়া নিলেন। চরে ফিরুম কেমনে? এউক্কা পয়সাও তো নাই। নাও ভাড়া

দিমু কই থিকা?’

নিশিকান্ত উকিলের হয়তো একটু করুণাই হল। পকেট থেকে একটা সিকি (এখনকার পঁচিশ পয়সা) বের করে ছুড়ে দিল। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে গয়নার নৌকোর ঘাটটার দিকে চলে গেল চৈতন।

আর নিশিকান্ত সাহা রায় এবার রন্টুর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞেস করল, ‘নাতিবাবু, কিছু বুঝলা?’

মিটিমিটি হাসতে হাসতে রন্টু বলল, ‘সবই বুঝেছি। খুব ভালো একটা ম্যাজিক দেখালেন।’

দাঁত বের করে হাসতে লাগল নিশিকান্ত উকিল।

—

অন্য ভারতবর্ষ

আমার বন্ধু মহেশ চাপেকারের কথা আগেও লিখেছি। এবারও লিখছি।

প্রায় ষাট বছর আগে কলকাতা থেকে দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলাম। মহেশ এসেছিল মুম্বই থেকে।

তখন দণ্ডকারণ্যের নানা এলাকায় পাহাড় এবং সমতলের গভীর জঙ্গল কেটে জমি বের করে সেই সময়ের পূর্ব পাকিস্তান থেকে উৎখাত হয়ে আসা সর্বস্ব—হারানো মানুষদের জন্য ঘরবাড়ি বানিয়ে কলোনি বসানো হচ্ছিল। দেশ ছেড়ে চলে আসার পর দণ্ডকারণ্যই হবে তাদের নতুন আশ্রয়, নতুন দেশ।

জমি—টমি দিয়ে পুনর্বাসনের জন্য ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছে, আমি প্রায় সব জায়গায় গেছি। কেন গিয়েছিলাম এই গল্পের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।

মহেশ ছিল মুম্বইয়ের একটা নামকরা ইংলিশ ডেইলির রোভিং রিপোর্টার। তার কাজ ছিল দেশের নানা জায়গায় ঘুরে তার পত্রিকার জন্য জরুরি সব খবর জোগাড় করা। তখন উদ্বাস্তুদের নিয়ে সারা দেশ তোলপাড়। দণ্ডকারণ্যে ছিন্নমূল মানুষদের পুনর্বাসনের খবরটা পেয়ে সে সেখানে চলে এসেছে।

মহেশ এক আশ্চর্য মানুষ। তার মধ্যে এমন—একটা আপন—করা ব্যাপার আছে যে ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দু—এক ঘণ্টার ভেতরে আমরা বন্ধু হয়ে যাই।

মধ্যপ্রদেশ (তখনও ভাগ হয়নি), ওড়িষা এবং অন্ধ্রের অনেকটা করে অংশ নিয়ে দণ্ডকারণ্যের বিস্তার। পুনর্বাসনের জন্য অন্ধ্রকে বাদ দিয়ে ওড়িশা আর মধ্যপ্রদেশের যে অংশ ঠিক করা হয়েছে তা প্রায় পশ্চিমবঙ্গের দ্বিগুণ। সরকারি এই পরিকল্পনাকে বলা হতো ডি এন কে প্রোজেক্ট, বা দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্ট।

কলোনিগুলো বসানো হচ্ছিল পঁচিশ—তিরিশ মাইল দূরে দূরে। পুনর্বাসন অফিস থেকে মহেশ আর আমাকে একটা গাড়ি আর ড্রাইভার দেওয়া হয়েছিল। সেই গাড়িতে রোজ মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে আমরা দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু কলোনিগুলোতে চলে যেতাম।

একদিন কেশকাল পাহাড়ের কাছাকাছি চার—পাঁচটা কলোনিতে ঘোরাঘুরি করে অনেকটা সময় কেটে গেল। সন্ধে পার হয়ে গেছে।

আমাদের যেতে হবে মানা ট্রানজিস্ট সেন্টারে। সেখান থেকে সাত—আট মাইল দূরে রায়পুর শহর।

সেই সময় প্রায় রোজই কলকাতা থেকে মুম্বাই মেলের তিন—চারটে কামরা বোঝাই করে উদ্বাস্তুদের দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হচ্ছিল। রায়পুর স্টেশনে তাদের নামিয়ে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হত মানা ট্রানজিস্ট সেন্টারে। সেখানে একদিন রেখে পাঠিয়ে দেওয়া হত দণ্ডকারণ্যের নানা এলাকায়, উদ্বাস্তুদের জন্য নতুন নতুন উপনিবেশগুলিতে।

একটা রাত সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে আমরা কোরাপুটের পথ ধরব। ওড়িষার ওই অঞ্চলে যে কলোনিগুলো বসানো হচ্ছিল, আমার দেখা হয়নি। সেখানে না গেলে কি চলে?

দণ্ডকারণ্য এক সৃষ্টিছাড়া জায়গা। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে ঝপ করে এখানে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে।

একটা আঁকাবাঁকা, পাক খেতে খেতে যাওয়া পাহাড়ি রাস্তার ওপর দিয়ে চলেছি; সেটার দু—ধারে মাঝে মাঝেই খাদ। তার পর উঁচু উঁচু পাহাড়, ছোট ছোট টিলা আর আছে বিশাল বিশাল গাছ। এই ভর সন্ধেবেলায় সব কেমন যেন ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে। যেখানে খাদ নেই, আমাদের রাস্তাটার গা থেকে সরু সরু অনেক রাস্তা বেরিয়ে গভীর জঙ্গল আর পাহাড়—টাহাড় ভেদ করে কোথায় কোন দিকে চলে গেছে, কে জানে।

আমরা চলেছি তো চলেইছি। পাহাড়, খাদ, জঙ্গল শেষই হচ্ছে না। মনে হল একটা গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছি।

কেশকাল পাহাড়ের কাছাকাছি যেখান থেকে আমরা আসছি ওই এলাকাটা থেকে আধ ঘণ্টা ড্রাইভ করলে ন্যাশনাল হাইওয়ে। সেই রাস্তাটা প্রশস্ত, মসৃণ। দু—পাশে এত পাহাড় জঙ্গল নেই। প্রায় দু—ঘণ্টা হয়ে গেল, কোথায় জাতীয় সড়ক? তাহার দেখা নাই রে, তাহার দেখা নাই।

খেয়াল ছিল না, এখন পূর্ণিমাপক্ষ। চাঁদ উঠে এল আকাশে। জ্যোৎস্নায় ভেসে যেতে লাগল দণ্ডকারণ্যের পাহাড়, জঙ্গল। দু—চারটে পাহাড়ি ঝরনাও চোখে পড়ছে।

কিছুক্ষণ আগের সেই ঘন অন্ধকার আর নেই। চাঁদের আলোয় চারিদিকের সমস্ত কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমি কয়েক মাস হল এখানে এসেছি। মহেশ এসেছে দিন কুড়ি আগে। ডি এন কে প্রোজেক্ট অর্থাৎ দণ্ডকারণ্য প্রোজেক্টের সব কলোনিতে না হলেও অনেকগুলোতে গেছি। মানা ট্রানজিট সেন্টার থেকে কতবার যে বহুদূরের কোরাপুট অবধি চষে বেড়িয়েছি, লেখাজোখা নেই। দণ্ডকারণ্যের অনেকটা এলাকাই আমার চেনা হয়ে গেছে। কিন্তু এখন যেখানে চলে এসেছি সেটা পুরোপুরি অচেনা।

আমাদের ড্রাইভারটির বয়স বেশি নয়। পঁচিশ কি ছাব্বিশ। রায়পুরের ছেলে। কেশকাল থেকে মানায় আমাকে বহুবার নিয়ে গেছে। সে কি রাস্তা ভুল করে ফেলেছে?

জিজ্ঞেস করলাম, ‘রঘুয়া, ঠিক পথে আমরা যাচ্ছি তো?’

গাড়ির স্পিড কমিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রঘুয়া। মুখচোখ দেখে মনে হয় বেশ ঘাবড়ে গেছে। বলল, ‘সাহাব, থোড়া কুছ গড়বড় হয়ে গেছে—’

আমি অবাক!—’মানে?’

‘দণ্ডকারণ্য তো অনেক বড় ইলাকা। আমি আগে কখনও এখানে আসিনি। সামকো আন্ধেরায়, তখনও চান্দা ওঠেনি, হাইওয়ের দিকে না গিয়ে অন্য দিকে চলে এসেছি মনে হচ্ছে। বহোৎ ভুল হো গিয়া—’

‘হাইওয়েতে যেতে পারবে তো?’

আকাশপাতাল হাতড়ে আমার প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে এনে ঢোঁক গিলতে গিলতে রঘুয়া বলল, ‘কোসিস তো জরুর করেগা, লেকিন—’

‘লেকিন কী?’

‘বহোৎ মুশকিল।’

বলে কি ছোকরা! দণ্ডকারণ্যে শুধু নিরীহ প্রাণীরাই থাকে না, বিশাল এই বনভূমি মারাত্মক সব জন্তু—জানোয়ারদেরও আস্তানা। হাইওয়ের খোঁজ না পেলে আমরা কি জ্যান্ত ফিরে যেতে পারব?

মহেশ বলল, 'জানোয়ারেরা আমাদের নিয়ে ভোজের আসর বসিয়ে দেবে যে—'

রঘুয়া বলল, 'আমাকেও বাদ দেবে না সাহাব—'

'তা হলে?'

'বলেছি তো হাইওয়েতে যেতে কোসিস করব? অব রামজি ভরোসা—' মুখ ফিরিয়ে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দিল রঘুয়া।

পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে গাড়ি চলতে লাগল। কখনও এ রাস্তায়, কখনও ও রাস্তায়।

মহেশ শুকনো গলায় বলল, 'কার একটা কবিতায় যেন পড়েছিলাম লাস্ট রাইড টুগেদার। তোর আর আমার এটাই বোধহয় লাস্ট রাইড রে। শেষ যাত্রা।'

আমি চুপ।

আরও ঘণ্টাতিনেক পর একটা ছোট পাহাড়ের কাছে চলে এল আমাদের গাড়িটা। পাহাড়ের তলার দিক বেড় দিয়ে একটা রাস্তা নীচের দিকে চলে গেছে। আমরা যেখানে রয়েছি সেখান থেকে পাহাড়ের আড়াল থাকায় নীচে কী আছে দেখা যাচ্ছে না।

রঘুয়া পাহাড়ের তলায় পাক খাওয়া রাস্তায় গাড়িটাকে নিয়ে এল। কিছুটা যেতেই পাহাড়ের আড়াল আর নেই। চোখে পড়ল বাঁ—পাশে অনেকটা নীচে অফুরান চাঁদের আলোয় একটা ছোট পাহাড়ি নদী কুল কুল আওয়াজ করে বয়ে চলেছে। তার পাশে সবুজ মখমলের মতো ঘাসের জমি। সেখানে একটি যুবক—বয়স চৌত্রিশ—পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না, এবং একটি যুবতি, সাতাশ—আটাশের মতো বয়স, নিশ্চয়ই স্বামী—স্ত্রী বসে আছে। একটি সাত—আট বছররের ছেলে আর চার—পাঁচ বছরের মেয়ে ঘাসের জমি তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। বোঝাই যায় ওই দম্পতিরই ছেলেমেয়ে।

পুরুষ আর তরুণীটি যেখানে বসে আছে তার ডান পাশে বড় বড় তিন—চারটে চটের ব্যাগ। একটা ধনুক আর সাত—আটটা তির এবং একটা বন্দুকও পড়ে আছে। যুবক যুবতির বাঁ পাশে একটু দূরে ইটের উনুনে বড় একটা হাঁড়িতে খুব সম্ভব ভাত ফুটছে। এই মাঝরাতে জনশূন্য নিঝুম নদীর ধারে ওরা কারা? দণ্ডকারণ্যে তো শুধু নিরীহ প্রাণী নেই, এখানকার গভীর জঙ্গলে অজস্র হিংস্র জন্তু—জানোয়ার। কিন্তু ওদের এতটুকু ভয়ডর আছে বলে মনে হয় না। পৃথিবীর থিকথিকে ভিড় আর হট্টগোল থেকে ছোট ছোট দুটো ছেলেমেয়েকে সঙ্গে করে ওরা যেন আনন্দভ্রমণে বেরিয়ে এখানে এসে বনভোজনটাও সেরে নেবার তোড়জোড় করছে।

গাড়ির চালক রঘুয়া ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'সাহাব, ওই যে নদী কিনারে আদমি আর আওরতটা বসে আছে, ওদের কাছে গেলে মনে হয় মানায় কীভাবে যাওয়া যায়, ওরা বলে দিতে পারে।'

বাকি রাতটা পাহাড় আর জঙ্গলের গোলকধাঁধায় ঘুরে বেড়ানোর মানে হয় না। দেখাই যাক অচেনা এই যুবক—যুবতির কাছে মানায় যাবার পথের হদিস মেলে কিনা। বললাম, 'চল, ওদের কাছে—'

এদিকটায় পাহাড়ের ঢাল বেয়ে রাস্তা নেমে গেছে। রঘুয়া মুখ ফিরিয়ে স্পিড আরও কমিয়ে গাড়িটাকে নীচে নামিয়ে পাহাড়ি পথটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে বাঁ দিকে গাড়িটা ঘুরিয়ে নদীর ধারে ঘাসের জমিটার পাশে এসে থামাল।

যুবক—যুবতি নদীর দিকে মুখ করে বসে গল্প করছিল। গাড়ির আওয়াজে চমকে উঠে ঘুরে আমাদের দেখতে পেয়ে পুরুষটি তার পাশের বন্দুকটা তুলে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে মারণাস্ত্রটা আমাদের দিকে তাক করে উঠে দাঁড়াল। তার সঙ্গিনীও ঠিক তারই মতো ধনুকে তির জুড়ে উঠে পড়েছে।

আমরা তিনজন গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলাম। হাত তুলে দাঁড়িয়ে গেলাম। মহেশ বলল, 'বন্দুক নামাও, ধনুক নামাও। আমাদের বুরা মতলব নেই। রাস্তা ভুল করে এদিকে চলে এসেছি।'

ওরা দু'জন অনেকক্ষণ আমাদের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর বন্দুক আর তিরধনুক নামিয়ে বলল, 'আইয়ে—'

ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুরুষটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কারা?'

নিজেদের পরিচয় এবং কোন উদ্দেশ্যে আমাদের দণ্ডকারণ্যে আসা, সব জানিয়ে দিয়ে বললাম, 'তোমরা কারা?'

ওদের নামটামও জানা গেল। পুরুষটি ধরমবীর, আর তার স্ত্রী লছমি। সেই ছোট ছেলেমেয়ে দু'টো খেলাটেলা ছেড়ে তাদের মা—বাবার গায়ের সঙ্গে লেপটে আমাদের দিকে অনন্ত কৌতূহলে তাকিয়ে ছিল। তাদের নামও জেনে গেলাম। গণুয়া আর সীতা।

ধরমবীর জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কোত্থেকে আসছিলেন আর কোথায় যাচ্ছিলেন?'

জানিয়ে দিলাম কেশকাল পাহাড়ের দিক থেকে মানা যাচ্ছিলাম। সন্ধে নামার পর পথ হারিয়ে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরপাক খেতে খেতে এখানে চলে এসেছি। বললাম, 'কীভাবে, কোন দিকের রাস্তা ধরলে খুব তাড়াতাড়ি মানা চলে যেতে পারব, যদি বলে দাও—'

ধরমবীর বলল, 'সাহাব, আপনারা বিলকুল অন্য দিকে চলে এসেছেন। চান্দাকা রোশনি যদিও আছে তবু জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আপনাদের সঙ্গে হাতিয়ার আছে?'

'না। কেন?'

আমরা তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

'আপনারা এখানে নয়া—নয়া এসেছেন। জঙ্গলে বহুৎ খতরনাক জানবর আছে। এক কাজ করুন সাহাব—'

'কী করতে বলছ?'

ধরমবীর বলল, 'এখনও আধা রাত বাকি। আপনারা এখানেই থেকে যান। কাল সুবে সূরয উঠুক। তখন কোন পথে গেলে জলদি জলদি মানা পৌঁছে যাবেন, বুঝিয়ে দেব। দিনের আলোয় আসানিসে চলে যেতে পারবেন।'

খুব অবাক হলাম।—'এখানে কোথায় থাকব?'

ঘাসের জমিটা দেখিয়ে ধরমবীর বলল, 'ওখানে। আপনাদের গাড়িতে তিন আদমি শুতে পারবেন না। ঘাসের জমিনে আমার ঘরবালী চাদর পেতে বিস্তারা করে দেবে। থোড়া কুছ

তখলিফ হবে, তবু ভালো করে শুতে পারবেন। আইয়ে—'

এভাবে রাত কাটানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। ধরমবীর আর লছমি ড্রাইভার রঘুয়া, মহেশ আর আমাকে ঘাসের জমিতে নিয়ে বসিয়ে তারাও কাছাকাছি বসে পড়ল।

আমাদের সম্বন্ধে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রায় সমস্ত কিছুই জেনে নিয়েছে। কিন্তু ওদের নাম ছাড়া আর কিছুই জানা হয়নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের বাড়ি কোথায়?'

ধরমবীর বলল, 'রায়পুর টৌরন (টাউন)।'

'চারদিকে জঙ্গল, পাহাড়, নদী—এত রাতে বাচ্চাদের নিয়ে কেন এখানে এসেছ?'

'পেটের ধান্দায়—'

'মানে?'

ধরমবীর এবার যা বলল এমন আশ্চর্য এক কাহিনি, কেউ কখনও শুনেছে কি না আমার জানা নেই। প্রতি সপ্তাহে স্ত্রী—ছেলেমেয়ে নিয়ে সে এখানে আসে। কেননা, এখানকার জঙ্গলে, পাহাড়ে এবং নদীর ধারে এমন সব গাছ আছে যেগুলোর ছাল, পাতা, শিকড়—বাকড়, ফল ছাড়াও এমন লতা, গুল্ম এবং মাটির তলায় কন্দ রয়েছে যা দিয়ে কঠিন কঠিন রোগের কবিরাজি ওষুধ তৈরি হয়। ফি সপ্তাহে একবার এসে সেসব জোগাড় করে রায়পুরে ফিরে সেখানকার কবিরাজখানায় বিক্রি করে। সেই টাকাতেই তারা বেঁচে আছে।

জিজ্ঞেস করি, 'তুমি বলেছ এই জঙ্গলে অনেক ভয়ঙ্কর জন্তু আছে। বাচ্চাদের নিয়ে আসতে ভয় করে না?'

'কীসের ডর সাহাব। এখানে না এলে নিজেরা বাঁচব কী করে, বাচ্চা দু'টোকেও বাঁচাব কী করে? আর খতরনাক জানোয়ার?' পাশ থেকে সেই বন্দুক আর তির ধনুক তুলে ধরে ধরমবীর।

বললাম, 'এই হাতিয়ার দিয়ে বাঘের মতো জানোয়ারকে—'

আমাকে শেষ করতে দিল না ধরমবীর।—'শের, উনকো দাদা নানা যো কোঈ আসুক, সিনা ফোঁড় দুঙ্গা—'হঠাৎ কী খেয়াল হতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল।—'সাহাব, আপনারা তো সেই কখন থেকে জঙ্গলে জঙ্গলে চক্কর দিয়ে বেড়িয়েছেন। আপনাদের খানা—পিনা?'

পাহাড়ে জঙ্গলে পথের ধারে কোথাও ছোটখাটো হোটেল, এমনকি চায়ের দোকানও চোখে পড়েনি। খাবার কোত্থেকে জুটবে! ঠিক করা ছিল মানা ট্রানজিট সেন্টারে গিয়ে রাতের আহারটা সেরে নেব। মানা বহুদুরের কোনো গ্রহের মতো, আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সুতরাং আজকের রাতটা অনশনেই কাটুক। বললাম, 'ও নিয়ে ভেবো না—'

'তাই কখনও হয়! আপনারা আমাদের মেহমান—'স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বসে আছিস যে, ওঠ, ওঠ। তুরন্ত—'

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সেই ইটের উনুনটা, যার ওপর সিলভারের হাঁড়িতে ভাত ফুটছিল, সেখানে চলে গেল ধরমবীর। ভাত হয়ে গিয়েছিল, হাঁড়িটা নামিয়ে ফেন গেলে, লোহার কড়াইতে ডাল চাপিয়ে দিল লছমি। একটু দূরে ক্ষিপ্র হাতে নতুন একটা ইটের উনুন বানিয়ে সেটার ওপরে আবার চাল ধুয়ে বসিয়ে দিল ধরমবীর।

এক ঘণ্টার মধ্যে খাবার প্রস্তুত। ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের থালা বাটি ধুয়ে ভাত, আলুভাতে আর ডালের বাটি সাজিয়ে দিয়ে ধরমবীর আর লছমি হাতজোড় করে বলল,

‘সাহাব, আমরা গরিব আদমি। মেহেরবানি করকে—’বাকিটা শেষ করতে পারল না।

বললাম, ‘তোমার বাচ্চাদের খেতে বসিয়ে দাও—’

‘হাঁ সাহাব—’

নদীর স্বচ্ছ জলে হাত ধুয়ে এসে খেতে বসলাম। মোটা চালের ভাত, মসুর ডাল আর আলুভাতে। সামান্য এই ক’টি খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কী মেশানো ছিল আজও জানি না। শুধু মনে হয় দণ্ডকারণ্যে যাবার আগে এবং ফিরে আসার পর মস্ত মস্ত পাঁচতারা হোটেল আর কলকাতা মুম্বাই বা দিল্লির বিরাট বিরাট ধনীদের প্রাসাদের মতো বাড়িতে ভোজ খেয়েছি। কিন্তু সেদিনের সেই ডাল, ভাত আলুভাতেতে যে অমৃতের স্বাদ ছিল তেমনটা আর কোথাও পাইনি।

আমাদের আর বাচ্চা দু’টোর খাওয়া হয়ে গেলে ধরমবীর আর লছমিও খেয়ে বাসনকোসন ধুয়ে একধারে রেখে একটা বড় ব্যাগ থেকে লম্বা চাদর আর তিনটে গোল গোল পুঁটলি বের করল। তারপর চাদরটা ঘাসের জমিতে টান টান করে পেতে দিয়ে, গোল পুঁটলি তিনটেকে হাতের চাপ দিয়ে দিয়ে যতটা সম্ভব ফ্ল্যাট করে বালিশের আকার দিয়ে চাদরটার ওপর পাশাপাশি রেখে দিল।

ধরমবীর বলল, ‘সাহাব, এবার শুয়ে পড়ুন।’

‘তোমরা আর তোমাদের বাচ্চারা?’

‘বাচ্চা দুটোকে শুইয়ে দিচ্ছি—’চাদরের এক কোণে সামান্য ফাঁকা জায়গা রয়েছে। আঙুল বাড়িয়ে সেদিকটা দেখিয়ে, বাচ্চা দু’টোকে ডেকে সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়তে বলল ধরমবীর।

‘আমাদের সবার তো শোওয়ার ব্যবস্থা হল। তোমরা দু’জন?’ আমি জানতে চাইলাম।

‘আমরা হাতিয়ার হাতে পাহারা দেব—’

‘মানে?’

‘ওই যে খতরনাক জানবর শের—’ ধরমবীর হাসল।

মহেশ খুব ঘুমকাতুরে। সে শুয়ে পড়ল। একটু দূরে শুয়েছে রঘুয়া, তার ওপাশে গণুয়ারা। হাতে তিরধনুক আর বন্দুক হাতে আমাদের দুই পাহারাদার নদীর ধারে খোলা আকাশের নীচে ঘাসের জমিতে আশ্চর্য এক বিছানার দু—ধারে বসে পড়ল।

আমি শুতে পারিনি। বসেই আছি। ধরমবীর বলল, ‘সাহাব, পাহাড় জঙ্গল ঘুরে আপনার বহুৎ তখলিফ হয়েছে। জেগে থাকবেন না। তবিয়ত খারাপ হবে—’

‘কিছু হবে না। তোমরা জেগে থাকবে আর আমি ঘুমাব তাই কখনও হয়? আমার জেগে থাকার অভ্যাস আছে—’

‘ঠিক হ্যায়, আপনার যেমন মর্জি—’ধরমবীর হাসল।—’সাহাব, আপনি তো কলকাত্তা রহেনবালা—’

‘হ্যাঁ—’

‘আমার জান—পহেচান রায়পুরের অনেকেই কলকাত্তায় থাকে। তাদের কাছে ওই শহরের কথা অনেক শুনেছি। কলকাত্তা আর মুম্বাইয়ের মতো শহর নাকি হয় না। আমার সেখানে খুব যেতে ইচ্ছা করে।’

‘বেশ তো, চলে এসো। ঠিকানা দিয়ে যাব। আমাদের বাড়িতে থাকবে।’

ধরমবীরের মুখটা করুণ হয়ে গেল।—’গরিব আদমি। যাব যে এত্তে রুপাইয়া কঁহা মিলেগা?’

‘একবার কলকাতায় তো এসো। সব খরচ আমার।’

মুখটা আলোয় ভরে যায় ধরমবীরের।—’আপনি তো ঠিকানা লিখে দেবেন। জরুর যায়েগা।’

এরপর কলকাতায় কোথায় কী দেখার মতো আছে, একের পর এক বলে যাই। যত শোনে ততই অবাক হয় ধরমবীর আর লছমি। আমি বলছি, ওরা যেন তা শুনছে না, চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছে।

ওদের কাল্পনিক কলকাতা দর্শনের পর বলি, ‘তোমাদের নাম, রায়পুরে থাকো, জঙ্গল থেকে গাছের ছাল, শিকড়—বাকড় নিয়ে গিয়ে কবিরাজ খানায় বিক্রি করো—এর বেশি কিছু জানাওনি। তোমাদের আর কে কে আছে?’

‘কোঈ নেহী সাহাব। স্রিব হামলোগ চার আদমি অউর এক বুডঢী সাস। সে অকেলী গাঁয়ে থাকে। তাকে হর মাহিনা কুছ পাইসা পাঠাতে হয়। লছমি দিয়ে আসে।’

এরপর রায়পুর শহরের সেখানকার লোকজন, দু—চারজন নেতার ভ্রষ্টাচার, রাজনৈতিক অশান্তি, জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে একটানা বলে যাবার পর ধরমবীর জানায়, ‘সাহাব, আমি তো আনপড়। আমার ইচ্ছা, ছেলেমেয়ে দুটো লেখাপড়া শিখুক, ওদের ইস্কুলে—কলেজে পড়াই।’

‘নিশ্চয়ই পড়াবে। আজকাল লেখাপড়া না শিখলে চলে?’

‘লেকিন—’ধরমবীরের মুখটা শুকিয়ে গেল। ‘এত্তে রুপাইয়া কোথায় পাব?’

এই যুবকটি কলকাতায় যাবার স্বপ্ন দেখে। সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েকে স্কুল—কলেজে পড়িয়ে মানুষ করার স্বপ্নও। বললাম, ‘আমাকে চিঠি লিখো। আমার অনেক বন্ধু আছে। আমরা সবাই মিলে তোমাকে দরকার মতো টাকা পাঠিয়ে দেবো।’

‘নেত্রী সাহাব। আপনা কামাইয়ের পয়সায় ওদের পড়াব।’ খুব জোর দিয়েই বলল ধরমবীর।

এই যুবকটি স্বপ্ন দেখে কিন্তু প্রবল আত্মসম্মান বোধ। আমি চুপ করে রইলাম।

একটু পর কিছু খেয়াল হতে জিজ্ঞেস করি, ‘এই যে তুমি বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে আসো, এই হাতিয়ারটার লাইসেন্স আছে?’

‘জঙ্গলে কি খালি হাতে ঢোকা যায়। কবিরাজখানা থেকে আমার নামে সরকারি লাইসেন্স করিয়ে দিয়েছে।’

‘ঠিক আছে।’

কথায় কথায় ভোর হয়। পূব দিকের জঙ্গলের মাথা টপকে সূর্য উঠে আসে।

শুধু সূর্যই নয়, যারা ঘুমোচ্ছিল, উঠে পড়েছে। সবাই নদী থেকে মুখ ধুয়ে এলাম।

লছমি চটপট উনুন ধরিয়ে চা বানিয়ে আমাদের দিল। চা খেতে খেতে কীভাবে, কোন রাস্তা ধরে মানা যেতে হবে, রঘুয়াকে জলের মতো বুঝিয়ে দিল ধরমবীর।

চা—পর্ব শেষ হলে মহেশ, রঘুয়া আর আমি উঠে পড়লাম।

ধরমবীররাও উঠে দাঁড়িয়েছে। তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ধরমবীর, আমার একটা কথা রাখতে হবে।'

'বোলিয়ে না—'ধরমবীর আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

পকেট থেকে তিনটে একশো টাকার নোট বের করে ধরমবীরের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। —'এটা ধরো।'

মহেশেও দু'টো একশো টাকার নোট বের করেছে।

ধরমবীরের মুখটা থমথমে হয়ে গেল। গম্ভীর গলায় বলল, 'সাহাব, আমরা বহুৎ বহুৎ গরীব। লেকিন মেহমানদারি করে পাইসা নিতে পারব না। মাফ কীজিয়ে—

'এটা তোমাদের বাচ্ছাদের জন্যে—'

'মাফ কীজিয়ে—'

নোট ক'টা ধীরে ধীরে আমাদের পকেটে ফিরে গেল। ধরমবীর আর লছমির মাথায় একবার হাত রেখে, বাচ্চা দুটোকে আদর করে গাড়িতে উঠলাম।

রঘুয়া স্টার্ট দিল। চোখের পলকে গাড়িটা সামনের মোড় ঘুরে ঢাল বেয়ে সেই পাহাড়ি রাস্তাটায় উঠে এল।

খোলা জানলা দিয়ে পাহাড়ের তলায় সেই নদীর পাড়ের ঘাসের জমিটার দিকে তাকিয়ে আছি। সেখানে ধরমবীর আর লছমিও হাতজোড় করে আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

গাড়ি আরেকটা মোড় ঘুরল। মুহূর্তে ধরমবীররা অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেদিন দণ্ডকারণ্যের অচেনা নিঝুম প্রান্তে এসে যেন অন্য এক ভারতবর্ষের দেখা পেলাম।

এরপর কত বছর কেটে গেছে। ধরমবীরদের আজও ভুলিনি।

—

এক চোর, পাঁচ ডাকাত

মহেশপুর আদ্যিকালের এক পুরোনো শহর। এর পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে গেছে।

শহরটার বয়স নাকি কলকাতার থেকেও বেশি। সেকেলে, নোনা—ধরা বাড়িঘর, জিলিপির প্যাঁচের মতো সরু সরু গলি, এসব দেখলে তাই মনে হয়। এখানে কয়েক পা হাঁটলেই একটা করে মন্দির। কোনওটা রাধাকৃষ্ণের, কোনওটা রক্ষাকালীর, কোনওটা বা মা শীতলার। তবে সবচেয়ে বিখ্যাত হল মহেশ্বরের মন্দির। সেখানে রয়েছে তিন ফুট উঁচু খাঁটি সোনার নটরাজ মূর্তি যার ত্রিনয়নে তিনটে বড় বড় হিরে। শোনা যায়, চার—পাঁচশো বছর আগে এই শহরের যখন জন্ম হয় তখন থেকেই এই মূর্তি আর মন্দিরটা আছে। খুব সম্ভব মহেশ্বরের নামেই শহরটার নাম মহেশপুর।

এই ধরনের এত প্রাচীন নটরাজ মূর্তি সারা দেশে আর একটাও নেই। কেউ বলে ওটার দাম নাকি তিরিশ লাখ টাকা, কেউ বলে চল্লিশ লাখ। যে যাই বলুক, টাকা দিয়ে এর দাম ঠিক করা যায় না। মূর্তিটা ভারতবর্ষের এক অমূল্য সম্পদ। ওটা দেখার জন্য দেশ—বিদেশ থেকে প্রচুর লোক আসে।

মহেশ্বর মন্দির আর সোনার নটরাজের জন্য মহেশপুরের বাসিন্দাদের দারুণ গর্ব। মন্দির আর মূর্তিটা না থাকলে কেই বা এই ভাঙাচোরা, নোংরা শহরে আসত, কেই বা একে চিনত!

আজকাল একদল অত্যন্ত লোভী বদমাশ দেশের পুরোনো মূল্যবান সব জিনিস, যেমন দেবদেবীর মূর্তি, পুথি, দু'হাজার বছর আগের কোনও শিলালিপি চুরি করে বিদেশে বেচে দিচ্ছে। তাই গভর্নমেন্ট থেকে মহেশপুরের নটরাজ মূর্তির জন্য দুজন বন্দুকওয়ালা পাহারাদারের ব্যবস্থা করেছে। তারা মন্দিরেই থাকে আর পালা করে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি দেয়। আগে অনেক রাত পর্যন্ত মন্দিরের গেট খোলা থাকত, এখন সাতটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

সবে নভেম্বরের শুরু। এর মধ্যেই সন্ধে হতে না হতে মহেশপুরে কুয়াশা নামতে শুরু করেছে। বাতাসে ঠান্ডার আমেজ। শীত পড়তে আর বেশি দেরি নেই।

কিছুক্ষণ আগে গঙ্গার ওপারে সূর্য ডুবে গেছে। কুয়াশা আর অন্ধকারে মিশে চারদিক এখন ঝাপসা। মিউনিসিপ্যালিটির আলো জ্বলে উঠেছে ঠিকই কিন্তু সেগুলোর তেজ এতই কম যে বিশ ফুট দূরের কোনও কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না।

অন্যদিনের মতো আজও দক্ষিণ দিকের রাস্তাটা ধরে মহেশ্বর মন্দিরের দিকে আসছিল ফটিক। রোজ সূর্যাস্তের পর সে এখানে নটরাজ মূর্তিকে প্রণাম করতে আসে। এটা যেন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

ফটিকের বয়স চব্বিশ—পঁচিশ। বেজায় ঢ্যাঙা, কালো এবং রোগা। বোতলের মতো লম্বা মুখ। ভাঙা গালে খাপচা খাপচা দাড়ি। চোখ একেবারে গোল। দাঁতগুলো এবড়ো—খেবড়ো এবং পোকায়—কাটা। বেঢপ কান দুটো খাড়া খাড়া। মাথার ডান দিকে সিঁথি। পরনে চাপা কালো পাজামার ওপর কালো হাফ শার্ট। তার যে ধরনের কাজকর্ম তাতে এই রংটা খুব দরকারি, অন্ধকারে সহজে চোখে পড়বে না।

আসলে ফটিক মহেশপুরের সবচেয়ে নাম—করা ছিঁচকে চোর। দামি দামি সোনার গয়না, ঘড়ি বা জামাকাপড়—এত উঁচুর দিকে তার নজর নেই। দু'চারটে ঘটিবাটি সরাতে পারলেই সে খুশি। নটরাজের ওপর তার অসীম ভক্তি। ফটিকের ধারণা, মূর্তিকে প্রণাম করে কাজে বেরুলে খালি হাতে ফিরতে হবে না। তবে নটরাজ সব দিন সদয় হন না। মাঝে মাঝেই ধরা পড়ে ফটিককে বেদম ঠেঙানি খেতে হয়। মহেশপুরের প্রতিটি মানুষ তাকে চেনে। লোভ কম আর দামি জিনিসে হাত দেয় না বলে মারধর করেই গেরস্থরা ছেড়ে দেয়। তবে যারা বদরাগি তারা কিন্তু পেটানোর পরও থানায় দিয়ে আসে। থানার লোকেরাও ফটিককে বহুকাল দেখে আসছে, বিশেষ করে ওসি ধনঞ্জয় চাকলাদার। তিনি ওকে হাজতে পোরেন না, বারকতক কান ধরে ওঠ—বোস করিয়ে থানা থেকে বার করে দেন।

দূর থেকে ফটিকের চোখে পড়েছিল, মন্দিরে আজ ভিড়টিড় কম। জনকয়েক সামনের সিঁড়িতে বসে আছে, কেউ কেউ চত্বরের ভেতর দাঁড়িয়ে গল্প করছে। দু'জন আমর্ড গার্ডকে সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল।

ফটিক যখন মন্দিরের অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে, সেই সময় পর পর চার—পাঁচটা বন্দুকের গুলির আওয়াজ কানে এল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এদিক—সেদিক তাকাতেই দেখতে পেল, মন্দিরের দুই পাহারাদার গড়াতে গড়াতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। রক্তে তাদের জামা ভিজে যাচ্ছে। যে ক'জন বসে বা দাঁড়িয়ে—টাড়িয়ে ছিল, তারা চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। আর কোত্থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এল পাঁচটা মুখোশ—আঁটা লোক, তাদের মাথায় লাল ফেট্টি, হাতে বন্দুক। গুলিগুলো যে ওরাই করেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে।

মোট কুড়িটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলে মন্দিরে ঢোকার বিশাল দরজা। সেটার সামনে অবশ্য কোলাপসিবল গেট রয়েছে। এখনও সাতটা বাজেনি। তাই গেট বা দরজা বন্ধ করা হয়নি।

এদিকে তিনটে লোককে নীচে পাহারায় রেখে বিদুৎগতিতে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠে মন্দিরের ভেতর ঢুকে গেল দুটো লোক।

আতঙ্কে চোখের তারা দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে ফটিকের। মাথাটা ভীষণ ঝিমঝিম করছিল। তবু তারই মধ্যে সে বুঝতে পারছিল এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হবে না। খুনিগুলোর চোখে পড়লে একটা গুলি তার বুক এফোঁড়—ওফোঁড় করে বেরিয়ে যাবে। একবার ভাবল, পেছন ফিরে দৌড় লাগায়। কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহল তাকে পালাতে দিল না। রাস্তার পাশে অনেকগুলো তালগাছ জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একলাফে সে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে মুখটা সামান্য বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কতক্ষণ কেটেছে, খেয়াল নেই ফটিকের। একসময় দেখতে পেল মন্দিরের ভেতর থেকে সেই দুই বন্দুকওলা নটরাজ মূর্তিটা নিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে। আর এখানকার পুরোহিত মাঝবয়সি জগদীশ ভট্টাচার্য পাগলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'মূর্তি নিয়ো না, মূর্তি নিয়ো না। তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে একটা লুটেরা জগদীশের মাথায় বন্দুকের কুঁদো দিয়ে গায়ের জোরে ঘা মারল। তক্ষুনি ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল আর জগদীশ একধারে ছিটকে পড়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ডাকুরা মূর্তি নিয়ে যাচ্ছে। ধর—ধর—'

পাঁচ বন্দুকবাজ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাল না। মন্দিরের পেছনে প্রচুর ঝোপঝাড়। ওরা দৌড়ে সেদিকে চলে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটতে মিনিট পাঁচেকও লাগেনি। ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল ফটিক। চোখের সামনে এমন খুনখারাপি কখনও দেখেনি সে। আতঙ্ক কাটিয়ে উঠতে অবশ্য বেশিক্ষণ লাগল না। প্রথমেই তার মনে হল যে নটরাজ মূর্তি মহেশপুরের মানুষদের প্রাণ, খুনিদের সেটা কিছুতেই নিয়ে যেতে দেবে না। ওদের হাতে বন্দুক আছে। কাজেই ঠান্ডা মাথায় ওদের পিছু নিতে হবে। আগে জানতে হবে ওরা কোথায় গিয়ে ওঠে। তারপর বুদ্ধি খাটিয়ে মূর্তিটা উদ্ধার করতে হবে।

মাথার ভেতরে এই সব ভাবনাচিন্তা নিয়ে ফটিক মন্দিরের পেছন দিকে দৌড় লাগাল। এখান থেকে অনেকটা জায়গা ঘন আগাছা আর নানা ধরনের গাছপালায় বোঝাই। সেসব পেরুলে লাইন দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক বিশাল বিশাল ধানচালের গুদাম। সেগুলোর বেশ কয়েকটায় কিছু নেই, একেবারে ফাঁকা। ভাঙাচোরা কিছু দোতলা—তিনতলা বাড়িও আছে। ওগুলোতে লোকজন থাকে না।

গুদাম—টুদাম এবং পোড়ো বাড়িগুলোর পর গঙ্গা।

এই শহরেই জন্ম ফটিকের। জীবনের পঁচিশটা বছর এখানেই চুরিচামারি করে কাটিয়ে দিয়েছে সে। মহেশপুরের প্রতিটি অঞ্চলের অন্ধিসন্ধি তার মুখস্থ।

ফটিক চারদিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে। কিন্তু অন্ধকারে আর কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খুনিগুলো কোথায় উধাও হয়েছে কে জানে। তবে কি ওদের ধরা যাবে না?

দমবন্ধ করে চুপিসারে অনেকটা যাওয়ার পর হঠাৎ পায়ের শব্দ কানে এল। তারপরই ছায়ামূর্তির মতো পাঁচ বন্দুকওলাকে দেখতে পেল ফটিক। ওদের ওপর নজর রেখে গাছপালার আড়ালে আড়ালে সে এগুতে লাগল।

নদীর ধারের গুদামগুলো সন্ধের আগে আগে বন্ধ হয়ে যায়। তাই এদিক ভীষণ নির্জন। কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। গঙ্গায় এখন বোধহয় জোয়ার চলছে। তার কলকলানি ছাড়া কোথাও এতটুকু আওয়াজ নেই।

লুটেরারা গুদামের লাইন পেরিয়ে গঙ্গার ধারে চলে এসেছিল। এতক্ষণ গাছপালা আর গুদামের আড়াল ছিল কিন্তু নদীর পাড়টা ফাঁকা। হুট করে ফটিক বেরিয়ে ওদের নজরে পড়ে যেতে পারে। একটা গুদামের পাশে নিজেকে লুকিয়ে রেখে ওদের খানিকটা এগিয়ে যেতে দিল। তার মতলব অনেকটা দূরে থেকে সে পিছু নেবে।

কিন্তু লুটেরারা ক্রমশ অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ফটিক বেরিয়ে এসে নদীর পাড় ধরে এগুতে লাগল। কিন্তু একসময় ওদের আর দেখতে পেল না।

ডাকুরা কোথায় যেতে পারে? নদীটা তীক্ষ্ন চোখে লক্ষ করল ফটিক কিন্তু নৌকো—টৌকো দেখা যাচ্ছে না। তার মানে গঙ্গা পেরিয়ে ওরা ওপারে পালায়নি। নিশ্চয়ই এখানে কোথাও আছে।

ফটিক যতটা পারল, খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু সে ছাড়া কেউ কোথাও নেই। বন্দুকওয়ালারা বেমালুম যেন উবে গেছে।

কুয়াশা এবং অন্ধকার আরও ঘন হচ্ছে। বাতাস আরও ঠান্ডা হয়ে গায়ের চামড়ায় যেন কেটে কেটে যাচ্ছে। যত কষ্টই হোক, ফটিক ঠিক করে ফেলল, গঙ্গার ধার থেকে যাবে না, লোকগুলোকে যেভাবে পারে খুঁজে বার করবে।

যতদূর পর্যন্ত ওদের দেখা গিয়েছিল তারপরও প্রচুর গুদাম এবং পোড়ো বাড়ি রয়েছে। ফটিক প্রতিটি বাড়ি বা গুদামের সামনের দিক, পেছনের দিক এবং দু'পাশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। গুদামগুলোর সামনের দিকে ভারী ভারী তালা ঝুলছে। পেছনে বা পাশে ঢোকার কোনও দরজা নেই। জানালা যদিও আছে, সেগুলো ভেতর থেকে বন্ধ। তবে পোড়ো বাড়িগুলোর বেশির ভাগই চারদিক হা—হা করে খোলা। জানালা—দরজা ভেঙেচুরে গেছে। ফটিকের মনে হল, এই সব বাড়ির কোনো একটায় নিশ্চয়ই ঢুকে আছে। কিন্তু কোন বাড়িটায়?

এতক্ষণ ছোটাছুটি খোঁজাখুঁজি করে হয়রান হয়ে পড়েছিল ফটিক। খানিকক্ষণ বসে জিরিয়ে নিল। তারপর যে বাড়িগুলো বাকি ছিল সেদিকে এগিয়ে গেল। কয়েক পা সবে গেছে, হঠাৎ তার চোখে পড়ল, একেবারে শেষ বাড়িটার তেতলার একটা ঘরের জানালা দিয়ে সরু আলোর একটা রেখা বেরিয়ে আসছে। অন্য লোকের হয়তো নজরে পড়বে না কিন্তু তার চোখের জোর প্রচণ্ড। অন্ধকারেও সে অনেক কিছু দেখতে পায়।

ফটিকের বুকের ভেতরটা প্রবলবেগে লাফাতে লাগল। সে যা ভেবেছিল তাই। আছে, আছে, আছে, ডাকুরা ভেগে যায়নি। ওদের কীভাবে ফাঁদে ফেলা যায়, এখন সেটাই ভেবে বার করতে হবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চিন্তা করল ফটিক কিন্তু কোনও ফন্দিই মাথায় এল না। একসময় সে ঠিক করল, আপাতত দেখতে হবে বন্দুকওয়ালা কী করছে, নটরাজ মূর্তিটা কোথায় রেখেছে।

নদীর ধারেও গুদাম এবং বাড়িগুলোর গা ঘেঁষে প্রচুর ডালপালাওলা, বিরাট বিরাট গাছ আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। ফটিক দারুণ গাছ বাইতে পারে, ইচ্ছা হলে চোখের পলকে মগডালে উঠে যায়।

শেষ বাড়িটার সবচেয়ে কাছে যে মস্ত রেনট্রিটা রয়েছে সেখানে এসে গিরগিটির মতো তরতর করে বেয়ে ওপরে উঠে পড়ে ফটিক। গাছটার একটা মোটা ডাল যে ঘরে আলো জ্বলছে সেটার জানালা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ডালটা দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বুক টেনে টেনে সেখানে চলে যায় সে।

ঘরটার এদিকের জানালার একটা পাল্লা ভাঙা। তার ফাঁক দিয়ে ফটিক দেখতে পেল, ঘরের মেঝেতে একটা মোমাবতি জ্বলছে। পাঁচ ডাকাত সেটা ঘিরে গোল হয়ে বসে নটরাজ মূর্তিটা ঘুরিয়ে—ফিরিয়ে দেখতে দেখতে কথা বলছিল। ডাকুদের একজনের পাকানো গোঁফ, একজনের ঘাড় পর্যন্ত ঝাঁকড়া চুল, একজনের গালে কাটা দাগ, একজন বেঢপ লম্বা, আরেকজনের নিরেট মুগুরের মতো চেহারা। তাদের বন্দুকগুলো দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করানো রয়েছে।

একটা ডাকু বলল, 'মন্দিরের পাহারাদার দুটো বোধহয় খতম হয়ে গেছে।'

গোঁফওয়ালা বলল, 'খতম না হলে নটরাজ মূর্তিটা কি তুলে আনা যেত?'

ঝাঁকড়া চুলের লোকটা বলল, 'ঠিক বলেছিস। পুরুতটা যেভাবে আমার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথা না ফাটালে ছাড়ত না।'

গাল—কাটা লোকটা খুব সম্ভব ওই দলটার নেতা। বয়সও তার অন্যদের থেকে বেশি। হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে সে বলল, 'কাজের কথাটা শোন। দু'দুটো মার্ডার হয়ে গেছে। পুলিশ পাগলা কুকুরের মতো আমাদের খোঁজ করবে। হইচই যদ্দিন চলবে, এখান

থেকে বেরোনো যাবে না। নিশ্চয়ই ওরা নৌকোঘাটা কি রেলস্টেশনে লোক রাখবে। আমরা গেলে ধরা পড়ে যেতে পারি।'

গোঁফওলা বলল, 'কদ্দিন এখানে লুকিয়ে থাকতে চাও?'

'পাঁচ—সাত দিন তো বটেই।'

'তদ্দিন কি আমেরিকান সাহেবটা আমাদের জন্যে কলকাতার হোটেলে পড়ে থাকবে?'

'থাকবে, থাকবে। এমন একটা নটরাজ মূর্তির জন্যে সাত দিন কেন, সাত বছর থেকে যাবে।'

ঝাঁকড়া চুলওলা বলল, 'পঞ্চাশ লাখের কমে কিন্তু বেচব না।'

গাল—কাটা বলল, 'আগে কলকাতায় তো ফিরি। তারপর দেখা যাবে পঞ্চাশ না ষাট, কত আদায় করতে পারি।'

ওদের কথাবার্তা থেকে ফটিক আরও জানতে পারল, চার—পাঁচ দিন আগে কলকাতা থেকে এসে ওরা এই ভূতুড়ে পোড়ো বাড়িতে ঘাঁটি গেড়েছে। রোজ দু'তিন বার মন্দিরে গিয়ে দেখে আসত, কখন কীভাবে হানা দিলে কম ঝুঁকিতে মূর্তিটা ছিনিয়ে আনা যাবে। নিখুঁত ছক তৈরি করে আজ তারা মন্দিরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এত বড় একটা কাজে দু'একটা খুন—টুন কোনও ব্যাপারই নয়।

নটরাজ মূর্তিটা কলকাতায় নিয়ে ওরা কোনও এক আমেরিকান সাহেবের কাছে বেচে দেবার মতলব করেছে। কিন্তু ওটা কিছুতেই মহেশপুরের বাইরে যেতে দেবে না ফটিক। ডাকুরা কয়েকদিন এখানে থেকে যাচ্ছে। ফটিকের পক্ষে আপাতাত এতে খানিকটা সুবিধাই হবে। মূর্তি উদ্ধারের কোনও একটা ফন্দি ভেবে বার করার সময় পাওয়া যাবে।

ডাকাতেরা যখন থেকেই যাচ্ছে তখন আর ঠান্ডায় গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলে থাকার দরকার নেই। এখন দিনের বেলা নদীর ধারে ঘুরে ঘুরে আর রাত্তিরে গাছে উঠে ওদের ওপর নজর রাখবে সে।

গাছ থেকে নীচে নামতে নামতে ফটিক সেই গোঁফওয়ালাটার গলা শুনতে পেল, 'যা শুকনো খাবার—টাবার নিয়ে এসেছিলাম তাতে বড়োজোর আর দু'দিন চলবে। তোমার কথামতো যদি পাঁচ—ছদিন থাকতে হয়, খাবার ফুরোলে কী খাব?'

গাল—কাটা বলল, 'আগে ফুরোক। তারপর দেখা যাবে।'

ফটিকের মা—বাবা, ভাই—বোন, কেউ নেই। পৃথিবীতে সে একেবারে একা। ঠাকুরদার তৈরি টিনের চালের একটা হেলে—পড়া ঘর আছে তার। গাছ থেকে নেমে সে ভাবল, হোটেলে খেয়ে সেখানে গিয়ে শুয়ে পড়বে। আজ সন্ধের পর থেকে তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।

কিন্তু নদীর পাড় থেকে শহরে ঢুকতেই ফটিক টের পেল, চারদিকে হুলুস্থুল চলছে। প্রতিটি রাস্তার মোড় পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। ওসির জিপ সাইরেন বাজাতে বাজাতে এধারে—ওধারে ছোটাছুটি করছে। যেদিকে তাকানো যায় মানুষের জটলা। সবার চোখেমুখে আতঙ্ক। খুন আর মূর্তি চুরি নিয়ে তারা চাপা গলায় কথা বলছিল।

ফটিক কাউকে কিছু জানাল না, এমনকি পুলিশকেও না। চুপচাপ একটা সস্তা হোটেলে রুটি—তরকারি খেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন থেকে নজরদারি শুরু হল। ফটিক সকালে উঠে চান করে পাড়ার চায়ের দোকান থেকে চা—পাউরুটি খেয়ে গঙ্গার ধারে চলে আসে। ততক্ষণে গুদামগুলো খুলে যায়। প্রচুর লোকজন আসতে থাকে। দিনের বেলা জায়গাটা মানুষের ভিড়ে একেবারে সরগরম।

গুদামগুলোর সামনে দিয়ে ফটিক সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ঠিকই, কিন্তু তার নজর সারাক্ষণ শেষ মাথার সেই তিনতলা পোড়ো বাড়িটা। কিন্তু পাঁচ ডাকাতের একজনকেও ভাঙা জানালার পাশে দেখা যায় না। পাছে কারও চোখে পড়ে যায় তাই খুব সম্ভব এধারেই আসে না তারা।

সারাদিন নদীর পাড়ে কাটিয়ে সন্ধেবেলায় শহরে গিয়ে খেয়ে এসে সেই রেনট্রির ডালে উঠে ডাকাতদের কথাবার্তা শোনে ফটিক। না, কলকাতায় পালিয়ে যাবার ভাবনা এই মুহূর্তে তাদের নেই। তবে খাবার শেষ হয়ে এসেছে, সেই নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছে। কেউ বাইরে গিয়ে যে কিছু কিনে আনবে, ধরা পড়ার ভয়ে তা—ও পারছে না।

দু'দিন কেটে যাবার পরও পুলিশ যখন খুনি আর মূর্তিটার কোনও হদিশ পেল না তখন গভর্নমেন্ট থেকে ঘোষণা করা হল, যে বা যারা মূর্তি উদ্ধার করতে পারবে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

পুরস্কারের খবরটা শুনে চোখ দুটো চকচক করে উঠল ফটিকের। পঞ্চাশ হাজার যে কত টাকা, সে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই নেই। ডাকাতগুলো প্রায় হাতের মুঠোয়, মাথা থেকে ফন্দিটা বেরুলেই ওদের ধরে ফেলা যাবে। আর তারপরেই নগদ এতগুলো টাকা। জীবনে আর ঘটি—বাটি চুরি করতে হবে না। পায়ের ওপর পা তুলে রাজার মতো দিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে থানায় গিয়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বুঝে আসা দরকার।

ভাবামাত্র ফটিক মহেশপুর থানায় গিয়ে হাজির। ওসি ধনঞ্জয় চাকলাদার তখন তাঁর নিজের কামরায় সাব—ইন্সপেক্টর, জুনিয়র অফিসর আর কনস্টেবলদের সমানে ধমকাচ্ছিলেন, 'কটা ডাকাত দুটো পাহারাদারকে খুন করল, পুরুতকে জখম করল, সোনার নটরাজ নিয়ে গায়েব হল। আর তিনদিনেও তাদের পাত্তা করতে পারলে না। এদিকে এস পি থেকে শুরু করে সব ওপরওলা অনবরত ধাতিয়ে যাচ্ছে। যত সব অকর্মার ধাড়ি। তোমাদের জন্যে আমার মানসম্মান সব গেল।'

ধনঞ্জয়ের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। দারুণ মজবুত চেহারা, চৌকো মুখ, ভারী চোয়াল, হাইট ছ'ফিটের ওপর। জাঁদরেল অফিসার হিসেবে তাঁর খুব সুনাম। যখনই যে থানায় গেছেন, চোর—ডাকাতদের টিট করে ছেড়েছেন। তাঁরই এলাকায় এত বড় দুঃসাহসিক কাণ্ড ঘটল, অথচ তিনদিনেও কিছুই করা গেল না, এতে মাথাটা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। খাওয়া, ঘুম, বিশ্রাম সব বন্ধ হয়ে গেছে। এমন বেইজ্জত জীবনে কখনো হননি।

প্রায় চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ধনঞ্জয় ফের হুমকে উঠলেন, 'আর দু'দিন সময় দেবো। তার ভেতর যেভাবে পারো—' কথাটা শেষ হওয়ার আগেই দেখতে পেলেন, দরজার ওধারে ফটিক দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সব রক্ত মাথায় উঠে এল যেন। বাঘের মতো গর্জে উঠলেন, 'এই ব্যাটা চোর, কী চাই এখানে?'

ফটিক দাঁত বের করে, মাথা ঝুঁকিয়ে, হাতজোড় করে বলল, 'পেন্নাম স্যার—'

ধনঞ্জয় একটা কনস্টেবলকে চেঁচিয়ে বললেন, 'ঘাড় ধাক্কা দিয়ে উল্লুকটাকে বার করে দাও তো—'

কনস্টেবলটা হুকুম পাওয়া মাত্র এগিয়ে আসছিল, ত্রস্তভাবে ফটিক বলল, 'আপনার কাছে একটা জরুরি কাজে এসেছি স্যার। ওই সোনার নটরাজের ব্যাপারে—'

হুমকে উঠতে গিয়ে থেমে গেলেন ধনঞ্জয়। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কী বলবি বল—'

ফটিক বলল, 'সবার সামনে আমি মুখ খুলব না স্যার। যা বলার স্রেফ আপনাকেই বলব।'

কী ভেবে অফিসার আর কনস্টেবলদের হাতের ইশারায় বাইরে যেতে বলে ফটিককে ভেতরে ডাকলেন ধনঞ্জয়। তারপর নিজের চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'সোনার মূর্তি সম্বন্ধে কী জানিস তুই?'

ফটিক তাড়াহুড়ো করল না। ধনঞ্জয়ের টেবলের সামনে অনেকগুলো চেয়ার সাজানো রয়েছে কিন্তু দারোগার সামনে ছিঁচকে চোর তো আর চেয়ারে বসতে পারে না। সে মেঝেতে থেবড়ে বসে ট্যারাব্যাঁকা, পোকা—খাওয়া দাঁত বার করে হাসল। তারপর বলল, 'কিছু কিছু জানি। সেটা আপনাকে এক্ষুনি বলতে পারছি না। ওটা আমার গোপন কথা। তবে—'

রাগে মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল ধনঞ্জয়ের। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, 'তবে কী?'

প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে ফটিক বলল, 'স্যার, খবরের কাগজে নাকি বেরিয়েছে সোনার মূর্তি ফিরিয়ে আনতে পারলে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার মিলবে?'

'হ্যাঁ, সত্যি। তাতে কী হল?'

'টাকাটা পেলে বড্ড উপকার হত। লোকের বাড়ি থেকে ছোটোখাটো মাল সরিয়ে, পুলিশ আর পাবলিকের পেটানি খেয়ে ঘেন্না ধরে গেছে। ওই টাকাটা পেলে চুরি—ছ্যাঁচড়ামো ছেড়ে ভদ্দরলোক হয়ে বসতাম।'

ফটিকের সঙ্কল্পটা মহৎ। কেউ যদি নিজের দোষত্রুটি শুধরে ভালো হতে চায়, তাকে সাহায্য করাই উচিত। একটু নরম হয়ে ধনঞ্জয় বললেন, 'পুরস্কারটা তোমার ওই চাঁদ মুখ দেখে দেবে?'

ফটিক চোখ নামিয়ে বলল, 'তাই কখনও দেয় স্যার! ডাকাতদের হাত থেকে মূর্তি ফেরত আনলে তবে না পুরস্কারটা মিলবে! একটা কথা জানার আছে। যদি রাগারাগি না করেন—' বলতে বলতে থেমে গেল।

ফটিকের দাঁত—খিঁচানো চেহারার মধ্যে কোথায় যেন একটা ছেলেমানুষি সারল্য রয়েছে। সেই কারণে ধনঞ্জয় হয়তো তাকে একটু পছন্দও করেন। বললেন, 'কী জানতে চাস?'

ফটিক বলল, 'ধরুন, মূর্তিটা ডাকাতদের হাত থেকে বাগিয়ে আনলাম। পুরস্কারটা পাবো তো?'

টেবলের ওপর প্রচণ্ড ঘুষি মেরে ধনঞ্জয় বলেন, 'আলবাত পাবি। কিন্তু—'

'কী স্যার?'

‘তিনদিন ধরে খুঁজে খুঁজে আমাদের জিভ বেরিয়ে গেল। তুই কি পারবি রে ফটিক?’

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে ফটিক বলল, ‘আমার ওপর ভরসা রাখুন স্যার। পুরস্কার তো রয়েছেই। সেই সঙ্গে আপনার আর মহেশপুরের মান—ইজ্জতও রয়েছে। সেটা তো রাখতে হবে।’

ধনঞ্জয় খুশি হলেন। মূর্তি উদ্ধার আর খুনিদের পাকড়াও—কোনোটাই করতে না পেরে মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তা ছাড়া ওপরওলাদের ধাতানিতে একেবারে নাজেহাল অবস্থা তাঁর। এই প্রথম একটু যেন আশার আলো দেখতে পেলেন। অবশ্য ফটিক পুরস্কার—টুরস্কারের ব্যাপারে যেভাবে খোঁজখবর নিচ্ছে তাকে মনে হয় দুর্ধর্ষ খুনিগুলোর হাত থেকে নটরাজ মূর্তি ছিনিয়ে আনতে পারবে। তবু একটু সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। আদৌ কি তার পক্ষে কাজটা সম্ভব? টেবলের ওপর অনেকটা ঝুঁকে ধনঞ্জয় জিজ্ঞেস করলেন, ‘একটু বুঝিয়ে বল মূর্তিটা কীভাবে আনবি?’

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ফটিক বলল, ‘সেটা জানতে চাইবেন না স্যার। আগে থেকে জানাজানি হয়ে গেলে সব কেঁচে যাবে। মাঝখান থেকে পুরস্কারটা পাবো না।’

পঞ্চাশ হাজার টাকা বেহাত হওয়ার জন্য ফটিক মূর্তি উদ্ধারের কৌশলটা যে গোপন রাখতে চায় সেটা বোঝা যাচ্ছে। ওর ওপর জোর করলে যেটুকুও আশা আছে তা আর থাকবে না। ধনঞ্জয় বললেন, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোকে বলতে হবে না।’ একটু চিন্তাও হল তাঁর। এবার বললেন, ‘খুব সাবধান ফটকে। ডাকাতগুলোর সঙ্গে বন্দুক আছে কিন্তু—’

‘সে আপনাকে বলতে হবে না স্যার। আশীর্বাদ করুন, কাজটা যেন ভালোয় ভালোয় করে ফেলতে পারি।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, আশীর্বাদ করছি। তা কবে থেকে লাগবি?’

‘লেগে গেছি স্যার।’

কথাবার্তা পাকা হওয়ার পরও ওঠার নাম নেই ফটিকের। ধনঞ্জয় জিজ্ঞেস করলেন, ‘কি রে, আর কিছু বলবি?’

আস্তে ঘাড়টা হেলিয়ে দিল ফটিক।

ধনঞ্জয় বললেন, ‘বলে ফেল—’

হাত কচলাতে কচলাতে ফটিক বলল, ‘স্যার, একটা ঝামেলা হয়ে গেল যে।’

‘কীসের ঝামেলা?’

‘যদ্দিন না সোনার নটরাজ ফেরত আনতে পারছি, অন্যদিকে তো নজর দিতে পারব না। নিজের কাজকম্ম বন্ধ থাকবে। হাতে পয়সাকড়ি নেই। এখন খাব কী?’

ধনঞ্জয় একটু ভেবে বললেন, ‘তোর কাজকর্ম মানে চুরি তো?’

ফটিক দাঁত বার করে হাসল।

ধনঞ্জয় ভুরু ঝুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তা আমাকে কী করতে হবে?’

ফটিক মাথাটা যতখানি পারে নীচু করে বলল, ‘স্যার, যদি আমাকে পঞ্চাশটা টাকা ধার দ্যান—পরে তো পুরস্কারটা পাচ্ছিই, তখন শোধ করে দেবো।’

‘হতচ্ছাড়া তোমার পেটে পেটে মহা শয়তানি—’ পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট ফটিককে দিতে দিতে ধনঞ্জয় বললেন, ‘ওটা আর দিতে হবে না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস, নটরাজ যদি ফিরিয়ে আনতে না পারিস, মারের চোটে তোর হাড় আর মাংস আলাদা করে ফেলব।’

ফটিক থানায় এসেছিল বিকেলে, ধনঞ্জয় চাকলাদারকে ‘পেন্নাম’ ঠুকে যখন বেরুল, সন্ধে নামতে শুরু করেছে। এখন আর অন্য কোথাও নয়, সোজা গঙ্গার ধারে চলে যাবে। সেদিকে যেতে যেতে আচমকা দারুণ একটা ফন্দি মাথায় এসে গেল তার। ফটিকের মনে হল ডাকাতগুলোর আর নিস্তার নেই। নিশ্চয়ই বাছাধনেরা এবার ফাঁদে পড়ে যাবে। খুশিতে কয়েক পাক নেচে উঠতে ইচ্ছা করল তার। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিল সে। না, এখন নয়। আগে মূর্তি উদ্ধার হোক, খুনিগুলো ধরা পড়ুক, তারপর নাচার অনেক সময় পাওয়া যাবে। আজকের রাতটা মাথা ঠান্ডা রেখে ডাকাতদের ওপর শুধু নজর রেখে যেতে হবে। ফটিকের আশা কালই হেস্তনেস্ত যা হওয়ার হয়ে যাবে।

নদীর পাড়ে আসতে আসতে অন্ধকার আর কুয়াশা গাঢ় হয়ে নেমে গিয়েছিল। ফটিক তার সেই রেনট্রিটার ডালে চড়ে চোখ—কান সজাগ রেখে পাল্লাভাঙা জানালার ফাঁক দিয়ে তেতলার ঘরের দিকে তাকিয়ে রইল।

অন্য দিনের মতো আজও একটা মোমবাতির আলোর চারপাশে বসে ডাকাতেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছিল। তাদের খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। ওদের কথাবার্তা থেকে মনে হল, আজ দুপুরেই খাবার ফুরিয়ে গেছে। রাতটা উপোস দিয়ে কাটাতে হবে। কাল যেভাবেই হোক, ওরা খাবার জোগাড় করবে, নইলে যত বিপদই ঘটুক এখান থেকে পালিয়ে যাবে।

গোঁফওলা বলল, ‘নিশ্চয়ই চারদিকে পুলিশ গিজগিজ করছে। তাদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে পালাবে কী করে?’

গাল—কাটা বলল, ‘সেটা আমি ভেবে রেখেছি। কাল মাঝরাতে এখান থেকে মাইলখানেক দূরে যে নৌকোঘাটাটা রয়েছে, সেখানে গিয়ে একটা নৌকো কেড়ে নদীর ওপারে চলে যাব। একবার গঙ্গা পেরুতে পারলে আর চিন্তা নেই।’

‘কিন্তু এখানে আসার পর পালাবার ব্যাপারটা নিয়ে আমরা অনেক ভাবনাচিন্তা করেছিলাম। দু’দিক দিয়ে মহেশপুর থেকে সরে পড়া যায়। রেলস্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরে, নইলে নদী পেরিয়ে। স্টেশনে সারাক্ষণ পাহারা থাকবে। নৌকোঘাটার যে খবর নিয়ে এসেছিলাম সেটা বোধহয় তোমার মনে নেই। চুরি যাবার ভয়ে প্রত্যেকটা নৌকোয় রাত্তিরে লোক থাকে। নৌকো কাড়তে গেলে ওরা হল্লা বাধাবে না?’

‘আমাদের সঙ্গে বন্দুক আছে কী করতে?’

ঝাঁকড়া চুলের লোকটা বলল, ‘তোমরা তো জানো আমি একদম খিদে সহ্য করতে পারি না। আজ রাত্তিরে উপোস দিতে হবে, কালও মাঝরাত পর্যন্ত পেটে কিছু পড়বে না। স্রেফ মরে যাব।’

গাল—কাটা তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, ‘বললাম তো, খাবার জোগাড় করতে চেষ্টা করব। না পারলে একটু কষ্ট কর। মূর্তিটা আমেরিকান সাহেবের হাতে তুলে দেবার পর কত টাকা পাবি একবার ভেবে দ্যাখ।’

রেনট্রির ডালে আর ঝুলে রইল না ফটিক। চুপচাপ নেমে এসে সোজা শহরের মাঝখানে 'মা দুর্গা মেডিক্যাল স্টোর্স'—এ চলে এল। এখানকার সেলসম্যান নিকুঞ্জ হালদার, যার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, গোলগাল হাসিখুশি মানুষ। ফটিক ছিঁচকে চোর হলেও এ শহরের অনেকেই তাকে ভালোবাসে। নিকুঞ্জ হালদারও। আসলে যে যখন কোনো কাজে তাকে ডাকে, সঙ্গে সঙ্গে সে হাজির হয়ে যায়। মড়া পোড়ানো, মাল বওয়া, ছোটোখাটো ফরমাশ খাটা—কোনো ব্যাপারেই তার 'না' নেই।

নিকুঞ্জকে বাইরে ডেকে এনে ফটিক বলল, 'দাদা, আমার একটা উপকার করতে হবে।'

নিকুঞ্জ জানতে চাইল, 'কী উপকার?'

ফটিক তার কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলতেই নিকুঞ্জ আঁতকে উঠল, 'না, না, ও আমি পারব না।'

ফটিক বোঝাল, 'তোমার কোনও ভয় নেই। কেউ কিচ্ছু জানতে পারবে না। তা ছাড়া পরে তোমাকে আমি দু'হাজার টাকা দেব।'

নিকুঞ্জ চমকে উঠে বলল, 'অত টাকা তুই পাবি কোথায়?'

'এখন জানতে চেয়ো না, পরে তোমাকে সব বলব।' ফটিক বলল।

নিকুঞ্জর খুব একটা ইচ্ছা ছিল না কিন্তু দু'হাজার টাকা পাওয়া যাবে। সেই লোভে বলল, 'ঠিক আছে।'

পরদিন সকালে তখন ন'টাও বাজেনি, দেখা গেল পলিথিনের বিরাট একটা ব্যাগে পাউরুটি আর কেক—টেক বোঝাই করে গঙ্গার ধারে সারি সারি গুদামগুলোর পাশ দিয়ে পোড়ো বাড়িগুলোর দিকে এগিয়ে চলেছে ফটিক।

এর মধ্যে সব গুদাম খুলে গেছে। চারদিকে প্রচুর লোকজন। তাদের কেউ কেউ পাউরুটি কিনতে চাইলে ফটিক জানাল, বেচা যাবে না, অন্য লোকের অর্ডার আছে।

গুদামের লাইন পেরিয়ে পোড়ো বাড়িগুলোর কাছে এসে গলা চড়িয়ে ফটিক হাঁকতে লাগল, 'রুটি চাই, রুটি। টাটকা কেক—'

সেই তেতলাটা পর্যন্ত যায়নি সে, তবে তার চোখ সেদিকেই রয়েছে। হঠাৎ মনে হল, ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়ে একটা মুখ পলকের জন্য দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। ফটিক আর এগুলো না, যেন ফিরে যাচ্ছে এমন একটা ভাব করে আড়চোখে বাড়িটার দিকে তাকাতে তাকাতে ঘুরে দাঁড়াল।

আর তখনই পেছন থেকে একটা চাপা গলা কানে এল ফটিকের, 'এই শোন—' মুখ ফেরাতে দেখতে পেল, সেই লম্বা চুলওলাটা একতলার দেওয়ালের আড়াল থেকে হাতছানি দিচ্ছে। কখন সে নীচে নেমে এসেছে, টের পাওয়া যায়নি। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল ফটিকের। একবার ভাবল, দৌড়ে পালিয়ে যাবে কি না। নিজে বাঁচলে বাপের নাম। পরক্ষণে মনে হল, এমন সুযোগ জীবনে দু'বার আসবে না। পায়ে পায়ে, খুব সতর্কভাবে এগিয়ে গেল সে।

কাছাকাছি যেতেই লম্বা চুলওলা বলল, 'ক'টা রুটি আছে?'

'কুড়িটা।'

'আর কী আছে?'

'কেক—'

'সব কিনে নেব। আমার সঙ্গে ভেতরে এস।'

'ভেতরে যাব কেন? এখানেই দাম দিয়ে নিয়ে যাও।'

লম্বা চুলওলা পেছনে যে বন্দুক লুকিয়ে রেখেছিল, টের পাওয়া যায়নি। ঝট করে সেটা সামনের দিকে নিয়ে এসে কড়া গলায় বলল, 'এটা চিনিস? যা বলছি তাই কর।'

এমনটা যে হতে পারে, আঁচ করতে পারেনি ফটিক। আতঙ্কে তার দম বন্ধ হয়ে এল। সেই অবস্থায় লম্বা চুলওলার সঙ্গে তেতলার সেই ঘরটায় আসতেই হল তাকে। অন্য চার ডাকাত সেখানে বসে আছে।

গাল—কাটা হেসে হেসে ফটিককে জিজ্ঞেস করল, 'তোর কী নাম রে?'

ফটিক নাম বলল।

'বড্ড উপকার করেছিস আমাদের। কাল সারারাত কিচ্ছু খাইনি। খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে।'

ভয়ে ভয়ে ফটিক বলল, 'যা নেবার নিয়ে দামটা দাও। আমি চলে যাই।'

'অত তাড়া কীসের? বোস বোস। তোর যা দাম তার থেকে অনেক বেশিই পাবি। আর একটা কথা। মাঝরাত পর্যন্ত আমরা এখানে আছি। ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে তোকে থাকতে হবে।' একটা বন্দুক তুলে ফটিকের দিকে তাক করে গাল—কাটা বলল, 'যদি মুখ বুজে গুড বয় হয়ে বসে থাকিস, কিচ্ছু হবে না। আর ট্যাঁ—ফোঁ করলে গুলিতে স্রেফ ঝাঁঝরা হয়ে যাবি।'

হাত—পা আলগা হয়ে আসছিল ফটিকের। চোখে অন্ধকার দেখছিল। তারই মধ্যে কোনও রকমে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল।

এদিকে পলিথিনের ব্যাগটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডাকাতেরা। কয়েক মিনিটের ভেতর দশ—বারোটা রুটি আর ডজন দেড়েক কেক সাবাড় করে সবাই গল্প করতে লাগল। ফটিকের দিকে কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না।

ফটিক শুধু ভাবছিল, যে ফন্দিটা সে করেছে, শেষ পর্যন্ত সেটা যদি কাজে না লাগে? এই ঠান্ডার সময়েও ঘেমে নেয়ে যাচ্ছিল সে।

কিন্তু আধঘণ্টাও পেরুল না, তার আগেই চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে আসতে লাগল ডাকাতদের, কথা জড়িয়ে এল। তারপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে নাক ডাকা শুরু হল। নিকুঞ্জ হালদার কড়া ডোজের যে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল সেগুলো গুলে পাউরুটি আর কেকে মাখিয়ে দিয়েছে ফটিক। তার ফল হয়েছে চমৎকার। আর দুশ্চিন্তা নেই।

ডাকাতরা ঘুমিয়ে পড়ার পরও খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল ফটিক। তারপর আস্তে আস্তে ডাকল, 'এই যে দাদারা—'

কোনও সাড়া নেই। আরও কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর ফটিক নিশ্চিন্ত হয়ে গেল যে ওদের ঘুম সাত—আট ঘণ্টার মধ্যেও ভাঙবে না। এবার উঠে ঘরময় খোঁজাখুঁজি করতে করতে একটা বড় কাঠের বাক্সের ভেতর নটরাজ মূর্তিটা পেয়ে গেল। বাক্সসুদ্ধু মূর্তিটা

বুকে জড়িয়ে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের শেকলটা তুলে দিল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে থানার দিকে দৌড়।

ওসি ধনঞ্জয় চাকলাদার থানাতেই ছিলেন। বাক্সটা তাঁর হাতে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'এই নিন আপনার সোনার নটরাজ। খুনিদের ধরতে হলে এক্ষুনি পুলিশ নিয়ে চলুন।'

কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচ ডাকাত ঘুমন্ত অবস্থায় ধরা পড়ল।

এরপর পুরস্কারের পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে গেল ফটিক। কথামতো তার থেকে দু' হাজার নিকুঞ্জকে দিয়ে দিল সে।

এখন আর চুরিচামারি করে না ফটিক। মহেশপুরের বাজারে একটা মনোহারি জিনিসের দোকান খুলে বেশ সুখেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছে।

—

জের

রোজই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। না হলেই বুঝি ভালো হত।

অন্ধকার থাকতে থাকতে আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ি। হোটেলের কাছেই অবজারভেটরি। অবজারভেটরিটা আমার স্টার্টিং পয়েন্ট। ওখান থেকে সমুদ্রতীরের বালি ভাঙতে ভাঙতে চলে যাই স্বর্গদ্বারের দিকে। ভদ্রলোক আসেন স্বর্গদ্বারের দিক থেকে।

দুই বিপরীত দিক থেকে এসে মাঝামাঝি একটা জায়গায় আমরা মিলি। মুহূর্তমাত্র, তারপরেই পরস্পরকে পার হয়ে চলে যাই। লক্ষ করেছি, ভদ্রলোকের দৌড় অবজারভেটরি পর্যন্ত।

স্বর্গদ্বারের বুড়ি ছুঁয়ে আবার যখন সেই মাঝামাঝি জায়গাটায় ফিরি, ততক্ষণে ভদ্রলোক ওদিক থেকে চলে এসেছেন।

এধারে অবজারভেটরি, ওধারে স্বর্গদ্বার। সারা সকালবেলাটা এই দুই প্রান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমাদের কেটে যায়।

অন্য সময় হলে টুরিস্ট আর স্বাস্থ্যান্বেষীদের ভিড়ে ভদ্রলোককে হয়তো লক্ষ করতাম না। কিন্তু পুরীতে এখন মানুজন কম। কম হবার কথাই। আশি ঘণ্টা আগেও মনসুন ছিল সিলোনের কাছে; কোনাকুনি কয়েক শো মাইল পাড়ি দিয়ে এর মধ্যে এখানে এসে পড়েছে।

পুরীর আকাশ আজকাল সারাদিনই মেঘে ঢাকা; মাঝে মাঝেই বৃষ্টি হচ্ছে। দিন পাঁচেক হল এখানে এসেছি। তার ভেতর দু—দিন মোটে রোদ দেখা গেছে। তাও অল্প সময়ের জন্য; তারপরেই ঘন মেঘ তার মুখে ঘোমটা টেনে দিয়েছে। বর্ষা মাথায় নিয়ে এই মরশুমে কেউ এখানে আসতে চায় না। না টুরিস্ট, না স্বাস্থ্যান্বেষী, না পুণ্যলোভী। তবু যারা আসে তারা বিশেষ বেরোয় টেরোয় না, ঘরেই বসে থাকে। বেরুলেও ভোরের দিকে অন্তত না।

কাজেই সোনালি বালির নির্জন সৈকতে ভদ্রলোক আমার চোখে পড়েছিলেন; সম্ভবত তিনিও আমাকে লক্ষ করে থাকবেন।

অন্য দিন আমার পাশ দিয়ে নিঃশব্দে অবজারভেটরির দিকে চলে যান ভদ্রলোক। আজ কিন্তু গেলেন না; কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অগত্যা আমাকেও দাঁড়াতে হল।

হাতজোড় করে ভদ্রলোক বললেন, ‘নমস্কার। রোজই আপনাকে সমুদ্রের পারে দেখি। ভাবি আলাপ করব।’

প্রতি—নমস্কার জানিয়ে বললাম, ‘আমিও আপনাকে দেখি। আলাপ করবার ইচ্ছে আমারও।’

‘ইচ্ছেটা দু’পক্ষেই ছিল। অথচ দেখুন, সেটা প্রকাশ করতে আমাদের চার পাঁচ দিন লেগে গেল। ব্যাপারটা কী জানেন?’

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'আমরা বড্ড বেশি ফরম্যাল হয়ে গেছি। না কি পরনির্ভর? তৃতীয় একজন পরিচয় করিয়ে না দিলে নিজের থেকে কেউ এগিয়ে যেতে পারি না।

কথাটা মোটামুটি সত্যি। হাসতে হাসতে বললাম, 'তা যা বলেছেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে, চলুন হাঁটতে হাঁটতে গল্প করা যাক।'

'চলুন।'

অন্যদিন আমরা উল্টো দিকে চলে যাই। আজ কিন্তু ভদ্রলোক আমার সঙ্গে সঙ্গে ফের স্বর্গদ্বারের দিকে চললেন।

আজকের দিনটা বেশ ভালোই। মেঘ অবশ্য আছে, তবে অন্য সব দিনের মতো ভারী আর অনড় না, টুকরো টুকরো, ভবঘুরে ধরনের। আকাশের এ—কোণে ও—কোণে তারা ভেসে বেড়াচ্ছে। আর কি আশ্চর্য, সমুদ্রের তলা থেকে কাটা তরমুজের মতন লাল টুকটুকে সূর্য মাথা তুলেছে। পাঁচ দিনের ভেতর আজই প্রথম সূর্যোদয় দেখতে পেলাম।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোক বললেন, 'আলাপ হয়েছে; পরিচয়টা সেরে ফেলা যাক। অধীনের নাম সোমনাথ চক্রবর্তী। পাটনায় থাকি, কন্ট্রাক্টরি করে পেট চালাই। এবার আপনি বলুন।'

প্রথমে নাম বললাম। তারপর জানালাম, 'আমি কলকাতাবাসী। নাম—করা মার্চেন্ট অফিসে মোটামুটি ভালোই চাকরি করি; মাঝারি ধরনের অফিসার।

পরিচয়—পর্ব চুকলে সোমনাথ বললেন, 'জানেন অরবিন্দবাবু, সী—বীচে প্রথম দিন আপনাকে দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।'

'কেন?'

'এই অফ—সিজনে পুরীতে লোকজন আসে না। আমি কিন্তু এ সময়টা প্রতি বছর আসি। এবার এসে দেখলাম, আমার মতো বাতিকগ্রস্ত আরো এক—আধজন আছে।'

উত্তর আর কী দেব, হাসলাম।

সোমনাথ আমার চাইতে পাঁচ—সাত বছরের বড়ই হবেন; মাথায় অবশ্য ইঞ্চি কয়েক খাটো। গোলগাল ভারী চেহারা, হাড় আর মাংসের চাইতে চর্বির ভাগ বেশি। লম্বা ধাঁচের ভরাট মুখ। চওড়া কপালের ওপর চুল পাতলা হয়ে এসেছে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা।

আলাপ হবার পর অবজারভেটরি থেকে স্বর্গদ্বার পর্যন্ত বার তিনেক আমাদের টহল দেওয়া হয়ে গেছে। সোমনাথের মুখ কিন্তু মুহূর্তের জন্যও থামেনি। ভদ্রলোক সব সময় বকবকায়মান।

এদিকে সূর্যটা লাফ দিয়ে সমুদ্রের তলা থেকে উঠে এসেছে। খানিক আগে ওটা ছিল কাটা তরমুজ; এখন সোনার ঘট।

হঠাৎ কী মনে পড়তে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সোমনাথ, 'ভালো কথা, এতক্ষণ ধরে গল্প—টল্প করছি, অথচ আপনি কোথায় উঠেছেন জানাই হয়নি।'

'ওসেন—ভিউ হোটেলে। আপনি?'

'আমি পুরী ইণ্টারন্যাশনালে।'

একটু ভেবে সোমনাথ এবার শুধোলেন, 'একাই এসেছেন?'

মাথা নাড়লাম, 'না, সস্ত্রীক।'

উৎসুক চোখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সোমনাথ বললেন, 'মিসেস সঙ্গে রয়েছেন?' তবে একা একা বেড়াতে আসেন যে?'

'আর বলবেন না; আমার স্ত্রী প্রাতরুত্থানটা তেমন পছন্দ করেন না। ভোরবেলা বেড়াবার কথা বললে বলেন; খামোখা হেঁটে হেঁটে পায়ে খিল ধরাব কেন?' তিনি হোটেলেই থাকেন, আমি বেরিয়ে পড়ি।'

সোমনাথের চোখ চকচক করতে লাগল, 'অদ্ভুত ব্যাপার তো মশায়—'

ভদ্রলোক ঠিক কি বলতে চান বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?'

'স্ত্রীভাগ্য দেখছি, আমাদের দু'জনেরই এক।'

এবার আমার কৌতুহলী হবার পালা, 'কী রকম?'

সোমনাথ বলতে লাগলেন, 'আমার মিসেসও সঙ্গে এসেছেন। প্রাতর্ভ্রমণে তাঁরও ঘোরতর অরুচি।'

কয়েক পলক দু'জনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তারপর গলা মিলিয়ে জোরে জোরে হেসে উঠলাম।

দেখতে দেখতে রোদ উঠে গেল। তরল সোনার মতন উজ্জ্বল ঝলমলে রোদ। চার পাঁচ দিন পর অনেক কালের পুরনো সূর্যকে তার আপন মহিমায় দেখে বড় ভালো লাগছে।

বেলা বেড়ে যাচ্ছিল। বললাম, 'আজ এই পর্যন্ত। অনুমতি করুন, এবার হোটেলে ফিরি।'

'উঁহু—' দু'ধারে মাথা নাড়লেন সোমনাথ, 'তা হবে না মশাই।'

ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য কী? সারা দিনই 'বীচে' ঘুরবেন নাকি? কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই সোমনাথ তাঁর মনের ইচ্ছাটা পরিস্কার করে দিলেন, 'হোটেলে পরে ফিরবেন। এখন আমার সঙ্গে চলুন।'

'আপনার সঙ্গে কোথায় যাব?'

'আমার হোটেলে। প্রথম আলাপ হল, একটু চা—টা না খাইয়ে ছাড়তে পারি? তা ছাড়া—'

'কী?'

'মিসেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।'

'এখন থাক, পরে না হয়—'

মাঝপথেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে সোমনাথ চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, 'না—না মশাই, পরে—টরে না। টাটকা—টাটকাই হয়ে যাওয়া ভালো। আসুন।'

আচ্ছা পাল্লায় পড়া গেছে। ভদ্রলোকের আন্তরিকতা, ইনফরম্যাল ভাব আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু এখন সেটা প্রায় জুলুমের পর্যায়ে গিয়ে পড়ছে। মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিলাম। তবু হাসিমুখে বিনীতভাবে বললাম, 'আমর স্ত্রী একা একা আছেন। ফিরতে দেরি হলে চিন্তা করবেন।'

‘করুন একটু চিন্তা; তাতে সাঙ্ঘাতিক কিছু ক্ষতি হবে না। ম্যাক্সিমাম হাফ এ্যান আওয়ার; তার মধ্যেই আপনাকে ছেড়ে দেব।’

একরকম জোর করেই সোমনাথ আমাকে তাঁর হোটেলে টেনে নিয়ে চললেন। যেতে যেতে সৎ পরামর্শ দেবার ভঙ্গিতে বললেন, ‘মনে হচ্ছে আপনি মশাই গুডি—গুডি হাজব্যাণ্ড। স্ত্রীর গায়ে আঁচটি লাগতে দ্যান না, এটা ঠিক না। মাঝে মাঝে মহাশয়াকে একটু আধটু ভাবাবেন। সব সময় নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় রাখলে লাইফে আর চার্ম থাকবে না, একেবারে আলুনি হয়ে যাবে।’

উপদেশ শিরোধার্য করে পায়ে পায়ে এগুতে লাগলাম।

সোমনাথের হোটেল স্বর্গদ্বারের কাছে। দোতলায় একটা সুইট নিয়ে ওঁরা আছেন।

অল্পক্ষণের পরিচয়েই বুঝেছি, সোমনাথ মানুষটি উচ্ছ্বাসপ্রবণ, কারণে—অকারণে মেতে উঠতে পারেন। স্যুইটের দরজায় এসে তিনি প্রায় হৈ—চৈ জুড়ে দিলেন, ‘কোথায় গেলে; দরজা খোল, দরজা খোল। দেখ, কাকে ধরে এনেছি—’

ভেতর থেকে মেয়ে—গলা ভেসে এল, ‘খুলছি, খুলছি। সব সময় হুলস্থূল কাণ্ড! এক মিনিট তর সয় না!’ বলতে বলতে খুট করে শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল।

তারপরেই দেখলাম, আমার মুখোমুখি অলকা দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাঁচ বছর আগে যেমন দেখেছি প্রায় সেই রকমই রয়েছে অলকা। ডিমের মতন লম্বাটে সেই মুখ, কচি পাতার শ্যামল আভার মতো সেই রং, সেই ভুরু, মসৃণ সেই গ্রীবা, কালো কুচকুচে সেই চোখের তারা। তফাতের মধ্যে বয়সের সামান্য একটু ভার পড়েছে শরীরে। ফাঁকা আকাশে সূর্যোদয়ের মতো অলকার কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ।

সমস্ত ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য। এতকাল পর এখানে এভাবে পাটনার কোন এক কন্ট্রাক্টর সোমনাথ চক্রবর্তীর ঘরণীরূপে অলকাকে দেখব, কে ভাবতে পেরেছিল?

পলকের জন্য মনে হল, আমার হৃৎপিণ্ডের ওঠা—নামা বন্ধ হয়ে গেছে। পরক্ষণেই অসহ্য শীতের মতো কিছু একটা চামড়ার তলা দিয়ে চোরা বানের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। টের পেলাম, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

অলকাও এই মুহূর্তে এখানে আমাকে দেখবে, ভাবেনি। চোখের তারা তার স্থির, কণ্ঠার কাছটা এবং ঠোঁট দুটো অসহনীয় কোন আবেগে থর থর কাঁপছে। লক্ষ করলাম, তার মুখ থেকে পরতে পরতে রক্ত নেমে যাচ্ছে।

সোমনাথ চক্রবর্তী চেঁচামেচি করে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন, ‘ইনি অরবিন্দ লাহিড়ী; কলকাতায় স্যাণ্ডারসন কোম্পানির মস্ত অফিসার। আজই ‘বীচে’ আলাপ হয়েছে, একেবারে পাকড়াও করে নিয়েই এলাম। সহজে কি আসতে চান? আর উনি আমার সহধর্মিনী—অলকা।’

কাঁপা আধফোটা গলায় বললাম, ‘নমস্কার।’

অলকার শিথিল দুই হাত যুক্ত হয়ে খানিক উঠেই নেমে গেল। ঝাপসা গলায় কিছু একটা বলল সে, কিন্তু বোঝা গেল না।

সোমনাথের উঁচু গলা আবার শোনা গেল, ‘অরবিন্দবাবুকে দেখে তুমি যে ‘একেবারে বোবা হয়ে গেলে! ভদ্রলোককে ভেতরে নিয়ে যাও।’ আমার দিকে ফিরে বললেন, ‘আসুন মশাই—’

ইচ্ছে করছিল ছুটে পালিয়ে যাই। যাব তো, কিন্তু কোথায়? পেছন দিকে একটা নিরেট দেওয়াল যেন কেউ তুলে দিয়েছে। অগত্যা সামনের দিকে পা বাড়াতে হল।

ভেতরে গিয়ে সোজা আমাকে বিছানায় বসালেন সোমনাথ। একটু পর চা এল, আনুষঙ্গিক খাবার—দাবার এল। সোমনাথ বললেন, 'খান মশাই—'

খেতে খেতে একাই জমিয়ে তুললেন সোমনাথ। মুখ নীচু করে মাঝে—মধ্যে আমি এক—আধটা 'হুঁ' 'হাঁ' যুগিয়ে যেতে লাগলাম। অলকা ঘরেই আছে, আমারই মতো তারও মুখ মাটির দিকে অবনত।

একটানা অনেকক্ষণ গলা সাধার পর হঠাৎ যেন সোমনাথের খেয়াল হল, ঘরের আর দু'টি মানুষ একেবারে পুতুল হয়ে বসে আছে। একবার অলকা, আরেকবার আমাকে দেখতে দেখতে বললেন, 'কী মশাই, আমার স্ত্রীর কাছে অত সঙ্কোচটা কিসের আপনার? বী এ্যাট হোম—'

বিব্রতভাবে বললা, 'না, মানে—'

সোমনাথ অলকাকে বললেন, 'তোমার আজ হল কী? একেবারে লজ্জাবতী লতা বনে গেলে দেখছি। অরবিন্দবাবুর কাছে লজ্জা কী, উনি আমাদের ঘরের লোক। মুখ বুজে বসে থাকলে উনি কী ভাববেন?'

আমার চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'অনেক বেলা হয়ে গেল। এবার আমি যাব সোমনাথবাবু।'

'সেকি! আধ ঘণ্টা তো এখনও হয়নি। তাছাড়া আমার স্ত্রীর সঙ্গে তো ভালো করে আলাপই হল না। জানেন, স্ত্রী বলে বলছি না, ও খুব ভালো গাইতে পারে।'

অলকা যে অসাধারণ গায়িকা, চর্চা এবং চেষ্টা করলে প্রচুর নাম করতে পারত, আমার চাইতে কে আর ভালো জানে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'পরে আরেক দিন এসে মিসেসের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করে যাব; তখন গানও শুনব।'

সোমনাথ এবার সদয় হলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললেন, 'তাহলে তাই। আবার করে আসছেন বলুন। কবে কি, ওবেলাই আসুন না। ভালো কথা, আপনি একলা না, মিসেসকেও সঙ্গে আনবেন।' অলকাকে বললেন, 'সস্ত্রীক আসবার জন্যে অরবিন্দবাবুকে নেমতন্ন করে দাও।'

চকিতের জন্য একবার আমার দিকে তাকিয়েই চোখ নামাল অলকা। এবারও অস্ফুট স্বরে যা বলল বোঝা গেল না।

সোমনাথের স্যুইট থেকে বেরিয়ে দু—তিনটে সিঁড়ি এক—এক বারে টপকে শ্বাসরুদ্ধের মতো নীচে নেমে এলাম। সোমনাথও আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিলেন। আমার মতো এত তাড়াতাড়ি তিনি সিঁড়ি ভাঙতে পারছিলেন না। কিছু পরে নীচে নেমে তিনি বললেন, 'কী মশাই, অমন লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিলেন! হয়েছিল কী আপনার? বাঘে তাড়া করলেও তো কেউ এমন করে ছোটে না।'

উত্তর দিলাম না, বিপন্ন মুখে একটু হাসলাম শুধু।

সোমনাথ বললেন, 'এই বয়েসে এত লাফ—ঝাঁপ ভালো না, একবার পা ফসকালে দেখতে হত না, দু'টি মাসের জন্যে বিছানা নিতে হত।'

সোমনাথ একাই কথা বলে যাচ্ছিলেন। তার মধ্যেই লম্বা লম্বা পা ফেলে রাস্তায় এসে একটা সাইকেল—রিক্সা থামিয়ে উঠে বসলাম।

সোমনাথ সঙ্গ ছাড়েননি। কাছে এসে বললেন, 'চলুন, আপনাকে আপনার হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসি। সেই সঙ্গে মিসেসকেও নেমতন্ন করে আসা যাবে।'

জোরে জোরে দু' হাত নেড়ে বললাম, 'না—না, আপনি আবার কষ্ট করে যাবেন কেন? আমাকেই তো বলে দিয়েছেন, তাতেই হবে। মিসেসকে আর নেমতন্ন করতে হবে না।'

'তা হলে বিকেলে আসছেন? আমরা কিন্তু খুব আশা করব!'

আসব যে না, আগেই স্থির করে ফেলেছি। পাছে সোমনাথ আবার ঝঞ্ঝাট বাধান, তাই কোনোরকমে মাথাটা হেলিয়ে রিক্সাওলাকে বললাম, 'চালাও—' সমুদ্রের পাড় দিয়ে রাস্তা, রিক্সা উর্ধ্বশ্বাসে আমার হোটেলের দিকে ছুটতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে সূর্যোদয় দেখে গেছি। সারা গায়ে রোদের আদর মেখে সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউগুলো তরল সোনার মতো টলমল করছিল। এখন কোথায়ই বা সূর্য, কোথায়ই বা রোদ, টুকরে টুকরো ছন্নছাড়া সেই মেঘগুলো কখন যে কাছাকাছি এসে জমাটা বেঁধে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, কে বলবে। জেলেরা ভোরবেলার তিন কাঠের ডিঙিতে গভীর সমুদ্রের দিকে চলে গিয়েছিল। এখন তারা ফিরে আসছে। পাহাড়ের মতো বড় বড় উঁচু উঁচু ঢেউগুলোর ওপর ডানা মেলে বাতাস কেটে কেটে অসংখ্য সাগরপাখি উড়ছে।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, সাগরপাখি কিংবা কালো কালো বিন্দুর মতো কাছে—দূরে অগণিত জেলেডিঙি—কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছিলাম না। বার বার ঘুরে ফিরে অলকার মুখটাই আমার চোখের ওপর ভেসে উঠছে। এই মুখটাই সময়ের উজান ঠেলে আমাকে সাত—আট বছর পেছনে টেনে নিয়ে গেল।

একদিন ভালোবেসেই অলকাকে বিয়ে করেছিলাম। বাবা—মা, আত্মীয়—স্বজন, এ ব্যাপারে কারো সমর্থন ছিল না। অলকার জন্য সেদিন সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমাকে দাঁড়াতে হয়েছিল। তাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এত করেও ভালোবাসার সেই বিয়েটাকে দীর্ঘায়ু করা যায়নি। তার জন্য দায়ী আমরাই।

স্বভাবের দিক থেকে আমরা ছিলাম দুই বিপরীত মেরুর, আমাদের মধ্যেই বিরোধের বীজ লুকনো ছিল। বিয়ের আগে সেটা টের পাওয়া যায়নি। তখন আমাদের চোখে অন্য রং, তখন আমরা আবেগের জোয়ারে ভাসছি।

বিয়ের কয়েক মাস পর বুঝতে পারলাম, অলকা আর আমি খুব কাছাকাছি নেই। একই ঘরে থাকি, একই টেবিলে মুখোমুখি খেতে বসি, এমন কি একই বিছানায় পাশাপাশি শুই, তবু আমাদের মাঝখানে অনেক দূরত্ব। সেই দূরত্ব দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল।

তখন আমি মার্চেন্ট অফিসে মাঝারি মাপের কেরানি। কিন্তু তার মধ্যেই চিরদিন সীমাবদ্ধ থাকব, আমার উচ্চাশা এত সামান্য নয়। কোনোদিনই আমি নীচের দিকে তাকাতে জানি না, আমার দৃষ্টি সবসময় উঁচুতে। যে ভাবেই হোক, যে পথেই হোক, চূড়ায় আমাকে উঠতেই হবে। কেরানি থেকে অফিসার হব, অফিসার থেকে ম্যানেজার, ম্যানেজার থেকে ডাইরেক্টর—আমার দাবীর এবং লোভের কোথাও শেষ নেই।

কিন্তু উঠব বললেই তো ওঠা যায় না। ওপরে যাবার পথ বড় দুর্গম। কিন্তু উচ্চাশা যার আকাশ—সমান সে একটা না একটা কৌশল বার করবেই। আমিও করেছিলাম। পোষা কুকুরের মতো বড়কর্তাদের পায়ে পায়ে ঘুরতাম, দু—চার টুকরো মাংসের জন্য না পারি কী? দরকার হলে জিভ দিয়ে ওদের জুতো পর্যন্ত সাফ করে দিতে পারতাম। আজও পারি।

শুধু চাটুকারিতা বা তোষামোদ না, মাঝে মাঝে ধার—টার করে দামি হোটেলে পার্টি পর্যন্ত দিয়েছি। কর্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য চড়াদামে মেয়েমানুষের শরীর কিনে ঘুষ দিয়েছি। নগদ নগদ তার ফলও পেয়েছি। একদিন আবিষ্কার করেছিলাম, কেরানিত্বের গণ্ডী পেরিয়ে ছোটখাটো অফিসার হয়ে গেছি। ছোট অফিসার থেকে ক্রমশ আরো ওপরে উঠতে লাগলাম, এক—আধ বছরের মধ্যে ডিপার্টমেন্টাল ম্যানেজার হয়ে যাব।

অফিসার হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চালচলন, ধরন—ধারণ পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল। পার্টি—ক্লাব—ড্রিঙ্ক নিয়ে মেতে উঠেছিলাম। সকালবেলা স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে যেতাম, লাঞ্চ অফিসেই সারতাম। ছুটির পর ক্লাব। মাঝেরাতে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন আমার ভেতর আমি থাকতাম না। কোনোদিনই ঘাড়ের ওপর মাথা সিধে রেখে স্বাভাবিক পায়ে ফিরতে পারতাম না। কোনোদিন হামাগুড়ি দিয়ে, কোনোদিন টলতে টলতে সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে আমাকে উঠতে হত। বেশির ভাগ দিনই দরজা পর্যন্ত এসে বমি করে ফেলতাম।

আমার উচ্চাশা যেখানে বাঁধা, অলকার নজর ততদূর পৌঁছোয় না। আমার সুখের ধারণার সঙ্গে তার সুখের ধারণার কোনো মিল নেই। আমাকে ঘিরে শান্ত স্তিমিত নিস্তরঙ্গ উত্তেজনাহীন একটি জীবনকে সে সুখের চরম ধরে নিয়েছিল। অফিসের সময়টুকু বাদ দিয়ে সারাদিন তার কাছে থাকি, ছুটির দিনে দু'জনে সিনেমায় যাই কিংবা শহর থেকে দূরে কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসি, এই ছিল তার কাম্য। বেশি টাকা, বেশি প্রতিষ্ঠার পেছনে উদভ্রান্তের মতো ছোটা সে পছন্দ করত না।

অলকা বলত, 'এ তুমি কী করছ?'

আমি পাল্টা প্রশ্ন করতাম, 'কী করছি?'

'টাকা টাকা আর প্রমোশন করে এমন পাগল হয়ে উঠেছ কেন?'

হেসে বলতাম, 'অল্পে আমার সুখ নেই, তাই—'

ভীরু গলায় অলকা বলত, 'কিন্তু আমরা তো বেশ আছি। তুমি যা মাইনে পাও তাতেই আমাদের ভালোভাবে চলে যাবে। আর টাকার দরকার নেই।'

'আছে।'

'কী হবে আরো টাকা দিয়ে?'

'ওটার খুব প্রয়োজন। বেশি টাকা মানেই বিরাট স্টেটাস।'

'বেশি টাকা থাকলে অনেক আরাম হয়তো হয়, কিন্তু—'

'কিন্তু কী?'

'টাকায় কি সুখ কেনা যায়?'

শরীরের সবটুকু শক্তি গলায় ঢেলে বলতাম, 'নিশ্চয়।'

একেক দিন অলকা বলত, 'টাকা চাও, প্রমোশন চাও, তার না হয় একটা মানে বুঝলাম। কিন্তু রোজ রোজ মদ খাও কেন?

'আরে বাপু, মদই তো ওপরে ওঠবার সিঁড়ি।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'রোজ মাঝরাত্তিরে কোন অবস্থায় টলতে টলতে বাড়ি ফেরো তুমি তা তো বুঝতে পারো না। বুঝবে কি, তোমার তখন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, মনুষ্যত্ব থাকে না। চারধারের লোক তোমার কাণ্ড দেখে মুখ টিপে টিপে হাসে। তখন আমার কী ইচ্ছে হয় জানো?'

'কী?'

'ইচ্ছে হয় গলায় দড়ি দিই।'

আবহাওয়াটা হাল্কা করবার জন্য বলতাম, 'ইচ্ছেটা মোটেই সদিচ্ছা নয়।'

অলকা বলত, 'তুমি যাই বল, একদিন দেখবে আমি ঠিক আত্মহত্যা করে বসেছি।'

অলকা যা খুশি বলুক, আমি গ্রাহ্য করতাম না। আমি আমার পথেই চলতে লাগলাম। দু'জনের মাঝখানে দূরত্ব বাড়তেই লাগল।

অবস্থা যখন এইরকম, সেই সময় চরম ঘটনাটি ঘটল।

আমাদের অফিস থেকে কোম্পানির 'গেল্ডেন—জুবলি' বছর উপলক্ষে একটা পার্টি দেওয়া হয়েছিল। অফিসার র‍্যাঙ্কের কর্মচারীদেরই শুধু তাতে প্রবেশাধিকার। সবাইকে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

সে বছর আমার একটা প্রমোশনের ব্যাপার ছিল। কাজেই পার্টি সম্বন্ধে আমার উৎসাহই ছিল সব চাইতে বেশি।

আগে কখনও কোনো পার্টিতে অলকাকে নিয়ে যেতে পারিনি। মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মদ খাবে, এর স্ত্রী ওর স্বামীর গা জড়াজড়ি করে নাচবে—আধুনিক নাগরিক জীবনের এই সব স্বাভাবিক ঘটনাকে বেলেল্লাপনা মনে করত অলকা এবং তীব্রভাবে ঘৃণাও করত। অলকার যখন এত বিতৃষ্ণা, এত অনিচ্ছা তখন আর তাকে টানাটানি করতাম না।

কিন্তু গোল্ডেন—জুবলি ইয়ারে কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন প্রত্যেকেই যেন নিজের নিজের স্ত্রীকে নিয়ে আসেন। 'আওয়ার্স ইজ এ হ্যাপি ফ্যামিলি। আমরা চাই, শুধু সহকর্মী না, তাঁদের স্ত্রীরাও ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হোন, ঘনিষ্ঠ হোন। এতে ফেলো—ফিলিং বাড়বে।'

আমি অলকাকে ধরেছিলাম, 'এ পার্টিতে তোমাকে যেতেই হবে।'

অলকা প্রবলভাবে মাথা এবং দু হাত নেড়ে বলেছিল, 'না—না, কিছুতেই না।'

'আরে বাপু, তুমি একাই যাচ্ছ না, সব অফিসারের স্ত্রীরাই যাচ্ছেন। অমন যে এ্যাকাউন্টস অফিসার মিস্টার ভাদুড়ির স্ত্রী, যাঁকে সবাই বলে অসূর্যম্পশ্যা, তিনি পর্যন্ত যাচ্ছেন। তোমাকে যেতেই হবে। নইলে আমার মান—ইজ্জৎ থাকবে না।'

অনেক বলে—কয়ে, অনুনয়—বিনয় করে অলকাকে রাজি করিয়েছিলাম। সে রাজি না হলেই বুঝি ভালো হত।

বিরাট হোটেলের সুবিশাল ব্যাঙ্কুয়েট হলে পার্টি দেওয়া হয়েছিল। ছোট ছোট এক‌েকটা টেবিলে সস্ত্রীক এককে জন অফিসার বসে ছিলেন। অলকা আর আমিও একটা টেবিল দখল করেছিলাম। সামনের দিকে উঁচু ডায়াসে গোয়াঞ্চি অর্কেস্ট্রা পার্টি খুব ধীরে ধীরে বিদেশি গৎ বাজাচ্ছিল। ধবধবে উর্দিপরা বয়রা ব্যস্ত পায়ে ঘুরে ঘুরে সফট এবং হট ড্রিঙ্ক টেবিলে টেবিলে দিয়ে যাচ্ছিল।

ব্যাঙ্কুয়েট হলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অলকা বলতে শুরু করেছিল, 'এখানে আমার ভালো লাগছে না। আমাকে বাড়ি নিয়ে চল।'

বলেছিলাম, 'কী পাগলের মতো বকছ! এখন বাড়ি ফেরা যায় নাকি? ডিসেন্সি বলেও তো একটা কথা আছে।'

তবু অলকা ঘ্যান ঘ্যান করেই যাচ্ছিল। শেষ দিকে তার কথায় আমি আর কান দিই নি।

এদিকে আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মগনলালজী এসে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এ কি, আপনারা আলাদা আলাদা ছড়িয়ে রয়েছেন কেন? মাঝখানে এসে আলাপ—পরিচয় করুন।'

বলামাত্র নিজের নিজের স্ত্রীকে নিয়ে সবাই হলের মাঝখানে চলে গিয়েছিল। অলকাকে নিয়ে আমিও গিয়েছিলাম। তারপর স্ত্রীদের মধ্যে পরিচয়ের পালা শুরু হয়েছিল। অন্য অফিসারদের স্ত্রীরা চড়াও হয়ে আলাপ—টালাপ করছিল, কিন্তু অলকা ওসবে নেই; আড়ষ্টের মতন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। অলকার জন্য আমি খুবই অস্বস্থি বোধ করছিলাম।

মগনলালজী আসবার পরই অর্কেস্ট্রায় চড়া সুর বাজতে শুরু করেছিল। এখন যেন স্নায়ুর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাচ্ছে। আর কি আশ্চর্য, কখন যে একটা ক্যাবারে ড্যান্সার ডায়াসে এসে গিয়েছিল, কে বলবে। মেয়েটার বয়েস কুড়ি—বাইশের মধ্যে। তার শরীরে সৌন্দর্যের চাইতে বন্যতা বেশি। উদ্দাম বেপরোয়া স্বাস্থ্যের প্রতিটি রেখা থেকে বিদ্যুৎ—তরঙ্গ ঠিকরে ঠিকরে পড়ছিল।

মেয়েটার বুকের কাছে এক টুকরো পাতলা কাপড়ের আবরণ, কোমরের তলায় আঁটো—সাঁটো জাঙ্গিয়া। এই পোশাক তার শরীরের অদৃশ্য রহস্য যেন আরো বেশি করে ফুটিয়ে তুলেছিল। বাজনার তালে তালে নানারকম মুদ্রায় সে হাত—পা ছুঁড়ছিল আর ব্যাঙ্কুয়েট হলের প্রতিটি মানুষের বুকে রক্ত ছলকাচ্ছিল।

ক্যাবারে নাচিয়ের দিকে এক পলক তাকিয়েই চোখ বুজে ফেলেছিল অলকা। তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। চাপা গলায় সে বলেছিল, 'এক সেকেণ্ডও আমি আর এখানে থাকব না। কোনো ভদ্র রুচির মানুষ এখানে আসতে পারে, এ আমি কল্পনাই করতে পারি না।'

অলকাকে ওখানে নিয়ে যাওয়া যে ঠিক হয়নি, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম। বলেছিলাম, 'চুপ কর, চুপ কর। কেউ শুনতে পেলে কী ভাববে!'

অলকা আমার কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না। জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওই অসভ্য ছুঁড়িটা কী করছে?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ। নাচছে।'

'ওই রকম ইতরামি আর বেলেল্লাপনার নাম নাচ?'

'যে নাচের যে ধরন।'

'বুঝলাম না হয় ওটাই ধরন। তাই বলে ন্যাংটো হয়ে লোকের সামনে আসতে হবে? লজ্জাসরম বলে কি ওর কিছুই নেই!'

'ওই রকম ড্রেস ছাড়া এ নাচ জমে না।'

'নাচ মাথায় থাক; তুমি আমায় বাড়িতে দিয়ে এস।'

আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম, সেই সময় মগনলালজীর গলা আবার শোনা গিয়েছিল। আমাদের মধ্যে এসে তিনি বলছিলেন, 'হ্যালো মিস্টার দাশগুপ্ত, মিস্টার ভাদুড়ি, মিস্টার মাথুর, প্লীজ ইন্ট্রোডিউস মী টু ইওর ওয়াইভস—'

দাশগুপ্ত, ভাদুড়ি, মাথুর মালহোত্রা, চ্যাটার্জি বাবুর দল মগনলালজীর সঙ্গে নিজেদের স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন। 'হিয়ার ইজ যাওয়ার অনারেবল ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অ্যান্ডস্যার শী ইজ মাই ওয়াইফ রীতা—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

আলাপ—পরিচয় করতে করতে মগনলালজী আমাদের কাছে চলে এসেছিলেন, 'নাউ মিস্টার লাহিড়ী, ইন্ট্রোডিউস মী—'

অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে গদগদ স্বরে বলেছিলাম, 'ইয়েস স্যার, এই আমার স্ত্রী—অলকা। আর ইনি—'

মগনলালজী হাতজোড় করে অলকার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি স্থির, পলকহীন। বেশ কিছুক্ষণ পর মুগ্ধ গলায় বলেছিলেন, 'শী ইজ সো নাইস; এক্সকুইজিটলি বিউটিফুল। আপনার মতো সুন্দরী মহিলা আমি খুব বেশি দেখিনি।'

অলকার কানের কাছে মুখ নিয়ে নীচু গলায় বলেছিলাম, 'এমন কমপ্লিমেন্টস দিলেন; ওঁকে ধন্যবাদ দাও।'

অলকা চুপ। তার মুখে পলকে পলকে দুরন্ত বেগে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যাচ্ছিল। ঠোঁটের প্রান্ত থরথর কাঁপছিল।

মগনলালজী এবার আমার দিকে ফিরেছিলেন, 'আপনার ভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি মিস্টার লাহিড়ী। এমন রূপসী মহিলার স্বামী আপনি!'

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম, 'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার; মেনি থ্যাঙ্কস—'

আমাকে ছেড়ে মগনলালজী আবার অলকার দিকে ঝুঁকেছিলেন, 'মিসেস লাহিড়ী, আমার খুব ইচ্ছে আসছে শনিবার মিস্টার লাহিড়ী আর আপনি আমার সঙ্গে চা খান। এই অনুরোধটা রাখলে খুব আনন্দিত হব।'

পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, 'মোস্ট গ্ল্যাডলি স্যার, এ তো আমাদের সৌভাগ্য।' মগনলালজী চা খেতে ডেকেছেন; আমার পক্ষে এ আশাতীত। আমি যেন দেখতে পাচ্ছিলাম, ভাগ্যের দরজা খুলে গেছে।

অলকা কিন্তু কোনো কথা বলছিল না। তার একটা ঠোঁটের ওপর আরেকটা ঠোঁট চেপে বসেছে, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছিল। অলকার কানের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে অত্যন্ত উদ্বেগের সুরে বলেছিলাম, 'কী হচ্ছে এসব, সাধারণ ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত তোমার নেই। প্লীজ অলকা, প্লীজ, মগনলালজীকে বল, আমরা চা খেতে যাব। ওঁকে ধন্যবাদ দাও।'

অলকা চুপ। মনে হচ্ছিল আমাকে অপদস্থ করার জন্য যেন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে সে। এর চাইতে ওকে না আনলেই যেন ভালো হত।

এদিকে মগনলালজী আবার অলকার দিকে তাকিয়েছিলেন, 'আপনি কিন্তু কিছুই বলছেন না মিসেস লাহিড়ী। ডু ইউ ডিসলাইক মাই কম্পানি?'

ভয়ে উদ্বেগে হৃৎপিণ্ড যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে উঠে এসেছিল। বুকের ভেতর অসহ্য রক্তের চাপ অনুভব করেছিলাম। দেখতে পাচ্ছিলাম, সৌভাগ্যটা হাতের মুঠোয় এসেও বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলাম, 'সে কি স্যার, না—না, আপনার সঙ্গ ও যথেষ্ট পছন্দ করছে। ব্যাপারটা হল, আমার স্ত্রী ভারি লাজুক, তাই—'

মগনলালজী কী বুঝেছিলেন তিনিই জানেন। উত্তর না দিয়ে সামান্য হেসেছিলেন।

নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা করছিল আমার। মনে হচ্ছিল আঁচড়ে কামড়ে নিজেকে ক্ষত—বিক্ষত করে ফেলি। কিন্তু ব্যাঙ্কুয়েট হলে দাঁড়িয়ে কিছুই করা যাচ্ছিল না। আমি অলকার কানের কাছে মুখ এনে করুণ মিনতিপূর্ণ সুরে শুধু বলতে পেরেছিলাম, 'অলকা, বুঝতে পারছ না, আমার কত বড় ক্ষতি করছ। আমাকে একটু দয়া কর, মগনলালজীর সঙ্গে কথা—টথা বল।'

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। জেদী একগুঁয়ে মেয়ের মতো ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়েই ছিল অলকা।

এই সময় মগনলালজী আমাদের ছেড়ে সমস্ত ব্যাঙ্কুয়েট হলের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে বলেছিলেন, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, আপনারা অনুমতি দিলে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

সবাই সমস্বরে সাগ্রহে বলে উঠেছিলেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই; আপনি বলুন স্যার।'

'আমার ইচ্ছা, এক মিনিটের জন্যে ব্যাঙ্কুয়েট হলের সব লাইট নিভিয়ে দেওয়া হবে। অ্যান্ড উই শ্যাল হ্যাভ মেরিমেন্ট ইন ইট।'

'অবশ্যই স্যার, অবশ্যই।'

একটু পরেই হলের আলোগুলো নিভে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডায়াসের ওপর অর্কেস্ট্রায় ঝড়ের গতি নেমে এসেছিল। প্রবল উদ্দাম শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছিল যেন। তার মধ্যেই আমার চারপাশে চুম্বনের নানারকম শব্দ হচ্ছিল।

আমাদের ডান দিকে মিস্টার ঘোষের স্ত্রী সুনীতা ঘোষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক মিনিট মোটে সময়। তার ভেতর যে যতটুকু মজা লুটে নিতে পারে। অন্ধকারে সুনীতা ঘোষকে আমি খুঁজছিলাম।

হঠাৎ ব্যাঙ্কুয়েট হলের সব শব্দ ছাপিয়ে অলকার তীক্ষ্ন চিৎকার শোনা গিয়েছিল। আমি চমকে উঠেছিলাম। ভয়, দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা, সব একাকার হয়ে আমাকে বিমূঢ় করে ফেলছিল। কী করব, কী করা উচিত, বুঝতে পারছিলাম না।

এই সময় আবার হলের আলোগুলো দপ করে জ্বলে উঠেছে। অলকা তখনও চিৎকার করছে। 'জানোয়ার, পশু, ইতরামো করার আর জায়গা পাও নি।' তার দুই হাত মগনলালজীর ঘাড়ের কাছটা খামচে ধরেছিল। ধারাল নখগুলো মগনলালজীর লালচে মসৃণ চামড়ায় গেঁথে যাচ্ছিল।

সেই মুহূর্তে অলকাকে বাঘিনীর মতো লাগছিল। ভরাট গ্রীবার তলা থেকে দুটো হাড় পেরেকের মতন ফুটে বেরিয়েছিল। গলার শিরগুলো নারকেল দড়ির মতো ফুলে ফুলে উঠেছিল। চোখ দুটো যেন দু'টো রক্তের ডেলা।

হলের সবগুলো চোখ তখন অলকা আর মগনলালজীর ওপর স্থির। ডায়াসের বাজনা থেমে গেছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। সবাই শ্বাসরুদ্ধের মতন দাঁড়িয়ে আছে।

অলকাকে মগনলালজীর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে যাব, তার আগেই অঘটন ঘটে গিয়েছিল। অলকা পা থেকে জুতো খুলে মগনলালজীর গালে কষিয়ে দিয়েছিল, 'নাউ ইউ হ্যাভ লেসন। আই থিঙ্ক, ইউ উইল নেভার ফরগেট ইন ইওর লাইফটাইম।' বলে আর দাঁড়ায়নি। লম্বা লম্বা পা ফেলে হল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

আমি যে কীভাবে ফিরে এসেছিলাম, আজ আর মনে নেই।

বাড়ি ফিরে ক্রুদ্ধ—হিংস্র—চাপা গলায় বলেছিলাম, 'এর মানে কী?'

অলকা সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও।'

'কোনো কথার জবাব দেব না। কেন—কেন তুমি আমার এতবড় সর্বনাশ করলে?'

'কীসের সর্বনাশ?'

'বুঝতে পারছ না?' অলকার চোখে আগুন জ্বলছিল।

'আমার প্রমোশন, আমার প্রমোশন।' ক্ষিপ্তের মতো, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যর মতো আমি হাত—পা ছুড়েছিলাম, আমার মাথা থেকে আগুন ছুটছিল, 'ওপরে ওঠবার সুযোগ চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল।' কথাগুলো সীসের ডেলার মতো ভারী হয়ে আমার গলার কাছে আটকে আটকে যাচ্ছিল।

'তুমি প্রমোশনের কথা ভাবছ আর ওই লোকটা, তোমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, অন্ধকারে আমাকে জড়িয়ে ধরে—'

অলকার কথা শেষ হবার আগেই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। টেনে টেনে বলেছিলাম, 'সতী!' একটু জড়িয়ে ধরলে গায়ে ফোস্কা পড়ে যায়।'

'কী বলছ তুমি! আমি তোমার স্ত্রী!'

'চোপ মাগী, আজ তোকে খুনই করে ফেলব।' হিতাহিতজ্ঞানশূন্যের মতো অলকার গলা টিপে ধরেছিলাম। তারপর ঘরের এককোণে তাকে ছুঁড়ে দিয়ে কিল—চড়—লাথি চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

দু'হাতে মার আটকাতে আটকাতে অলকা বলে যাচ্ছিল, 'তুমি আমাকে মারলে, তুমি আমাকে মারলে—'

'তুই আমার এতবড় ক্ষতি করলি, তোকে শেষ করে ফেলাই উচিত।'

পরের দিনই অলকা তার বাবার কাছে চলে গিয়েছিল। তারপর কোর্টকাছারি, উকিল—মুহূরি, ছোটাছুটি। মাঝখানে হিতাকাঙ্ক্ষী দু'একজন বন্ধু সন্ধির চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুই হয়নি, একদিন কোর্টের রায়ে পাকাপাকি বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

খবর পেয়েছিলাম, রায় বেরুবার পর মাস্টারি নিয়ে অলকা পাটনা চলে গেছে।

তারপর আর কিছুই জানি না।

এদিকে আমি পুরনো ফ্ল্যাট ছেড়ে আরো সাউথে চলে গিয়েছিলাম, আবার বিয়েও করেছি। আমার এবারকার স্ত্রীর নাম সাধনা।

তারপর এতকাল বাদে পুরীর সমুদ্রতীরে আবার অলকাকে দেখলাম।

হোটেলে ফিরে দেখলাম, সাধনা মুখ—টুখ ধুয়ে হাল্কা প্রসাধন সেরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছে।

সাধনা বলল, 'কী ব্যাপার, আজ তোমার ফিরতে এত দেরি?'

চট করে উত্তর দিলাম না। একটু ভেবে আস্তে আস্তে বললাম, 'আর বোলো না, 'বীচে' এক ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়েছিলাম। একেবারে নাছোড়বান্দা। আমাকে টানতে টানতে ওঁদের হোটেলে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'আমি কিন্তু খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আরেকটু দেখে তোমাকে খুঁজতে 'বীচে' যেতাম। যাক গে, এখন এসো তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নিই। মনে আছে তো, আজ ন'টার সময় হরিণের চামড়ার চটি ডেলিভারি আনতে যেতে হবে?'

আমি যে খানিক আগে চা খেয়েছি, সে কথা বলতে সাহস হল না। অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর হোটেলে গিয়ে কী কথাবার্তা হল কাকে কাকে দেখলাম, এসব জানতে চায়নি সাধনা। ফলে কিছুটা আরাম বোধ করলাম। দ্রুত শ্বাস টানার মতো করে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে বৈকি। চটি নিয়ে চল একবার মন্দিরের ওধারের বাজারটায় ঘুরে আসি।'

'বাজারে কেন?'

'কিছু হাড়ের জিনিস কিনব। তুমিও সেদিন বলছিলে না, শাঁখ—টাখ কড়ি—ফড়ি কী কিনবে—'

'তাড়াহুড়োর কী আছে, আমরা তো আছিই কিছুদিন। পরে ধীরে—সুস্থে কিনব।'

খানিক ইতস্তত করে বললাম, 'ভাবছিলাম—'

সাধনা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কী'?

'পুরীতে আর ভালো লাগছে না। ভাবছি কেনাকাটা যা সারবার আজই সেরে রাত্তিরের ট্রেনে চলে যাব।' বার বার অলকার মুখ মনে পড়ে যাচ্ছিল। এখানে বেশিদিন থাকলে আর সোমনাথ চক্রবর্তী যেরকম নাছোড়বান্দা তাতে অলকার সঙ্গে আবার দেখা হবেই। আমার বুকের ভেতর থেকে ফিসফিসিয়ে কেউ যেন বলতে লাগল, অলকার সঙ্গে আর দেখা না হওয়াই ভালো।

সাধনা বলল, 'পুরী হঠাৎ খারাপ হয়ে উঠল যে? কাল রাত্তিরেও তো এই জায়গাটার কত গুণগান করছিলে।'

মনে মনে থতিয়ে গেলাম। রাতারাতি পুরীকে ভালো না লাগার কারণ—স্বরূপ বললাম, 'এখন অফ—সীজন, বড্ড বৃষ্টি হচ্ছে।' বলেই মনে হল, যুক্তিটা তেমন জোরালো হয়নি।

'বাঃ।'

'কী হল?'

'অফ সীজন আর বৃষ্টি হবে জেনেই তো পুরী এসেছ।'

আমি চুপ।

সাধনা বলতে লাগল, 'আগে আর কখনও আমি সমুদ্রের ধারে আসিনি। আসা যখন হয়েছেই, তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরছি না।'

হঠাৎ যেন হাতের কাছে একটা অবলম্বন পেয়ে গেলাম, 'সমুদ্র দেখতে চাও, এই তো? চল গোপালপুর—অন—সী—তেই যাই। পুরীর চাইতে গোপালপুরের 'বীচ' ফার—ফার বেটার। ওখানকার ব্রেকার দেখলে অবাক হয়ে যাবে।'

পলকহীন কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল সাধনা। তারপর বলল, 'গোপালপুর তো আরো সাউথে, সেখানে এখন অফ সীজন আর বৃষ্টি হবে না? তা ছাড়া পুরী এসে ক'দিন তো হোটেলেই আটকে আছি। ভুবনেশ্বর দেখা হল না, উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখা হল না। কোনারক যাওয়া হল না। এসব না দেখে আমি নড়ছি না।'

একটা ফাঁদের মধ্যে আমি যেন জড়িয়ে যাচ্ছিলাম। শিথিল গলায় বললাম,

'না, মানে—'

একটুক্ষণ কী ভাবল সাধান। তারপর বলল, 'তোমার কী হয়েছে বল তো?'

চমকে উঠে বললাম, 'কই, কিছু না।'

ব্রেকফাস্টের পর জুতোপট্টিতে গেলাম। কিন্তু চটি ডেলিভারি নেবার পরই বৃষ্টি নেমে গেল। অগত্যা আবার হোটেলে ফিরে আসতে হল।

রোজই সকালে 'বীচে' বেড়িয়ে হোটেলে ফিরি। তারপর ব্রেকফাস্ট সেরে সাধনাকে নিয়ে আবার বেরুই। এদিক সেদিকে ঘুরে দুপুরবেলা ফিরে আসি। আজ আর দ্বিতীয়বার বেড়ানোটা হল না।

সেই সে জুতোপট্টি থেকে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ফিরেছিলাম, তারপর সারাদিন এক মিনিটের জন্য আর কামাই নেই। বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই।

দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটায় বিকেল হয়ে গেল। আচমকা, আমার মনে পড়ে গেল সোমনাথ চক্রবর্তী সাধনাকে আর আমাকে এবেলা চা খাবার নেমন্তন্ন করেছেন। নেমন্তন্নর কথাটা সাধনাকে বলিনি।

হোটেলের বিছানায় শুয়ে জানলার বাইরে ঝাপসা বৃষ্টিবিলীন আকাশ দেখতে দেখতে একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া গেল, এই দুর্যোগে অন্তত সোমনাথ চক্রবর্তীর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতে হচ্ছে না। এক সমস্যা মিটল, শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, কেমন করে সাধনাকে নিয়ে পুরী থেকে চলে যাওয়া যায়।

কিন্তু সমস্যা কাটল বলে যখন আমি নিশ্চিত, সেইসময় দেখা গেল ওয়াটারপ্রুফ আর গাম বুট চড়িয়ে এই বর্ষার মধ্যে সোমনাথ এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম, সোমনাথ চক্রবর্তীকে চিনতে আমার অনেক বাকি ছিল। ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দেবার অপেক্ষায় থাকলেন না। গাম—বুট আর ওয়াটারপ্রুফ বাইরে রেখে মুহূর্তে সাধনার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললেন। তারপর আমার দিকে আড়ে আড়ে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার স্বামীটিকে দায়রায় সোপর্দ করা উচিত।'

সামান্য আলাপেই সোমনাথের আমুদে স্বভাবটা মোটামুটি ধরতে পেরেছিল সাধনা। হাসতে হাসতে বলল, 'কেন বলুন তো?'

‘এই দেখুন না ওবেলা মিস্টার লাহিড়ীকে বলে দিয়েছিলাম, আপনাকে নিয়ে যেন এবেলা আমার ওখানে চা খান। সেই বেলা তিনটে থেকে ঘড়ি দেখছি তো ঘড়িই দেখছি। কিন্তু আপনাদের পাত্তাই নেই।’

‘আপনার ওখানে এবেলা চা খাবার কথা তো ও কিছু বলেনি।’

সোমনাথকে দেখেই আমার বুকের ভেতরটা অজানা উদ্বেগে ঢিব ঢিব করছিল। ব্যস্তভাবে সাধনাকে বললাম, ‘ওবেলা বলিনি, ভেবেছিলাম, এবেলা তোমাকে একটা সারাপ্রাইজ দেব। কিন্তু এমন বৃষ্টি নামল ‘যাব কী করে?’

সোমনাথ বললেন, ‘ইচ্ছা থাকলে কি আর উপায় হয় না? আমি এলাম কেমন করে?’ একটু থেমে আবার, ‘কেউ আসবার কথা থাকলে, যদি না আসে, কী খারাপ যে লাগে!’

সাধনা বলল, ‘আমারও খুব খারাপ লাগে। মনে হয়, বাকি দিনটাই মাটি।’

সোমনাথ বললেন, ‘নিন, এবার চলুন—’

আমি চমকে উঠলাম, ‘কোথায়?’

‘কোথায় আবার, আমার হোটেলে—’

‘এই বৃষ্টিতে কেমন করে যাব? আমাদের আবার ছাতা—টাতা নেই।’

‘আপনাদের জন্য দুটো রেনকোট জোগাড় করে এনেছি, আর দুটো সাইকেল রিক্সা। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না।’

গলে যাবার মতো কোনো ছিদ্রই রাখেন নি সোমনাথ চক্রবর্তী, সুচারুরুপে সব ফাঁক বুজিয়ে তবেই এখানে হানা দিয়েছেন। বুঝতে পারছিলাম, গলায় ফাঁস আটকে আসছে। শেষ চেষ্টা করে করুণ মুখে তবু বললাম, ‘আজ না হয় থাক, এত বৃষ্টি নিয়ে—’

‘আরে মশাই, এমন ভাবে মুড়ে আপনাকে নিয়ে যাব যে গায়ে একটি ফোঁটা পড়বে না। উঠুন—উঠুন—’

সাধনাও ওদিক থেকে ধমকের গলায় বলল, ‘তুমি কী বল তো! ভদ্রলোক এত কষ্ট করে এলেন আর তুমি যেতে পারবে না? ওঠ—ওঠ—’

দেখা গেল, আমার গলায় ফাঁস আটকাবার ব্যাপারে সোমনাথ আর সাধনার মধ্যে প্রচুর মিল।

শেষ পর্যন্ত যেতেই হল। সোমনাথের হোটেলে গিয়ে খুব খাওয়া দাওয়া হল। সোমনাথ আর সাধনা প্রচুর কথা বলল, হাসাহাসি করল। অলকা আর আমি কিন্তু আড়ষ্টের মতো বসে থাকলাম।

সোমনাথের সুইটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করেছি, একদৃষ্টে প্রায় পলকহীন সাধনার দিকে তাকিয়ে আছে অলকা।

অনেক রাত্তিরে ছাড়া পাবার পর বিদায় নিলাম। আসবার সময় সাধনা ওদের পাল্টা নেমন্তন্ন করল। আমার গলায় সেই ফাঁসটা আরেক পাক জড়িয়ে গেল।

এরপর থেকে এবেলা সোমনাথের হোটেলে আড্ডা জমলে ওবেলা বসে আমাদের হোটেলে। ওই নেমন্তন্নর ব্যাপারে আমার বা অলকার দিক থেকে উৎসাহ নেই। কিন্তু সাধনা আর সোমনাথের যেন ক্লান্তি নেই। শুধু পুরীর হোটেলেই নাকি, সাধনা আমাদের

কলকাতার ঠিকানা দিয়ে বার বার অনুরোধ করেছে, 'কলকাতায় এলে আমাদের ওখানেই উঠবেন।' সোমনাথও পাটনার যাবার নেমন্তন্ন আগেভাগেই সেরে রেখেছেন। শুনতে শুনতে আমার শ্বাস আটকে এসেছে।

আড্ডাই শুধু দিই না, একেক দিন তাসের আসরও বসে। তাস খেলতে বসলেই অলকাকে আমার পার্টনার করে দ্যান সোমনাথ। অসহায়ের মতন আমি বলি, 'তার চাইতে আপনি আর আমি পার্টনার হই। মেয়েদের সঙ্গে লড়ে দেখাই যাক, কারা জেতে।'

'উঁহু,—'সোমনাথ জোরে জোরে মাথা নাড়েন।

'কী।'

'মিক্সড ডাবলস হবে।'

একটু ভেবে বলি, 'আচ্ছা এক কাজ করা যাক।'

'আবার কী?'

'আমি আর সাধনা পার্টনার হই, আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে জুটি বাঁধুন।'

সোমনাথ হাসতে হাসতে বলেন, 'আরে মশাই, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে চিরকালই তো জুটি বেঁধে থাকতে হবে। অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে জুটি বাঁধলে কেমন লাগে দেখুন না—'

নিতান্ত হালকা গলায় পরিহাসের ছলে বলেন সোমনাথ, তবু ভীষণভাবে চমকে উঠে নিজের অজান্তেই অলকার দিকে তাকাই। তক্ষুনি চোখাচোখি হয়ে যায়। অলকাও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সোমনাথ আবার বলেন, 'আরে মশাই, খেলুন খেলুন তো আপনি তো আর আমার স্ত্রীর ভাসুরঠাকুর নন।'

খেলে যাই ঠিকই, কিন্তু কিছুতেই যেন জমে না।

অলকা অথবা আমি যে সহজ স্বচ্ছন্দ হতে পারি না, সেটা সাধনার চোখে পড়েছে। একদিন সে বলল, 'কী ব্যাপার, মিসেস চক্রবর্তীর কাছে তুমি অমন কাঠ হয়ে থাক কেন? তোমার যে এত লজ্জা, আগে তো জানতাম না।'

জড়ানো গলায় বললাম, 'কই, লজ্জা আবার কোথায়?'

দশ দিন হল আমরা পুরী এসেছি। এর মধ্যে এমন একটা দিনও কাটেনি যেদিন বৃষ্টি হয়নি।

দশ দিন পর আজই প্রথম নির্মেঘ আকাশ চোখে পড়ল। সকাল থেকে সারাটা দিন ঝলমলে সোনালি রোদ পুরীর গায়ে আদরের মতো লেগে রয়েছে।

সন্ধের পর নীলাকাশে চন্দনের পাটার মতো গোল একটি চাঁদ উঠল। তারায় তারায় আকাশটা ছেয়ে গেল।

এবেলা আমার হোটেলে আড্ডা বসবার কথা। একটু রাত হলে সোমনাথরা এলেন। এসেই বললেন, 'এবার পুরী এসে আজই প্রথম চাঁদ দেখলাম।'

সাধনা বলল, 'আকাশের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, দিনকয়েকের জন্যে বৃষ্টিটা বুঝি ধরল।'

আমি সায় দিলাম, 'তাই মনে হচ্ছে।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়তে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন সোমনাথ, 'বৃষ্টি যখন ধরেছে তখন চলুন না, এই ফাঁকে উদয়গিরি খণ্ডগিরি আর কোনারকটা দেখে আসি।'

আমি কিছু বলবার আগেই সাধনা লাফিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, আপনি সব ব্যবস্থা করে ফেলুন। এই সুযোগ ছাড়লে আবার কখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে।

পরের দিনই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। উদয়গিরি খণ্ডগিরি আর ওড়িশার নতুন ক্যাপিটাল দেখে দিন দুই পর ফিরলাম। মাঝখানে একটা দিন বিশ্রাম নিয়ে এবার কোনারকে।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি, হাজার আড়ষ্টতার মধ্যেও অলকা আমাকে কিছু বলতে চেয়েছে, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য আমাকে আলাদা পায়নি। সব সময় সাধনা আর সোমনাথ আমাদের কাছে কাছেই ছিলেন।

কোনারকে এসে সূর্য—মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে পাথরের দেওয়ালে নানারকম কারুকার্য দেখার ছলে অলকা পিছিয়ে পড়তে লাগল। সোমনাথ আর সাধনা বক বক করতে করতে এগিয়ে গেছে।

একটুক্ষণ ইতস্তত করলাম। তারপর সব দ্বিধা দু'হাতে ঠেলে আমিও পিছোতে পিছোতে যেখানে অলকা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে চলে এলাম।

অলকা দেওয়ালের গায়ে ঝুঁকে একটা পাথরের মূর্তি দেখছিল। আমি তার পেছনে গিয়ে খুব আস্তে ডাকলাম।

আমি যে আসব, অলকা যেন জানত। অনেকক্ষণ সেই ভাবেই ঝুঁকে থাকল সে, তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকাল।

অনেকক্ষণ পর আমিই প্রথম বললাম, 'চল, ওই বেদীটায় গিয়ে বসি।'

নিঃশব্দে আমার পিছু পিছু চলে এল অলকা। দু'জনে পাশাপাশি বসলাম।

একটু ভেবে বললাম, 'এভাবে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবতে পারিনি।'

অলকা উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পর আধফোটা শিথিল স্বরে বলল, 'আমার একটা কথা ছিল।'

'বল—' আমি উন্মুখ হলাম।

'আমি আবার বিয়ে করেছি—' বলতে বলতে অলকার ঘাড় ভেঙে যেন ঝুলে পড়ল।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' অদ্ভুত হাসলাম আমি।

'আমার যে আগে বিয়ে হয়েছিল, মিস্টার চক্রবর্তীকে জানাই নি। এ কথাটা চিরকাল গোপন রাখতে হবে।'

লম্বা শ্বাস টেনে বললাম, 'রাখব। তোমাকেও একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।'

'কী?'

'সাধনাকেও আমি জানাইনি, আগে বিয়ে করেছিলাম। তুমি তো জানোই, বাবা মা, আত্মীয়স্বজন, কারো সঙ্গেই আমার সম্পর্ক নেই। সাধনাকে যে বিয়ে করেছি কেউ জানে

না। জানলে আমার আগের বিয়ের খবর নিশ্চয়ই পেয়ে যেত। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ওকে কোনোদিন জানাবে না।'

'না।'

আমরা যেন পরস্পরের স্বার্থে অলিখিত এক চুক্তিপত্রে সই করলাম।

তারপর অনেকক্ষণ কাটল। হঠাৎ এক সময় অলকা খুব মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'সাধনাকে বিয়ে করে নিশ্চয়ই তুমি খুব সুখী হয়েছ?'

'তার আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও।'

'কী?'

'মিস্টার চক্রবর্তীকে বিয়ে করে তুমি নিশ্চয়ই সুখী হয়েছ?'

অলকার উত্তর শোনা হল না, আমার উত্তর সে জানতে পারল না। তার আগেই সোমনাথ আর সাধনা হৈ হৈ করতে করতে এসে পড়ল।

সোমনাথ বললেন, 'আরে মশাই, আপনারা এখানে বসে আছেন। ওদিকে আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

কোনোরকমে জড়ানো জড়ানো গলায় উচ্চারণ করলাম, 'বড্ড টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলাম।'

'একটু হেঁটেই টায়ার্ড! উঠুন—উঠুন—'

অলকা আর আমি উঠে পড়লাম। সোমনাথদের সঙ্গে যেতে যেতে একটা কথা বার বার মনে হতে লাগল। আদালতের রায়ে সেদিন যা শেষ হয়ে গেছে ভেবেছিলাম, আজ মনে হচ্ছে মৃত্যু পর্যন্ত তার জের টেনে যেতে হবে।

—

ফুলকিয়ার জন্য

উঁচু টিলাটার মাথায় উঠতেই ডাকটা শুনতে পেল ধর্মু, ‘হেই রুখো, রুখো যা—ও—ও—ও—ও—’

গলার স্বরটা খুবই চেনা। ধর্মু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ঘুরে দাঁড়াতেই ফুলকিয়াকে দেখতে পেল।

টিলাটার ঢালে তেমন গাছপালা নেই। কস্তিকরির কিছু ঝাড় আর বেঁটে বেঁটে ত্রিভঙ্গ চেহারার কয়েকটা সীসম গাছ এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সে—সবের ফাঁক দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ুতে দৌড়ুতে উঠে আসছিল ফুলকিয়া।

এখন দুপুরও না, আবার বিকেলও না। সময়টা দুইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় থমকে রয়েছে।

গরম কাল শেষ হয়ে আসছে। আর দশ—পনেরো দিনের মধ্যেই বর্ষা নেমে যাবে। এখানে—মধ্যপ্রদেশের এই বস্তার জেলার আকাশে এর মধ্যেই টুকরো টুকরো ছন্নছাড়া মেঘ হানা দিতে শুরু করেছে। বর্ষার আগে আগে এই সময়টায় রোদে তাত নেই, তার গায়ে ঝলসে—ওঠা ছুরির ধারও নেই। তখনকার রোদ বাসি হলুদের মতো ম্যাড়মেড়ে।

ধর্মু যে টিলাটার মাথায় দাঁড়িয়ে আছে তার পশ্চিম দিকে বিশাল একটা গাঁ চোখে পড়ে, তার নাম তিরুকোট। ফুলকিয়ারা তিরুকোটে থাকে। ধর্মু অবশ্য ওখানে থাকে না, তার গাঁ এখান থেকে চার মাইল উত্তরে বরবৌলি তালুকে।

টিলাটার পুব দিকে আধ মাইল হেঁটে গেলে বস্তার জেলার রিজার্ভ ফরেস্ট বা সংরক্ষিত বনের সীমানা শুরু হয়েছে। ছোট—বড় এবং মাঝারি নানা মাপের অগুনতি পাহাড়ের গায়ে বস্তারের এই রিজার্ভ ফরেস্ট। বনভূমির মাথায় ছেঁড়া ছেঁড়া রঙিন কাগজের টুকরোর মতো নানা রঙের হাজার হাজার পাখি উড়ছে।

আকাশের মেঘ, মরা রোদ বা ঝাঁক ঝাঁক পাখি কিংবা দূরের পাহাড় আর ফরেস্টের গাঢ় সবুজ রঙের ঘন জঙ্গল কোনও দিকেই লক্ষ নেই ধর্মুর। একদৃষ্টে, প্রায় পলকহীন ফুলকিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে সে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বুকের ভেতর পাহাড়ী নদীর দুরন্ত ঢলের মতো কিছু একটা বয়ে যেতে লাগল।

ধর্মুর পুরো নাম ধর্মু সিং, জাতে তারা রাজপুত ক্ষত্রিয়। কয়েক পুরুষ ধরে ধর্মুরা মধ্যপ্রদেশে বস্তার জেলায় রয়েছে। অনেক কাল এখানে থাকতে থাকতে তাদের চাল—চলন আচার ব্যবহার এখানকার মতোই হয়ে গেছে।

ধর্মুর বয়স পঁচিশ—ছাব্বিশ। লম্বা প্রায় ছ—ফুট। সরু কোমর, চ্যাটালো বুক, শক্ত চওড়া কাঁধ। হাত দুটো জানু ছাপিয়ে নেমে গেছে। এক পলক তাকিয়েই টের পাওয়া যায় সে একজন দুর্দান্ত বলশালী জোয়ান।

ধর্মুর মুখ লম্বাটে। খাড়া নাকটা সটান তার কপাল থেকে নেমে এসেছে, তার দু—ধারে ঘন—পালক—ঘেরা চোখ। ঝাঁকড়া চুল অযত্নে অবহেলায় পেছন দিকে উল্টে দেওয়া। গালে চার পাঁচ দিনের চোখা দাড়ি। গায়ের রং পোড়া ব্রোঞ্জের মতো। রোদে পুড়ে জলে ভিজে তার চামড়া টান টান হয়ে গেছে। তবু সব মিলিয়ে সে দারুণ আকর্ষণীয়।

ধর্মুর পরনে এই মুহূর্তে ময়লা চাপা চুস্ত আর ঢোলা খাকি কুর্তা। পিঠের দিকে কুর্তার তলায় একটা দেশি বন্দুক বাঁধা রয়েছে। বন্দুকটার মতো বুকের দিকের কুর্তার তলায় টোটার মালাও বাঁধা।

ধর্মু একজন 'পোচার'। তার কাজ হল বে—আইনিভাবে বস্তার জেলার সংরক্ষিত বনে ঢুকে লুকিয়ে—চুরিয়ে জন্তু—জানোয়ার মারা। তারপর সেই সব জন্তুর ছাল—দাঁত—নখ ভূপাল শহরে গিয়ে সাহেবদের কাছে বেচে আসা। বরবৌলি তালুকে তাদের অল্প কিছু জমিজমা আছে। কিন্তু বিরাট সংসার—বুড়ো মা—বাপ ছোটো ছোটো তিন—চারটে ভাই—বোন। অথচ রোজগার করার লোক বলতে ধর্মু ছাড়া আর কেউ নেই। এদিকে সামান্য দু'—চার বিঘে জমিতে যে গেঁহু ফলে তাতে সবার দু—মাসের খোরাকও হয় না। কাজেই চুরি করে রিজার্ভ ফরেস্টে ঢুকে জন্তু—জানোয়ার না মারতে পারলে উপোস অবধারিত। মাসে একটা চিতল হরিণ কি বাঘ মারতে পারলেই ধর্মুদের কোনওরকমে চলে যায়। কিন্তু কাজটা খুব সহজ নয়। অনেক সময় দিনের পর দিন হানা দিয়েও একটা চুহা বা খরগোশ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তা ছাড়া ফরেস্ট গার্ডদের হাতে যে কোনও সময় ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। এখন যে নতুন রেঞ্জার সাহেব এসেছে সে দারুণ কড়া অফসর (অফিসার)। গোটা সংরক্ষিত বনটা যেন তার বাপের সম্পত্তি। বাঘ—ভাল্লুক মারা তো দূরের কথা, গাছের একটা পাতা খসালে আর তা যদি তাঁর চোখে পড়ে গুলি মেরে মাথার চাঁদি উড়িয়ে দেবে।

যাই হোক আজও রিজার্ভ ফরেস্টে যাচ্ছিল ধর্মু। সাত দিনের মধ্যে অন্তত দু'টো বাঘ তাকে মারতেই হবে।

উপোস থেকে বাঁচবার জন্যে এবার জঙ্গলে হানা দিচ্ছে না ধর্মু। ঘরে যে গেঁহু আর মাইলো আছে তাতে একটা মাস চোখ বুজে চলে যাবে। তবু সে যে রিজার্ভ ফরেস্টে যাচ্ছে তাঁর একমাত্র কারণ ফুলকিয়া। কিন্তু কারণটার কথা পরে।

বরবৌলি তালুক থেকে রিজার্ভ ফরেস্টে যেতে হলে তিরুকোট গাঁয়ের পাশের এই টিলাটা পেরুতে হয়। ফরেস্টে যাবার এটাই একমাত্র রাস্তা। ফি মাসে কম করে আট—দশবার জঙ্গলে যায় ধর্মু। আর যখনই যায় ফুলকিয়া তাকে ঠিক ঠিক দেখে ফেলে। মেয়েটা যেন দিন—রাত হাজারটা চোখ মেলে তিরুকোট গাঁয়ে বসে থাকে। ধর্মুকে একবার দেখলেই হল, দৌড়ে কাছে চলে আসে।

ধর্মু তাকিয়েই ছিল, তাকিয়েই ছিল। ফুলকিয়াকে দেখতে দেখতে তার বুকে যেমন ঢল বয়ে যাচ্ছিল চোখ দুটো তেমনি খুশিতে ঝকমকিয়ে উঠছিল। সেই সঙ্গে দুঃখের পাতলা একটু ছায়াও মিশে আছে।

একটু পরেই টিলা বেয়ে ওপরে উঠে এল ফুলকিয়া। তার বয়স সতেরো—আঠারো। গায়ের রং পাকা গমের মতো। পাতলা কোমর, যমজ পাহাড়ের মতো তার বুক, কোমরের তলায় বিশাল উপত্যকা।

পানের মতো মুখ ফুলকিয়ার, সরু থুতনি। নাকটা মোটার ধার ঘেঁষে। ছোট্ট কপালের ওপর থেকে ঘন চুলের ঘের। চুলগুলো জারিওলা রঙিন ফিতে দিয়ে একবেণী করে বেঁধে পিঠের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে। খঞ্জন পাখির চোখের মতো তার চোখ দুটো ছটফটে।

ফুলকিয়ার পরনে কাঁচ আর পুঁতি বসানো রং—চংয়ে ঘাঘরা আর ঢোলা কামিজ। হাতে রুপোর কাঙনা, গলায় রুপোর জবরজং হার আর কানে জালিকাটা প্রকাণ্ড ঝুমকো।

এতটা চড়াই বেয়ে ওপরে উঠে আসার জন্য ফুলকিয়া হাঁপিয়ে গিয়েছিল। জোরে জোরে এবার শ্বাস পড়ল তার। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে, ঘাড়ে কপালে গলায় দানা দানা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে।

একটু জিরিয়ে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের দেহাতি হিন্দিতে ফুলকিয়া বলল, 'কী ব্যওস্থা করলে? আর কতদিন তিরুকোটে পড়ে থাকব?'

ধর্মু হাসল। তারপর ফুলকিয়ার দিকে ঝুঁকে বলল, 'আর বেশি দিন পড়ে থাকতে হবে না। সাত দিনের ভেতর দুটো বাঘ যেভাবে হোক মারবই মারব? ভূপালে সাহিবরা রয়েছে, তাঁদের কাছে বাঘের ছাল—নখটখ নিয়ে গেলে দু' হাজার রূপেয়া মিলবে। ক্যাশ টু থাউজেণ্ড রূপিজ। তখন জরুর তোকে আমার কাছে নিয়ে যাব। ভূপালে সত্যিকারের সাদা চামড়ার সাহেবদের কাছে জন্তু—জানোয়ারের ছাল—টাল বেচতে গিয়ে দু—চারটে ইংরেজি বুলি শিখে ফেলেছে ধর্মু। এই নিয়ে তার বেশ গর্বও রয়েছে সেটা সে চেপে রাখে না।

ভারী গলায় ফুলকিয়া বলল, 'দেখা হলেই তো তুমি আমাকে বাঘ—ভাল্লুক দেখাও। এই করে করে পাঁচ বরিষ (বছর) কাটিয়ে দিলে।'

'এবার আর আমার কথার নড়চড় হবে না দেখে নিস।'

'সব বারই তো ওই এক কথা বলছ। আমি বিশোয়াস (বিশ্বাস) করি না।'

'এবারটা বিশোয়াস কর। শিউজী কসম—'

ফুলকিয়া ধর্মুর বিয়ে করা বউ। দশ বছর আগে তার বয়স যখন পনেরো—ষোলো আর ফুলকিয়ার সাত—আট তখন তাদের বিয়ে হয়। বিয়ের পর তিন রাত শ্বশুর বাড়িতে থেকে তিরুকোটে বাপের কাছে চলে গিয়েছিল ফুলকিয়া। ওদের সামাজিক রীতি অনুযায়ী বিবাহিতা মেয়ে যুবতি হবার পর আবার স্বামীর কাছে ফিরে যায়। যদ্দিন না সে যুবতি হচ্ছে তাকে বাপের ঘরে থাকতে হয়।

পাঁচ বছর আগে যুবতি হয়েছে ফুলকিয়া। তার বাপ সে খবরটা ধর্মুদের পাঠিয়েও দিয়েছে। এই খবর পাবার পর ধর্মুদের যা করা উচিত ছিল তা হল ফুলকিয়াকে বাড়ি নিয়ে আসা।

এই সময়টা যে যার সাধ্যমত শ্বশুর বাড়ির লোকদের নানা রকম উপহার —টুপহার আর প্রণামী দেয়। তারপর বউকে দামি শাড়ি এবং গয়নায় সাজিয়ে কেউ মখমলে—মোড়া ডুলিতে, কেউ হাতীর পিঠে চড়িয়ে বাজনা—টাজনা বাজিয়ে পতাকারি (আতস বাজি) ফাটাতে ফাটাতে নিজের বাড়ি নিয়ে যায়।

কিন্তু ধর্মুরা ফুলকিয়াকে নিয়ে যেতে পারেনি। তার কারণ ফুলকিয়া খুবই বড় ঘরের মেয়ে। তার বাপ তিরুকোট তালুকের মুখিয়া অর্থাৎ এক নম্বর মানুষ। লোকটার যেমন অঢেল পয়সা তেমনি প্রচণ্ড দাপট।

মাইলের পর মাইল জুড়ে তার ক্ষেতি—বাড়ি। আশ—পাশর বিশ পঞ্চাশটা তালুকের মধ্যে একমাত্র তারই পাকা তিনতলা হাবেলি রয়েছে। আর আছে দুশো তাগড়া মোষ, পঞ্চাশ—ষাটটা বয়েল গাড়ি, গোটা পনেরোটা গাদা বন্দুক। ধান আর গেঁহুর গোলা যে কত, গুনে শেষ করা যায় না। দশ—বিশজন বাদ দিলে তিরুকোট তালুকের সব মেয়ে—পুরুষই তার জমিতে পেটে—ভাতায় প্রায় সারা বছর খেটে খায়।

অবস্থার এত ফারাক তবু ফুলকিয়ার বাপ গুলিক সিং যে ধর্মুর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল তার একটা জোরালো হেতু আছে। গুলিক সিং ভয়ানক গোঁড়া রাজপুত ক্ষত্রিয়, নিজের জাত ছাড়া অন্য জাতে মেয়ের বিয়ে দেবে না। অথচ আশ—পাশর তিরিশ—চল্লিশটা তালুকের মধ্যে ধর্মুরা ছাড়া আর কোনও রাজপুত ক্ষত্রিয় নেই। অবশ্য রায়পুর শহর বা দ্রুগ কিংবা জগদলপুরের দিকে খোঁজ করলে নিশ্চয়ই স্বজাতের ভালো ছেলেটেলে পাওয়া যেত। কিন্তু গুলিক সিং মেয়েকে দারুণ ভালোবাসে, ফুলকিয়াকে বিয়ে দিয়ে সে বেশি দূরে পাঠাতে চায় না, কাছাকাছি রাখতে চায় যাতে ইচ্ছা করলেই দেখে আসতে পারে। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে, ধর্মুরা গরিব। তাই তার ইচ্ছা ছিল বিয়ের পর দামাদকে (জামাইকে) নিজের কাছে এনে ঘর—জামাই করে রাখবে। একান্তই যদি না হয় কিছু জমিজমা আর দশ—বিশটা বয়েল দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে। কিন্তু তার এই শেষ হিসেব দুটো মেলেনি। গরিব হলেও ধর্মুর আত্মসম্মান জ্ঞানটা খুবই বেশি। ঘর জামাই হওয়ার চাইতে বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে আত্মহত্যা করাটা তার পক্ষে অনেক সোজা কাজ। আর যদি দাঁড়াতেই হয় নিজের ক্ষমতায় দাঁড়াবে শ্বশুরের করুণার ওপর নির্ভর করে নয়।

ফুলকিয়া যুবতি হওয়ার পরও ধর্মু যে পাঁচটা বছর চুপচাপ আছে সেটা এই জন্য। মনে মনে তার জেদ, রীতিমতো জাঁকজমক করেই সে ফুলকিয়াকে নিজের ঘরে নিয়ে আসবে। গুলিক সিং যেন নাক কুঁচকে বলতে না পারে, এমন ঘরে মেয়ে দিয়েছি যে ভিখমাঙোয়া অর্থাৎ ভিখিরির মতো নিয়ে গেল।

জেদ থাকা এক কথা আর সেটা কাজে করে দেখানো আরেক কথা। ধর্মু পাঁচ বছরের মধ্যে এমন টাকা জমাতে পারেনি যাতে সবার চোখে তাক লাগিয়ে বউকে ঘরে নিয়ে আসতে পারে।

এদিকে ফুলকিয়া কিন্তু অস্থির হয়ে উঠেছে। বছর তিন চারেক আগে ধর্মু যখন পোচারের কাজ শুরু করল তখন থেকে প্রায়ই ফরেস্টে যাবার জন্য তিরুকোটে আসছে। প্রথম প্রথম তাকে দেখে কাছে ঘেঁষত না ফুলকিয়া। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসত। তারপর আস্তে আস্তে তার লজ্জা কাটল। ধর্মুকে দেখতে পেলেই এখন সে ছুটে আসে।

ফুলকিয়া বলল, 'আগেও তো তুমি কতবার শিউজীর নামে কসম খেয়েছ।'

ধর্মু হকচকিয়ে গেল। কথাটা মিথ্যে বলেনি ফুলকিয়া। খুব ব্যস্তভাবে তার কাঁধে আঙুল রেখে ধর্মু বলল, 'ঠিক আছে, এই তোকে ছুঁয়ে কসম খাচ্ছি, এবার নিয়ে যাব, নিয়ে যাব, নিয়ে যাব।'

ফুলকিয়া বলল 'সচ?'

'তোকে ছুঁয়ে ঝুট বলতে পারি?'

'তোষামোদ হচ্ছে?'

'বিলকুল না।'

ধর্মুর বুকের কাছে ঘন হয়ে এল ফুলকিয়া। একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে আধফোটা গলায় বলল, 'আমার আর ভালো লাগছে না।'

বুকের কাছে ফুলকিয়ার নিশ্বাস পড়ছে। শিরায় শিরায় রক্ত তোলপাড় করে ঢেউ উঠতে লাগল ধর্মুর। সে কী বলবে ভেবে পেল না।

ফুলকিয়া এবার বলল, 'সব মেয়েই সাদির পর সসুঁরালে (শ্বশুরবাড়ি) গিয়ে থাকে। আমিই শুধু বাপের ঘরে পড়ে আছি।' তার গলার স্বর ধীরে ধীরে বুজে এল।

ধর্মু ফুলকিয়ার কানের কাছে মুখ এনে গাঢ় গলায় বলল, 'আর মোটে ক'টা দিন তো —'

'না—'

'কী না?'

'না—' জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগল ফুলকিয়া।

আদরের সুরে ধর্মু জিজ্ঞেস করল, 'কী হল তোর?'

'আজই আমাকে নিয়ে চল।'

'এভাবে নিয়ে যাওয়া যায় নাকি।'

আমি তোমার কোনও কথা শুনব না। খালি বাহানা বাহানা আর বাহানা। বলেই ধর্মুর বুকের ভেতর দূরন্ত স্রোতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ফুলকিয়া। তারপর অদ্ভুত এক আবেগে তার বুকে গাল আর ঠোঁট ঘষতে লাগল।

আগে আর কখনও এভাবে ধর্মুকে জড়িয়ে ধরেনি ফুলকিয়া। তার এরকম অস্থিরতা দেখা যায়নি।

ফুলকিয়ার নরম উষ্ণ ঠোঁট আর গাল বুকের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ক্রমাগত আশ্চর্য এক আকুলতা নিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। পাহাড়চূড়ার মতো তার অটুট বুক পাঁজরের কাছে ধীরে ধীরে বিঁধে যাচ্ছে। ধর্মুর মনে হতে লাগল, তার শ্বাসপ্রশ্বাস এবার বন্ধ হয়ে যাবে। শরীরের সব শক্তি ক্রমশ ফুরিয়ে আসছিল, মাথার ভেতরটা প্রচণ্ড নেশার ঘোরে যেন ঝিম ঝিম করে চলেছে। নিজের অজান্তেই কখন যে ধর্মু দু'হাতে ফুলকিয়াকে জড়িয়ে ধরেছে সে নিজেই জানে না।

অনেকক্ষণ পর ধর্মু বলল, 'এবার ছাড়—'

ফুলকিয়া ধর্মুকে ছাড়ল না। তার বুকের ভেতর গোটা শরীরটাকে গুঁজে রেখে গলার ভেতর আদুরে মেয়ে পায়রার মতো শব্দ করল, না—'

'ছাড়—'

'না।'

বিকেল হয়ে এল। এরপর জঙ্গলে ঢুকলে অন্ধেরাতে কিছু দেখতে পাব না। আর জানোয়ার মারতে না পারলে তোকে তোর বাপের ঘর থেকে নিজের কাছে নিয়ে আসতে দেরি হয়ে যাবে।

তবু আরও কিছুক্ষণ ফুলকিয়া ধর্মুর বুকের সঙ্গে মিশে রইল। তার পর আস্তে আস্তে মুখ তুলে বলল, 'আমি আর একেলী থাকতে পারব না।'

ধর্মু বলল, 'একেলী কেন? তোর বাপের ঘরে কত লোকজন—'

'তুমি তো কাছে নেই। যত লোকজনই থাক, একেলী লাগে না?'

গভীর গলায় ধর্মু বলল, 'হাঁ, লাগে। আর কটা দিন। স্রিফ ক'টা দিন।' প্রাণপণ শক্তিতে ফুলকিয়ার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ধর্মু। তারপর বলল, 'যাই।'

দু'চোখে আশ্চর্য যাদু নিয়ে তাকিয়ে রইল ফুলকিয়া। সম্মোহিতের মতো তাকে দেখতে দেখতে ফিসফিসিয়ে আবার বলল ধর্মু। 'যাই—'

'আচ্ছা। লেকেন মনে রেখো সাত রোজ দেখব। তার ভেতর যদি আমাকে না নিয়ে যাও গলায় রশি দেব।'

ফুলকিয়ার গালে মুখ ঠেকিয়ে ধর্মু বলল, 'সাতদিনের মধ্যে তোকে নিয়ে যাব। তুই ঘরে যা। আমি চলি।' বলে আর দাঁড়াল না। টিলার মাথা থেকে পুবদিকের ঢাল বেয়ে নীচে নামতে লাগল। বিকেলের ছায়া ঘন হবার আগেই তাকে রিজার্ভ ফরেস্টে পৌঁছুতে হবে।

অনেক দূরে, বনের সীমানার কাছাকাছি গিয়ে ধর্মু, একবার পেছন ফিরল। দেখল, ফুলকিয়া তখনও স্বপ্নে দেখা কোনও ছবির মতো টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর হৃৎপিণ্ড সমুদ্রে ঝড় ভেঙে পড়ার মতো দুলতে লাগল। মনে মনে ধর্মু প্রতিজ্ঞা করে ফেলল আজ বাঘ না মেরে ফরেস্ট থেকে বেরুচ্ছে না। ফুলকিয়াকে সে কথা দিয়েছে সাত দিনের ভেতর নিজের কাছে নিয়ে যাবে।

এক সময় ফুলকিয়ার দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে আস্তে আস্তে ধর্মু বনভূমিতে ঢুকে গেল।

চারদিকে বিশাল বিশাল সব গাছ। অর্জুন কেন্দু গরান জারুল পিয়াশাল ইত্যাদি। জঙ্গলের মাথায় ছাতা ধরে আছে তারা। এই গাছগুলো যেন বনভূমির অলংকার। এ ছাড়া রয়েছে নানা রকমের সব লতা—সোনাঙ্ক, তেলাকুচু, চিহড়। প্রতিটা গাছকে তারা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। আর আছে প্রচুর ছোটো বড়ো ঝোপঝাড়।

জঙ্গলের মাথায় গাছের ডালপালা আর পাতা এত ঘন যে আকাশটা ভালো করে দেখা যায় না। তবে সে—সবের ফাঁক দিয়ে যে আলোটুকু চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসেছে তাতে বনভূমির ভেতরটা বেশ স্পষ্টই।

কেউ কোথাও নেই। নির্জন অরণ্যে শুধু ছোটো ছোটো গাঁদাল পোকারা ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে। ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঝিঁঝিঁরা একটানা ডেকে যাচ্ছিল। ঝিল্লিস্বর চারদিকের নির্জনতা যেন দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

জঙ্গলে ঢুকলেই ধর্মুর স্নায়ুগুলো দারুণ সজাগ হয়ে যায়। মনে হয় রক্তবাহী শিরাগুলো কষে—বাঁধা ছিলার মতো টানটান হয়ে গেছে। খুব সতর্কভাবে এ—ধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে সে এগিয়ে যাচ্ছিল।

এই সতর্কতা অকারণে নয়। রিজার্ভ ফরেস্টে জন্তু—জানোয়ার মারা নিষিদ্ধ। মাঝে মাঝে ঢেঁড়া পিটিয়ে এই হোঁলিয়ারিটা চারদিকের লোকজনকে জানিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া নতুন রেঞ্জার সাহেব এবং তার শ'—খানেক ফরেসটি গার্ড সব সময় বন্দুক তাক করে জঙ্গলের ভেতর চরকির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার তাদের চোখে পড়ে গেলে নিস্তার নেই। হয় ধরা দিতে হবে, আর পালাতে গেলে গুলি খাওয়া অবধারিত।

ঝোপঝাড় বা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কোনো ফরেস্ট গার্ড বা রেঞ্জার সাহেব স্বয়ং তার ওপর নজর রাখছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ঝোপঝাড় ঠেলে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল ধর্মু। তারপর পিঠের সঙ্গে বাঁধা বন্দুকটা খুলে আকাশের দিকে উঁচিয়ে একটা ফাঁকা আওয়াজ করল।

এটা ধর্মুর অনেক দিনের কৌশল। জঙ্গলে ঢুকে খানিকটা যাবার পরই সে ফাঁকা আওয়াজ করে আবহাওয়াটা বুঝে নেয়। তাতে লাভ হয় এই ফরেস্ট গার্ড বা রেঞ্জার সাহেব কাছাকাছি থাকলে বন্দুকের আওয়াজ পেলেই চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে আসে। তাদের পায়ের শব্দ কানে গেলে পালানো সহজ হয়।

আজ কিন্তু কেউ দৌড়ে এল না। তার মানে আশপাশে কেউ নেই। অবশ্য বন্দুকের আওয়াজে গাছের মাথা থেকে হাজার হাজার পাখি ডানা ঝাপটিয়ে চেঁচামেচি করতে করতে উড়ে গিয়েছিল। ডালপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তারা আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। দু'—একটা বুনো শুয়োর হুড়মুড় করে দৌড়তে দৌড়তে দূরের একটা ঝোপের পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর বনভূমি আবার চুপচাপ।

লক্ষণটা মোটামুটি ভালোই মনে হচ্ছে। ধর্মু, আর দাঁড়াল না। বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল।'

ধর্মু এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছে সেখানে কোথাও সমতল জায়গা নেই। শুধু পাহাড় আর পাহাড়। চড়াই আর উতরাইতে রিজার্ভ ফরেস্টটা এখানে ছড়িয়ে আছে।

খানিকটা হাঁটবার পর দূরে ফাঁকা মতো একটু জায়গা চোখে পড়ল। সেখানে ঝরনার তিরতিরে স্রোত বয়ে গেছে। একটা প্রকাণ্ড চিতল হরিণ ঝরণায় মুখ ডুবিয়ে জল খেয়ে যাচ্ছিল। হরিণটার গায়ের রং খয়েরি। তার ওপর সাদা সাদা গোল ফুটকি, মাথায় ডালপালাওলা ঝাড়ালো শিং। লোমগুলো নরম সিল্কের মতো মসৃণ।

হরিণটাকে দেখতে দেখতে ধর্মুর চোখদুটো চকচকিয়ে উঠল। ওটার চামড়া আর শিং নিয়ে গেলে ভূপালের সাহেবরা ভালো দাম দেবে।

বন্দুকের কুঁদোটা কাঁধের কাছে আটকে নলের মাছিতে চোখ রেখে হরিণটাকে তাক করল ধর্মু। কিন্তু গুলিটা ছুঁড়বার আগেই অঘটন ঘটে গেল। কী ভেবে জল থেকে মুখ তুলে সাঁ করে ঘাড়টা ঘোরালো হরিণটা। দূরে ধর্মুকে দেখেই কানদুটো খাড়া করল। তারপর একটা লাফ দিয়ে বিদ্যুৎ চমকের মতো চোখের পলকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেজাজটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল ধর্মুর। আজকের প্রথম শিকার, তাও কিনা ফসকে গেল। কিছুক্ষণ দারুণ বিরক্তভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আবার আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করল সে। সেই ফাঁকা জায়গা আর ঝরনাটা পেরিয়ে সে পুব—দক্ষিণে হেঁটেই চলেছে, হেঁটেই চলেছে। কিন্তু না হরিণ না ভাল্লুক না বাঘ—কিছুই আর চোখে পড়ছে না। জঙ্গলের যাবতীয় জন্তু—জানোয়ার যেন আজ ষড়যন্ত্র করেছে, কিছুতেই ধর্মুর বন্দুকের পাল্লার ভেতর আসবে না।

ধর্মু আগেও লক্ষ করেছে প্রথম শিকার ফসকানো মানেই দারুণ একটা অপয়া ব্যাপার। সেই দিনটা একেবারে বেফায়দা নষ্ট হয়ে যায়।

ধর্মু একবার ভাবল আজ আর কিছু হবে না। শুধু শুধু না ঘুরে ফিরে যাওয়াই ভালো। পরক্ষণেই সে ঠিক করে ফেলল না, ফিরবে না। দিনের আয়ু, এখনও অনেকখানিই রয়েছে। এই গরমকালে রোদও থাকবে বহুক্ষণ। সন্ধে পর্যন্ত না দেখে ফেরার কোনও মানে হয় না। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে এগিয়ে যেতে লাগল।

এবার মাঝে মধ্যে দু'—চারটে খরগোস চোখে পড়ছে। সাদা ধবধবে, আশ্চর্য নরম আর তুলতুলে এই নিরীহ ছোট্ট প্রাণীগুলো কোনও ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে আচমকা ধর্মুকে

দেখেই রীতিমতো অবাক হয়েই যেন থমকে যাচ্ছে। তারপর লম্বা লম্বা কানগুলো সটান খাড়া করে চকচকে কাচের গুলির মতো চোখে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তুরতুর করে আবার অন্য একটা ঝোপে ঢুকে পড়ছে।

বাজারে খরগোশের চামড়ার দাম নেই। কাজেই সেগুলোর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না ধর্মু।

একবার একটা শজারু সামনে এসে পড়েছিল। রায়পুরে নিয়ে গেলে শজারুর কাঁটার ভালো দাম পাওয়া যায়। তা ছাড়া এই জন্তুটার মাংসও খেতে খারাপ না। কিন্তু বন্দুক উচোঁবার আগেই কাঁটার ঝন ঝন শব্দ করে শজারুটা সামনের বড়ো একটা গর্তে ঢুকে গেল।

আজকের দিনটাই যা—তা। মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল ধর্মুর। তবু সে আশা ছাড়ল না, গভীর জঙ্গলের দিকে এগুতে লাগল।

ধর্মু এই অরণ্যের যাবতীয় গাছপালা এবং লতা—টতা চেনে। তার চাইতেও বেশি করে চেনে প্রতিটি জন্তু জানোয়ার আর তাদের চালচলন আচার— আচরণকে। হরিণ, বাঘ বা ভাল্লুকের গলার স্বর সে অবিকল নকল করতে পারে।

জঙ্গলে হানা দিয়ে ধর্মু যখন কোনো জন্তু টন্তুর দেখা পায় না তখন দুটো হাত মুখের কাছে চোঙার মতো ধরে হরিণ বা বাঘের ডাক ডেকে যায়। আর সেই ডাকে জন্তুরা বেরিয়ে আসে।

আজও গভীর জঙ্গলের দিকে যেতে যেতে বার কয়েক বাঘের ডাক ডাকল ধর্মু, হরিণের ডাক ডাকল। কিন্তু ফল কিছুই হল না। না হরিণ, না বাঘ, না ভাল্লুক—একটা জানোয়ারও বেরিয়ে এল না।

অথচ যেভাবেই হোক অন্তত একটা বাঘ বা হরিণ তাকে আজ মারতেই হবে। কেননা তার শরীরে এখনও ফুলিকিয়ার শরীরের গাঢ় ছোঁয়া লেগে রয়েছে। ফুলকিয়ার ঠোঁট, গাল, মুখ, জোড়া পাহাড়ের মতো বুক—সব কিছু গলে গলে আশ্চর্য এক সুখ হয়ে তার সারা গায়ে এবং রক্তের ঢেউয়ে মিশে গেছে। ফুলকিয়ার মুখ যতবার তার মনে হচ্ছে ততবারই সে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, ততবারই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে দিয়ে উঠছে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্কতার মধ্যে কখন যে গড়ানে উপত্যকার মতো একটা জায়গায় এসে পড়েছে, ধর্মুর খেয়াল নেই। ফুলকিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে আবছাভাবে তার মনে হচ্ছিল জন্তু—জানোয়াররা যদি তার সঙ্গে ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতা করে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে ফুলকিয়াকে নিজের কাছে নিয়ে আসবে কী করে?

আচমকা খুব কাছ থেকে একটা শব্দ হল—গর—র—র—র—

চমকে ধর্মু দেখল পনেরো কুড়ি হাত তফাতে একটা ঝাঁকড়া অর্জুন গাছের মোটা গুঁড়ির গা ঘেঁষে একটা প্রকাণ্ড বাঘিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চোখ দুটো এদিকেই ফেরানো।

পনেরো কুড়ি হাত দূরত্ব এমন কিছুই না। বাঘিনীটা ইচ্ছা করলে চোখের পাতা পড়তে না পড়তে এক লাফে ধর্মুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

তিন চার বছর এই রিজার্ভ ফরেস্টে ঢুকে জন্তু—জানোয়ার মারছে ধর্মু কিন্তু কখনও কোনও বাঘ বা বাঘিনীর এত কাছে এসে পড়েনি। তার বুকের ভেতর রক্ত যেন পলকে জমাট বেঁধে গেল। বন্দুক তুলে তাক করার কথাও সে মনে করতে পারল না। দৌড়ে যে

নিরাপদ জায়গায় সরে যাবে, তাও তার খেয়াল রইল না। মনে হল পেরেক ঠুকে কেউ যেন পা দুটো মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে।

বাঘিনীটা সমানে শব্দ করে যাচ্ছিল, গ—র—র—র—তার দুই কষ বেয়ে লালা গড়িয়ে পড়ছে।

সম্মোহিতের মতো বাঘিনীর দিকে তাকিয়েই রয়েছে ধর্মু। অস্পষ্টভাবে তার মনে হচ্ছিল যে কোনও মুহূর্তে বাঘিনীটা লাফিয়ে পড়ে তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে তার শরীর ক্রমশ অসাড় হয়ে যাচ্ছিল।

আশ্চর্য, বাঘিনীটা ঝাঁপিয়ে পড়ল না। তার গলার সেই গরগরানিটা আস্তে আস্তে গাঢ় হতে লাগল। সেই অবস্থাতেই সে ঘুরে দাঁড়াল। আর তখনই ধর্মু দেখতে পেল ওধারের ঝাঁপসি জঙ্গলের আড়াল থেকে বিরাট একটা বাঘ আস্তে আস্তে বেরিয়ে বাঘিনীটার কাছে চলে এল।

বাঘটা ধর্মুকে দেখতে পায়নি, তাকে কাছাকাছি পেয়ে বাঘিনীর সেই গরগরানি আরো বেড়ে গেল। থাবা দিয়ে বাঘটার গা আস্তে আস্তে আঁচড়াতে লাগল সে; তারপর মুখটা বাঘের মুখের কাছে এনে আদরের ভঙ্গিতে কামড়াতে লাগল।

এতক্ষণে বাঘটার গলা থেকেও গরগরানির আওয়াজ বেরুতে শুরু করেছে। তার কষ বেয়েও লালা ঝরছে। সে—ও বাঘিনীটাকে আঁচড়াতে আর কামড়াতে লাগল।

একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ধর্মু। এতক্ষণে তার বিহ্বল ভয়ের ভাবটা অনেকখানি কেটে গেছে। মনে মনে বাঘ আর বাঘিনীটাকে মেপে ফেলল সে। কম করে জানোয়ার দুটো তেরো চোদ্দো ফুট লম্বা হবে। তাদের শরীর চকচকে সোনালি লোমে ঢাকা, মাথা দুটোও প্রকাণ্ড।

তিন চার বছর এই জঙ্গলে হানা দিচ্ছে ধর্মু কিন্তু এতবড় বাঘ আগে আর কখনও মারতে পারেনি। বন্দুকের পাল্লার মধ্যেই জানোয়ার দুটো রয়েছে। মাত্র দুটো কি তিনটে গুলি খরচ করলেই ফুলকিয়াকে তার বাপের ঘর থেকে নিয়ে আসার পয়সা উঠে আসবে। বন্দুক তুলে ধর্মু নিশানা ঠিক করতে যাবে, হঠাৎ বাঘটা তাকে দেখতে পেল। কয়েক পলক সে ধর্মুর দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর দ্রুত বাঘিনীটার দিকে ফিরল। ওদিকে বাঘিনীটা কোনও কামুক যুবতির মতো সামনের দুই থাবা দিয়ে বাঘটার গলা জড়িয়ে ধরেছে। বাঘটার গলা থেকে গাঢ় সুখের আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল, 'গর—র—র—র—'

বাঘিনীটা ক্রমশ বাঘটাকে উত্তেজিত করে তুলছে। সে—ও দুই থাবায় তার বাঘিনীর গলা বেষ্টন করল।

ধর্মু আরেকবার বন্দুক তুলতে যাবে, সেই যময় বাঘ আর বাঘিনীর গা থেকে তার নাকে একটা বুনো গন্ধ এসে লাগল। এই গন্ধটা তার চেনা। বাঘিনী যখন বাঘকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার জন্য মেতে ওঠে তাদের দু'জনেরই গা থেকে এই আশ্চর্য গন্ধ বেরোয়।

এদিকে পশ্চিম আকাশের ঢালু গা বেয়ে সূর্যটা অনেকখানি নেমে গেছে। দিনটা দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। গাছ—পালার ফাঁক দিয়ে শেষ বেলার চিকরি—কাটা নরম সোনালি রোদ এসে পড়েছে বনভূমিতে। সেই রোদ গায়ে মেখে বাঘিনী বাঘটাকে আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে গলার ভেতর আরামের শব্দ করে করে তার আদর জানাচ্ছে। বাঘিনী যেন তার সঙ্গীকে নিয়ে নির্জন উপত্যকায় পৃথিবীর এক আদিম খেলায় মেতে উঠেছে।

ওদের, বিশেষ করে বাঘিনীকে দেখতে দেখতে আচমকা ফুলকিয়ার মুখটা মনে পড়ে গেল ধর্মুর। কিছুক্ষণ আগে ফুলকিয়াও তো তাকে নিয়ে এই রকম এক খেলায় মেতে উঠেছিল। বন্দুকটা তাক করতে গিয়েও নামিয়ে নিল ধর্মু।

মৃত্যু যে পনেরো কুড়ি হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে লক্ষ্য নেই বাঘ আর বাঘিনীর। ধর্মুকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে নিজেদের নিয়েই তারা মেতে আছে।

কিছুক্ষণ বাদে আবার বন্দুক তুলল ধর্মু। কিন্তু বাঘিনীটাকে দেখতে দেখতে আবার ফুলকিয়ার মুখ মনে পড়ে গেল তার। হঠাৎ তপ্ত স্রোতের মতো কিছু একটা তার শরীর জুড়ে বয়ে যেতে লাগল। আস্তে আস্তে বন্দুক নামিয়ে নিল সে। তারপর যতবার বন্দুক তুলল ততবার ফুলকিয়ার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল আর ততবারই বন্দুক নামাতে হল। শেষ পর্যন্ত বাঘ আর বাঘিনীর দিকে তাক করে বন্দুকের ঘোড়াটা আর টেপাই হল না।

জীবনে এমন সুযোগ আর কখনও আসবে না। সে জন্য পরে হয়তো ধর্মুকে হাত কামড়াতে হবে। কী আর করা যাবে!

ফুলকিয়ার জন্য বাঘ আর বাঘিনীটাকে মারা দরকার কিন্তু ফুলকিয়ার জন্যই পৃথিবীর আদিম সুখে মত্ত জন্তু দুটোকে মারা সম্ভব নয়। বন্দুক নামিয়ে উপত্যকার ঢাল বেয়ে বেয়ে ফিরে নামতে লাগল ধর্মু।

—